পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক **সপ্তম** ও **অষ্টম** শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
বিজ্ঞপ্তি নং সিল্ ।৮০।৫৪, তাং ২৭।১২।৫৪ ;
[কলিকাতা গেজেট, ২০।১।৫৫ দ্রষ্টব্য]

গৃহ-বিজ্ঞানের কথা

[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডোমেস্টিক সায়েন্স বিভাগের অধ্যক্ষা
জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা, এম. এ., বি. টি., টি. ডি. (লণ্ডন),
বিহারীলাল মিত্র ফেলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
'সেনেট' ও 'ফ্যাকাল্টি-অব্-এডুকেশন'-এর সদস্যা

দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোম্পানি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৫৬

চিত্রশিল্পী—প্রফুল্ল দেব
মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র
2॥•

প্রিণ্টার :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭/২ কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

4/40

সূচী

সপ্তম শ্রেণী

বিষয় পৃষ্ঠা

গৃহ (The House)

গৃহ-সজ্জা (House Decoration)

গৃহ-পরিচালনা (House Management)

খাদ্য (Food)

অষ্টম শ্রেণী

গৃহ (The House)

গৃহসজ্জা (House Decoration)

গৃহ-পরিচালনা (House Management)

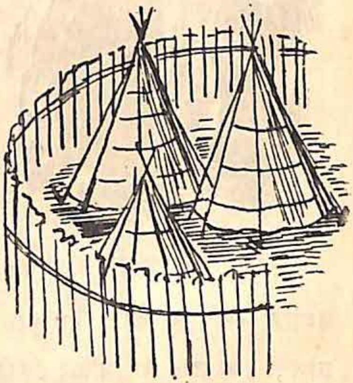
খাদ্য (Food)

গৃহ

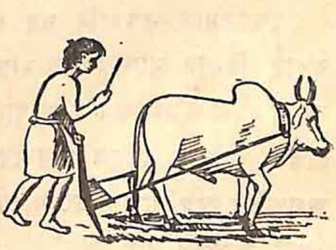
গৃহ ও উহার বিভিন্ন অংশ

গৃহ-নির্মাণ ও সভ্যতার সূচনা ঃ—

বেশ কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। তখন মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে জানিত না। তোমরা রবিন্‌সন ক্রুশোর কথা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। তখনকার মানুষ বন্য জন্তু-জানোয়ার বা ঝড়-বৃষ্টির হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য রবিন্‌সন ক্রুশোর মতই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইত। বেশীর ভাগ সময়ই মানুষ যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখিল, তামা, লোহা প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহারও উহাদের আয়ত্তে আসিল এবং সেই সঙ্গেই জমি চাষ করিয়া জমি হইতে ফসল উৎপাদনের চিন্তাও উহাদের মনে দেখা দিল। তখন উহারা ভাবিতে লাগিল, স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলে পশু-পালন কিংবা চাষ-বাস ইত্যাদি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং জমি হইতে ফসল পাইতে হইলে, যতদূর সম্ভব একস্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করাই আবশ্যক। প্রকৃতির এই প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই আসে গৃহ নির্মাণ করিয়া মানুষের স্থায়িভাবে বসবাস করার প্রচেষ্টা। এইভাবে যাযাবর-







জীবনের গিরিগুহা বা খড়কুটোয় তৈয়ারী পথের তাঁবুকে পিছনে রাখিয়া, কি ভাবে গৃহ নির্মাণ করিলে আরও স্থায়িভাবে, আরও উন্নততর প্রণালীতে জীবন যাপন করা যায় মানুষ তাহারই জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠে। উহাদের এই ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই আজ তোমরা বিভিন্ন উপাদানে তৈয়ারী বিভিন্ন ধরণের





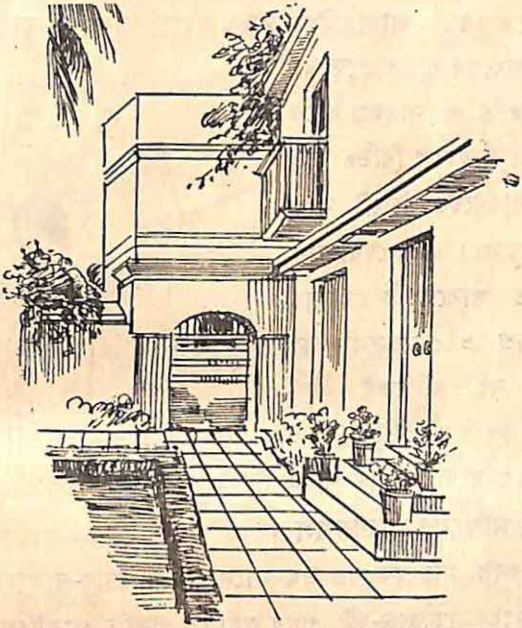
গুহাবাসী মানুষ গৃহবাসী মানুষে পরিণত হইল

গৃহাদি দেখিতে পাও, কোথাও বা খড়ের ছাউনি কুঁড়েঘর, কোথাও বা টিনের চালা, কোথাও বা মাটির কোঠা, কোথাও বা আবার ইটের গাঁথুনির বড় বড় পাকা দালান। প্রকৃতপক্ষে যেদিন হইতে মানুষের মনে চাষ-বাসের চেষ্টা আসে, সেইদিন হইতেই সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেইদিন হইতেই গুহাবাসী, অরণ্যচারী মানুষ গৃহবাসী মানুষে পরিণত হয়। বস্তুত এইভাবে ঘর বাঁধিয়া বসবাস করার পরিকল্পনা সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের একটি মস্ত বড় দান।

বিভিন্ন অংশের সমষ্টিতেই একটি বাসগৃহ :—

কেবলমাত্র একখানি ঘর হইলেই কিন্তু গৃহ হইল না। স্থায়িভাবে বসবাস করার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্বন্ধেও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। গোপালন করিতে গেলে গোশালার প্রয়োজন, আহার্য প্রস্তুত করিতে হইলে রান্নাঘরের প্রয়োজন, নিদ্রার জন্য প্রয়োজন শয়নঘরের। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের পরিধিও ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। একটি সু-সম্পূর্ণ গৃহ বলিতে সেই গৃহকেই বুঝায়, যে গৃহের মধ্যে খাওয়া, শোওয়া, রান্না, স্নান, পূজা করা, শিশুদের পড়াশুনা, খেলাধূলা বা বড়দের

আমোদ-প্রমোদ, গল্প-গুজব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্থাৎ শয়নঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর,



জমিদার-বাড়ী

বৈঠকখানা, শিশুদের খেলাঘর, আঙিনা, উঠোন বা গৃহ-প্রাঙ্গণ ইত্যাদি সমস্ত বিভিন্ন অংশ লইয়াই একখানি সু-সম্পূর্ণ বাসগৃহ। তোমরা অনেকেই পল্লীগ্রামে জমিদার বাড়ীগুলির কথা শুনিয়াছ। পুরানো জমিদার-বাড়ীগুলি প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুইটি অংশে বিভক্ত—'সদর মহল' ও 'অন্দর মহল'। জমিদারের কাছারি, পূজার দালান, বৈঠকখানা-ঘর ইত্যাদি থাকিত সদর-মহলে, আর অন্দর-মহলে থাকিত শুইবার ঘর, রাঁধিবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি। দুই মহলের মাঝখানে থাকিত একখানি উঠোন।

গৃহের অর্থ স্বাস্থ্যপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ :—

কাজেই দেখিতে পাইতেছ, বিভিন্ন অংশের সমষ্টি লইয়াই একটি বাসগৃহ। কিন্তু এই বিভিন্ন অংশগুলি আবার যেমন-তেমন করিয়া সাজাইলেই বাসগৃহ তৈয়ারী হয় না; কোন্ অংশটি কাহার পর আসিবে, কোন্ অংশটির প্রয়োজন

কতখানি, কোন্ অংশের দরজা-জানালা কোন্ দিকে বসাইলে উহা স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে, এই সমস্তই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তবে একটি বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হয়। আবার ইহা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যাহাতে বাসগৃহের প্রত্যেকটি অংশের সহিত প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে, কারণ তাহা না হইলে বিভিন্ন অংশ মিলিয়াও বাসগৃহের চিত্রটি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এখন দেখা যাক, গৃহ বলিতে আসলে কি বোঝায়, উহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাই বা কি। ঘর বলিতেই একটি আচ্ছাদন বুঝায়। আচ্ছাদনের অর্থ ই ঢাকিয়া রাখা, অর্থাৎ আয়শ্র দেওয়া। **গৃহ মানুষের আশ্রয়স্থল**।

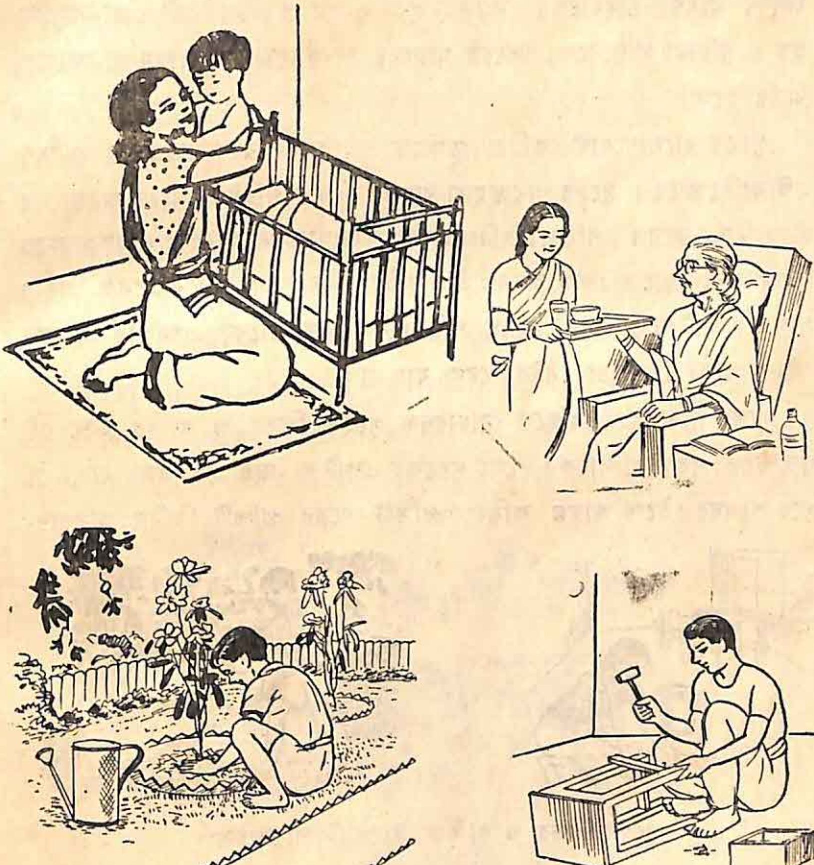


ইহা যে কেবল মানুষকে বন্য জন্তু-জানোয়ার বা চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করে তাহা নহে, ঝড়-বৃষ্টি, প্রখর সূর্যাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হইতেও মানুষকে আশ্রয় দান করে গৃহই। কিন্তু কেবলমাত্র নিরাপত্তার জন্যই যে মানুষের গৃহের প্রয়োজন, তাহা নহে। মানুষের নিকট গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক, আরও বিস্তৃত। এখনকার মানুষের নিকট ঘর নিরাপদের, ঘর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের। এখনকার মানুষের নিকট গৃহ বলিতে বুঝায়, একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, যাহার মধ্যে দেহ ও মন দুই-ই সমানভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে। এই কারণেই মানুষের জীবনে গৃহের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক।

আদর্শ গৃহ ঃ—

গৃহের সমষ্টিই হইল সমাজ। গৃহই আনিয়া দিয়াছে মানুষের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক দায়িত্ব ও চেতনা। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর গৃহ এবং গৃহ-পরিবেশের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। কি

ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, উভয় প্রকার জীবনেই ইহার মূল্য অনেক। কেবল-মাত্র একখানি দালান বা একটি বাসাবাড়ী হইলেই উহা গৃহ হইল না। গৃহের অর্থই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি-পরিপূর্ণ, সু-সম্পূর্ণ, ও শ্রীমণ্ডিত মানুষের একটি আশ্রয়স্থল। সেই গৃহই আদর্শ গৃহ, যে গৃহের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, ছোট-বড় প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য কর্ম



প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন

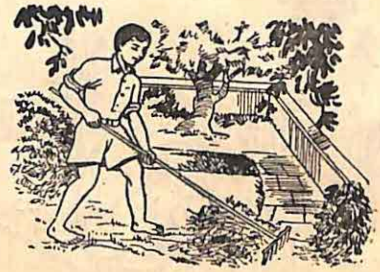
ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। অধিবাসীদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যে গৃহ শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ প্রত্যেকের পক্ষেই বাসোপযোগী এবং যে গৃহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আকর হইয়া গড়িয়া উঠে, সেই গৃহই **আদর্শ গৃহ**। আহার, বিহার, বিশ্রাম,

নিদ্রা, শয়ন, রন্ধন, স্নান, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা, অতিথি-সেবা, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয় কাজগুলির যেখানে সুব্যবস্থা রহিয়াছে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, সেই গৃহই যথার্থ গৃহ জানিবে। সেই গৃহই যথার্থ বাসোপযোগী, যে গৃহে আলো-হাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা নিষ্কাশন প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির যথাযথ ব্যবস্থা রহিয়াছে। বস্তুতই গৃহ ও গৃহের নিকটবর্তী স্থানসমূহের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের উপরেই মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম অনেকাংশে নির্ভর করে।

গৃহকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে উহার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। গৃহের পরিচ্ছন্নতা আবার অনেক পরিমাণে গৃহের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহ কেবলমাত্র যে স্বাস্থ্যের সহায়তা করে তাহা নহে, উহাতে একটি অনবদ্য শ্রীও ফুটিয়া উঠে। পল্লীগ্রামে এখনও চাষীর সামান্য একটি খড়ের বাড়ী যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, এখনকার শহরের অনেক পাকা বাড়ীতেও সেইরূপ দেখা যায় না।

গৃহের পরিচ্ছন্নতা বলিতে সাধারণত গৃহের ভিতর ও বাহির উভয়েরই পরিচ্ছন্নতা বুঝাইয়া থাকে। সেই গৃহকেই একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ বলা যায়, যে গৃহে শয়নঘর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি ঘরের প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার-





গৃহের ভিতর ও বাহির উভয়েরই পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ সংন্যস্ত রহিয়াছে, যে গৃহে আবর্জনাদি অপসারণ করিবার পরিপাটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে গৃহের আশেপাশের পরিচ্ছন্নতা, উন্মুক্ত স্থান, নির্মল বায়ু গৃহের ভিতরকার আবহাওয়াকে মনোরম করিয়া তোলে।

পরিচ্ছন্নতার পরেই আসে **গৃহ-সজ্জার** কথা। মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যেমন গৃহের পরিচ্ছন্নতার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন

গৃহ-সজ্জার। গৃহ-সজ্জা যে একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার তাহা নহে, অতি সাধারণ জিনিস দিয়াও বাসগৃহ অত্যন্ত পরিপাটিরূপে সাজানো যাইতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের উপরেই গৃহ-সজ্জার সম্পূর্ণতা নির্ভর করে। পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত গৃহই গৃহস্থকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়া দেয়। মানুষ যেখানে বাস করে সেই স্থান, ও সেই স্থানটিকে ঘিরিয়া যে পারিপার্শ্বিক, উহা সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ও শ্রীমণ্ডিত থাকিবে, ইহাই মানুষ চায়। কাজেই যেমন-তেমন করিয়া বাস করিলেই হইল না, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে যাহাতে বাস করা যায়, সেইভাবে প্রত্যেক গৃহকেই শ্রীমণ্ডিত ও সু-সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তোলার প্রতি প্রত্যেক গৃহস্থেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

গৃহ-উদ্যান—গৃহ-উদ্যানের দ্বারা গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। এইজন্য যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা সাধারণত গৃহ নির্মাণ করিবার সময় বাসগৃহের সংলগ্ন কিছুটা স্থান উদ্যানের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়া দেন। গৃহ-উদ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনেক। স্বল্প পরিসরে ছোটখাটো একটি বাগান থাকিলে উহা গৃহের অধিবাসীদের অবসর-বিনোদনে সহায়তা করে। গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও অন্যান্য পরিজনেরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু সময় বাগানের কাজে অতিবাহিত করিতে পারেন এবং খোলা আকাশের তলায় উন্মুক্ত স্থানে



শরীর ও মন সহজেই সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে

প্রত্যহ এইভাবে পরিশ্রম করিলে সকলের শরীর ও মন সহজেই সুস্থ ও সতেজ হইয়া উঠিতে পারে। দিনের শেষে নিড়ানি দিয়া মাটি কাটা, গাছের গোড়ায়

জল ঢালা, সার দেওয়া, বীজ বপন করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজগুলির মধ্য দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির সঞ্চালন হয় ও দেহ সুগঠিত হইয়া উঠে। এই



শিশুর শিক্ষা সুরু হয়

পরিশ্রমের পুরস্কার হইল বিভিন্ন বর্ণ ও গন্ধযুক্ত প্রস্ফুটিত ফুল-সম্ভার। গৃহ-উদ্যানের এই পুষ্পের সৌরভেই সান্ধ্যবায়ু সুরভিত হইয়া উঠে এবং গৃহের আবহাওয়াকে মনোরম করিয়া তোলে।

গৃহ-উদ্যান কখনও একের চেষ্টায় সু-সম্পূর্ণ হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে উদ্যান-রচনা সমবেত চেষ্টার ফল। পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলের সমবেত অংশ গ্রহণের ফলেই গৃহ-উদ্যান গড়িয়া উঠে। উদ্যানের মধ্য দিয়াই গৃহের সকলের একসঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ ঘটে এবং প্রকৃতির সঙ্গেও উহাদের যোগাযোগ গভীর হইয়া উঠে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও বর্ণের মধ্য দিয়াই শিশুর শিক্ষা সুরু হয়। বিভিন্ন ফুল, ফুলের বিভিন্ন পাতা, কোন্ ঋতুতে কি ফুল হয়, কোন্ গাছের কি সার প্রয়োজন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়েই আমরাও বাগানের কাজের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালাভ করিতে পারি। ছোট-বড় সকলেই সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হইয়া থাকা যায়। যখন চারাগাছটি বড় হয় ও তাহাতে ফুল ফোটে তখন ইহা নিজেদেরই সৃষ্টি মনে করিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। সৃষ্ট বস্তু হইতে ক্রমেই মানুষের মন—সৃষ্টি করিলেন যিনি তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় এবং তাঁহার অসীম ক্ষমতার কথা মনে করিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে

মনের শান্তি ও সমতা রক্ষার জন্যই গৃহ-উদ্যানের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়। কর্ম-কোলাহল-মুখর দিনের শেষে মানুষের মন স্বভাবতই শান্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। সে সময়ে গৃহ-উদ্যানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্লান্ত মানুষের মন শান্ত হয়। সন্ধ্যার হাওয়া, প্রস্ফুটিত ফুল, পাখীর কলগান—সব কিছুর মধ্যেই যেন মানুষ প্রকৃতির সংস্পর্শ অনুভব করে।

উদ্যান-রচনার পারিপাট্যের মধ্য দিয়া সুরুচিরও বিকাশ হয়। উদ্যান-রচনা একটি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। কোন্ গাছটি কোথায় লাগাইতে হইবে এবং দুইটি গাছের মধ্যে কতটুকু ব্যবধান প্রয়োজন, কোন্ ফুলের গায়ে কোন্ ফুল লাগাইলে বর্ণ-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিবে, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান উদ্যান-রচনায় একান্ত আবশ্যক। এই জ্ঞান যাহার যত পরিস্ফুট, রুচিও উহার তত উন্নত স্তরের জানিবে। উদ্যান-রচনা মানুষের রুচিকে বিকশিত করিয়া তোলারই একটি পথ।

সবজি-বাগান ঃ—

অনেকে আবার সবজি-বাগানও করিয়া থাকেন। সবজি-বাগান রন্ধন-গৃহের সংলগ্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ তা'হলে ভাতের ফেন, চাল-ধোয়া জল



সবজি-বাগান আয়েরও একটি পথ

ইত্যাদি জিনিসগুলি অন্যত্র না ফেলিয়া ড্রেনের সাহায্যে সবজি-বাগানের মধ্যেই

ফেলা যাইতে পারে, যাহাতে ক্রমে উহা জমিয়া সারে পরিণত হয়। সবজি-বাগানের সাহায্যেও আমরা নানান সবজি, গাছ-গাছড়া, বিভিন্ন ফল-মূল ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি ও বাগানের কাজের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধেও আমাদের যথাযথ ধারণা জন্মায়। সুতরাং সবজি-বাগানের কাজগুলিকে আশ্রয় করিয়াও আমাদের শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। সবজি-বাগান গৃহস্থের আয়েরও একটি সহজ ও সুগম পথ। ইহার সাহায্যে গৃহস্থ স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে।

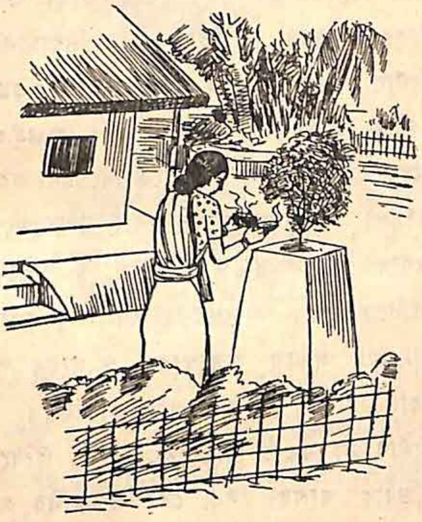
সবজি-বাগান বা ফুলের বাগান, যে বাগানই হোক না কেন, উহার অবস্থান এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যাহাতে গৃহের অধিবাসীদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি না হয়। কারণ, তাহা হইলে, উদ্যানের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কাজেই আবাসস্থলের স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া বাগান করিতে হইবে এবং বাগানটি যাহাতে বৃক্ষবহুল না হয় ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

গৃহ-প্রাঙ্গণ—বাড়ীর সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানকে সাধারণত গৃহ-প্রাঙ্গণ বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। শহরের খুব কম বাড়ীতেই প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর গৃহ যে স্থানেই অবস্থিত হউক না কেন, বাড়ীতে একটি মাঝামাঝি আয়তনের প্রাঙ্গণ থাকিলে গৃহের বায়ু-চলাচল সহজে রুদ্ধ হইতে পারে না এবং আবহাওয়া দূষিত হইবার আশঙ্কাও কতক পরিমাণে দূর হয়। গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। কর্ম-কোলাহল-মুখর সমস্ত দিনের একটানা পরিশ্রমের পর কিছুক্ষণ যদি মুক্ত আকাশের তলে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ানো যায়, দেখিতে দেখিতে স্নায়ুগুলি শান্ত হইয়া আসে, দেহের ক্লান্তি দূর হয়। শুধু যে শ্রমেরই লাঘব হয় তাহা নহে, প্রকৃতির সংস্পর্শে ক্লান্ত দেহ ও মন কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন সতেজ ও কর্মক্ষম হইয়া উঠে। মুক্ত বায়ুর স্পর্শে দেহ ও মনের সকল গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া যায়। ইহা ছাড়া, গৃহ-প্রাঙ্গণ গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা প্রভৃতি কাজগুলিতে একটি প্রধান সহায়ক।

কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে কিছুটা উন্মুক্ত স্থান রাখিয়া দিলেই ইহাকে প্রাঙ্গণ বলা চলিবে না। গৃহ-প্রাঙ্গণ যাহাতে অমনোযোগিতার ফলে আবর্জনার স্তূপে পরিণত না হয় তৎপ্রতি গৃহস্থের সতর্ক দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

গৃহ-প্রাঙ্গণ যথাযথভাবে রক্ষিত হইলে, উহা গৃহের সুস্থ পরিবেশের সহায়ক হয়।

গৃহ-প্রাঙ্গণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বস্তুত গৃহ-প্রাঙ্গণের উপরেই গৃহের শ্রী ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। তোমরা গ্রামের কুটিরগুলি নিশ্চয় দেখিয়াছ। প্রায় প্রতি কুটিরের সম্মুখেই গোবরমাটি দিয়া নিকানো একখানি ছোট প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইবে। এই প্রাঙ্গণেরই এক পাশে হয়ত তুলসীমঞ্চ, যেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয়, অপর পার্শ্বে হয়ত গৃহস্থের ক্ষুদ্র দেবালয়-সংলগ্ন পঞ্চবটীর ঝাড়। প্রায় প্রতিদিনই গোবরজলের ছিটা দিয়া এই গৃহাঙ্গনটিকে পরিষ্কার করা হয়। পরিচ্ছন্নতাই গৃহ-প্রাঙ্গণ বা আঙ্গিনার প্রধান সৌন্দর্য। ছোট্ট একফালি প্রাঙ্গণের অভাবে গ্রামের কুটিরগুলিকে যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। শহরের বাড়ীতে হয়ত তুলসীমঞ্চ বা পঞ্চবটী করিবার মত অতখানি উন্মুক্ত স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু যতটুকু স্থানই থাকুক না কেন, উহার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিবে।



যেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয়

গৃহ-প্রাঙ্গণ ও গৃহ-উদ্যানের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। উদ্যান বলিতে আমরা সাধারণত ফুলের বাগানই বুঝিয়া থাকি, যেখানে নানান রঙের ফুল, পাতা-বাহারের গাছ ইত্যাদি রোপণ করা হইয়া থাকে। গৃহ-প্রাঙ্গণ ফুলের বাগান নয় যদিও, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় গৃহস্বামী প্রাঙ্গণের ভিতরকার ছোট ছোট পথগুলির উপর লাল সুরকি বিছাইয়া দিয়াছেন এবং উহারই দু'ধারে নানান রং-এর ছোট ছোট ফুলগাছের কেয়ারি করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবলমাত্র প্রাঙ্গণটিই সুন্দর হইয়া উঠে তাহা নহে, প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যে গৃহও শ্রীমণ্ডিত হয়।

গৃহ-পরিকল্পনা

গৃহের জমি ও অবস্থান ঃ—

গৃহ-পরিকল্পনায় সর্বপ্রথমেই গৃহের **অবস্থান** ও উহার **জমি** সম্বন্ধে বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ গৃহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে গৃহের অবস্থান ও উহার জমি নির্বাচনের উপরেই। ভাল জায়গায় গৃহ নির্মাণ করিলে উহার পরিবেশ সুন্দর হয়, এবং এই সুন্দর পরিবেশই ফুটাইয়া তোলে গৃহের সৌন্দর্যকে। এই জন্যই গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচন করিবার পূর্বে গৃহের অবস্থান ও জমি সম্পর্কে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্বমুখী করিয়া গৃহ-নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ তাহা হইলে আলো-হাওয়ার অবাধ চলাচল থাকে। বাসগৃহের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই উহার জমির কথা ভাবিতে হয়। আস্তাবল, গোশালা, গোরস্থান প্রভৃতির নিকটবর্তী নীচু স্থানসমূহ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও গৃহের পক্ষে অনুপযোগী। আবর্জনা দ্বারা ভরাট জমিও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পুকুর-বোজানো জমির উপরেও গৃহ নির্মাণ না করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ উহাতে কিছুদিনের মধ্যেই গৃহ হেলিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দেয় ও জমির আর্দ্রতা হেতু গৃহ অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে হইয়া উঠে। কলকারখানা হইতে বাসগৃহ দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় কারখানার অবিরাম শব্দে মানসিক স্থৈর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এমন জায়গায় গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচন করিবে যেখানে আলো, জল, যাতায়াত প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। গৃহ নির্মাণ বা নির্বাচনে **শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের** বিষয়ই সর্বাগ্রে চিন্তা করিবে।

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ—

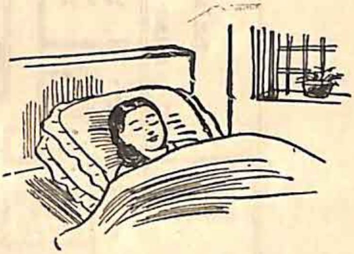
গৃহনির্মাণ করিতে হইলে **পরিকল্পনার** প্রয়োজন হয়। বিনা-পরিকল্পনায় গৃহ-নির্মাণ একরূপ অসম্ভব। তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, জমির উপর ইমারত গাঁথিবার পূর্বে, সেই ইমারতের একটি নক্শা তৈয়ারী

করা হয়। ইহাই হইল **বাড়ীর নক্শা**। কতখানি জমির উপর গৃহ নির্মিত হইবে এবং উহা কতজন লোকের বাসোপযোগী হইবে এবং ঐ গৃহের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের কোন্ কোন্ কাজগুলির ব্যবস্থা থাকিবে ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ই গৃহের নক্শা তৈয়ারী করিবার সময় বিবেচনা করিতে হয়। শয়ন, ভোজন, রন্ধন,



পূজা, স্নান, অবসর-বিনোদন, শিশুপালন প্রভৃতি প্রতিটি কাজ লইয়াই আমাদের





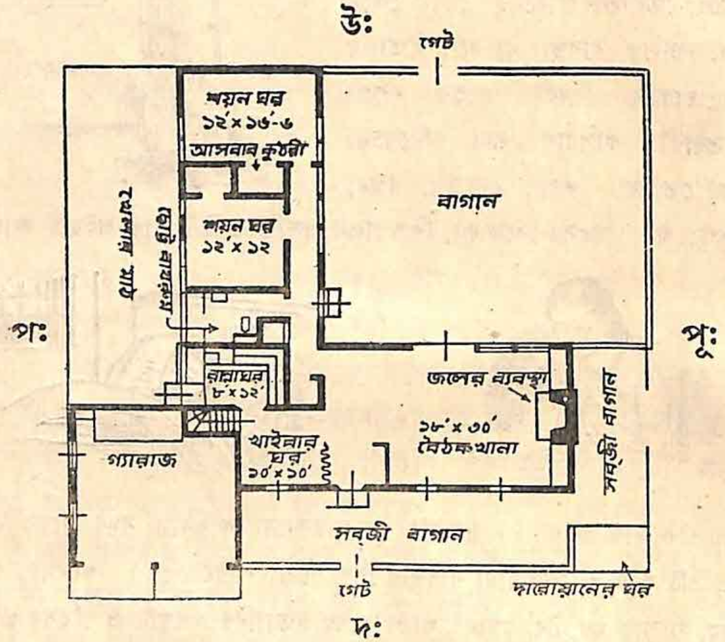
প্রতিদিনকার জীবন। স্থতরাং গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় গৃহের এইরূপ প্রতিটি কাজ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। শয়নঘর, স্নানের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, খাওয়ার ঘর ইত্যাদির অবস্থান ও পরিসর প্রভৃতির বিশদ বিবরণ দিয়াই নক্শা তৈয়ারী হয়।

গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় বিশুদ্ধ পানীয় জল কিভাবে পাওয়া যাইতে পারে, জল-নিকাশের কি ব্যবস্থা হইবে, ড্রেন ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলিও বিশেষজ্ঞের সহিত আলোচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক, যাহাতে বাড়ীর নক্শাটি সবদিক্ দিয়াই স্থ-সম্পূর্ণ হয়। গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে এইভাবে গৃহের একটি স্থ-সম্পুর্ণ নক্শা তৈয়ারী করিয়া লইলে গৃহ-নির্মাণের সময় আর উহাতে ত্রুটি থাকিবার আশঙ্কা থাকে না।

গৃহের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা ঃ—

গৃহপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি ও পরিকল্পনার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি প্রধানত লক্ষ্য রাখিতে হয়, উহা জানিলে।—এইবার গৃহের বিভিন্ন কক্ষের অবস্থানের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

রান্নাঘর—রান্নাঘর বাড়ীর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। বাড়ীর মেয়েরা অধিকাংশ সময় রান্নার কাজে রান্নাঘরেই কাটাইয়া থাকেন। কাজেই রন্ধন-গৃহটির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা যাহাতে ত্রুটিহীন হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য



রাখা প্রয়োজন। রান্নাঘরের অবস্থান শয়নঘর হইতে কিছুটা ব্যবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যাহাতে নিদ্রা বা বিশ্রামের সময় শয়নঘরে রান্নাঘরের ধোঁয়া আসিয়া গৃহের লোকদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়। শয়নঘরে কয়লার ধোঁয়া ঢুকিলে উহা স্বাস্থ্যের অন্তরায় হয় জানিবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ গৃহস্থই কয়লার উনুন ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কয়লার উনুন ধরাইবার সময় প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। এই ধোঁয়া যাহাতে অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে, রান্নাঘরের দরজা-জানালার সেই-রকম ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

খাওয়ার ঘর—খাওয়ার ঘরটি যতদূর সম্ভব রান্নাঘরের সংলগ্ন করিয়া নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ উহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি আনা-নেওয়ার ব্যাপারে রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘরে অযথা ছুটোছুটি করিতে হয় না। খাওয়ার ঘরের পাশেই হওয়া

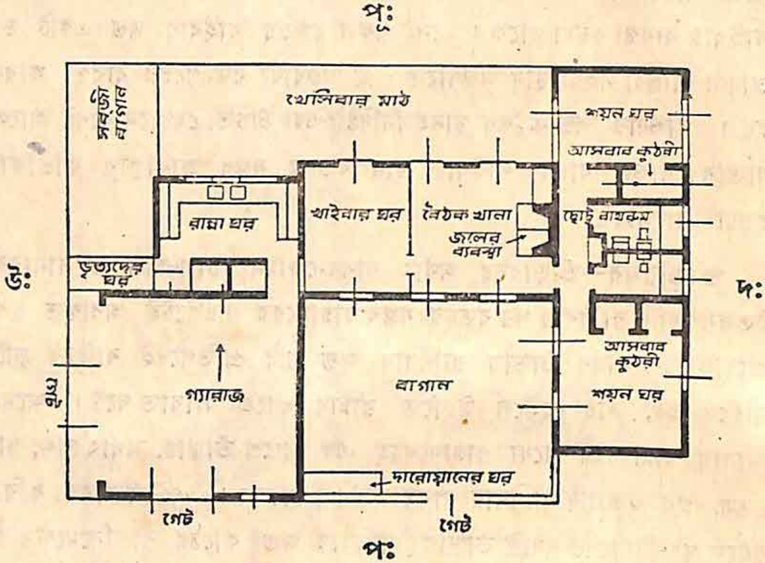
উচিত বৈঠকখানা, যাহাতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে গৃহের অপরাপর অংশের কাজে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাতের সৃষ্টি না করিয়া উহাদের খাওয়ার ঘরে লইয়া গিয়া বসানো যায়। অনেক সময় আবার স্থানাভাব হেতু রান্নাঘরের মধ্যেই খাইবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সেই সকল ক্ষেত্রে খাইবার জন্য একটি ভাল জায়গা বাছিয়া লইয়া স্থান অনুপাতে সেই অনুযায়ী রন্ধনগৃহের ব্যবস্থা করিতে হয়। খাওয়ার জন্য এইরূপ স্থানই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, যেখানে যথেষ্ট আলো-বাতাস পাওয়া যায়। খাইবার স্থান যতদূর সম্ভব জানালার কাছাকাছি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভাঁড়ারঘর—ভাঁড়ারঘর অর্থাৎ বাসন-কোষন, চাল-ডাল ও নানারকম তৈজসপত্রাদি রাখিবার ঘর যতদূর সম্ভব রান্নাঘরের সন্নিকটেই অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভাঁড়ার রাখিবার জন্য যদি প্রতিপদেই বাহিরে ছুটিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে উহাতে রান্নার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। অনেকে আবার রান্নাঘরের মধ্যে রান্নাঘরেরই এক অংশে ভাঁড়ার, অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে গৃহ-নির্মাণের সময়ই ভাঁড়ার রাখিবার জন্য কাঠের বা সিমেণ্টের উঁচু র‍্যাক তৈয়ারী করিতে হয়।

শয়নঘর—শয়নঘরের পরিকল্পনা করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে আলো-হাওয়ার কখনও অভাব না ঘটে ও উহার যথেষ্ট চলাচল থাকে। শয়নকক্ষের অবস্থান দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে দক্ষিণের মুক্ত বায়ু কক্ষ-মধ্যে অবাধে চলাচল করিতে পারিবে ও সূর্যালোকেরও কোন অভাব হইবে না। গৃহের নক্‌শা তৈয়ারী করিবার সময় এমনভাবে শয়নঘরের পরিকল্পনা করিবে, যাহাতে গৃহটির অপরাপর অংশের কর্ম-কোলাহল শয়নঘরে আসিয়া না পৌছায়। শয়নঘরের অবস্থান গৃহের একান্তেই হওয়া আবশ্যক।

বৈঠকখানা—বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটি সাধারণত গৃহের বাহিরের দিকেই হইয়া থাকে, যাহাতে গৃহকর্তার পরিচিত লোকজন কিংবা বাড়ীর ছেলেদের সহপাঠী বা বন্ধুরা আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলে, বাড়ীর মেয়েদের চলাফেরা বা অন্যান্য কাজকর্মে কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় বা উহারা যেন অসুবিধা বোধ না করেন। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে শয়নঘর বা বৈঠকখানার অবস্থান এরূপ

হওয়া উচিত, যাহাতে জানালা খুলিয়া দিলেই সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তর, অনন্ত নীল আকাশ, অথবা সবুজের বুকে নানান রঙের ফুল-বিছানো উদ্যানের কোনও-না-



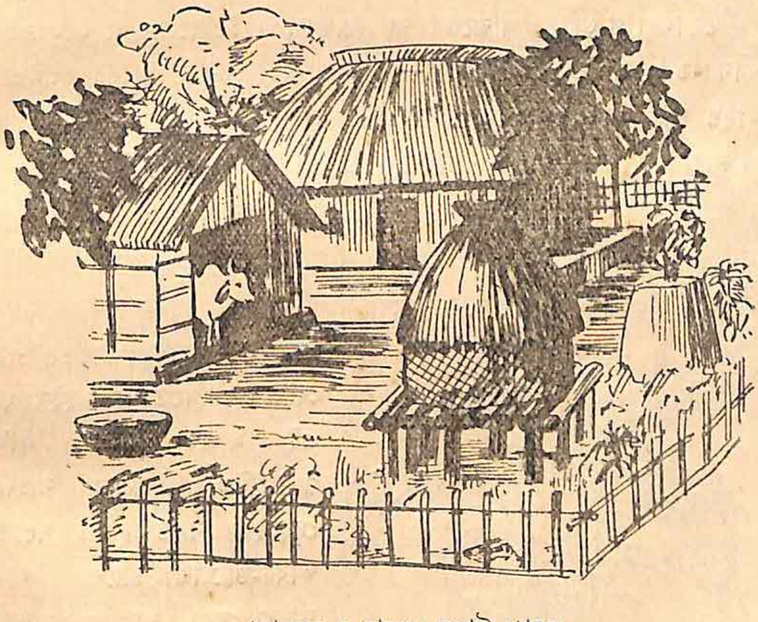
কোনও অংশ চোখে পড়ে। গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবে, কিভাবে পরিকল্পনা করিলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের মন প্রতিনিয়তই প্রকৃতির স্পর্শ পাইতে পারে।

গৃহ-নির্মাণ করিবার পূর্বে এইভাবে প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সিঁড়ি, আঙ্গিনা, স্নানের ঘর, শিশুদের ঘর ইত্যাদি প্রত্যেকটিরই যথাযথ পরিকল্পনা করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধারণত স্নানের ঘর ইত্যাদির প্রতি আমরা অত্যন্ত কম মনোযোগ দিয়া থাকি, যদিও স্নান দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ। স্নানের ঘর, পায়খানা ইত্যাদির অবস্থান রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর হইতে কিছুটা দূরে হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং এইগুলির পরিকল্পনা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঐ ঘরগুলি হইতে বাহির হইয়াই গৃহের লোকদের বাহিরের অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে পড়িতে না হয়। এই ঘরগুলি সাধারণ ঘর হইতে কিছুটা আড়ালে হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং এইগুলির পরিসরও নিতান্ত স্বল্প হইবে না। স্নানের ঘরের আয়তন ঠিক একজন লোক অনুপাতে না রাখিয়া ন্যূনতম আয়তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় করিয়া রাখাই বিধেয়। ৫'×৭'

আয়তনই স্নানের ঘরের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় গৃহে যখন কেহ অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন দুইজন লোককেই একসঙ্গে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। এই কারণেই স্নানের ঘরের আয়তন ন্যূনতম আয়তন অপেক্ষা কিছুটা বড় করা প্রয়োজন।

পল্লীগ্রামের গৃহ :—

পল্লীগ্রামে গৃহের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য থাকে। কাজেই গৃহ-নির্মাণ করিবার সময় সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। পল্লীগ্রামে বেশীর ভাগ গৃহস্থের বাড়ীতেই একখানি গোয়ালঘর ও একটি ধানের মরাই থাকে।



গোয়ালঘর ও ধানের মরাই থাকে

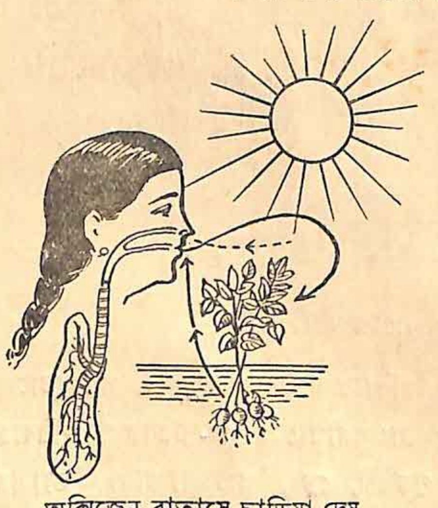
কোনও কোনও গৃহস্থ আবার জলের সুবিধার জন্য গৃহের সম্মুখ বা পশ্চাদ্‌ভাগে পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকেন। সুতরাং পল্লীগ্রামের গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় গোয়ালঘর, ধানের মরাই, পুষ্করিণী, ড্রেন, খাটা-পায়খানা ইত্যাদির অবস্থানের প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিবে। যে স্থানের গৃহ-পরিকল্পনা করিবে সেস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

বায়ু-সঞ্চালন

বায়ুঃ—

তোমরা জান বায়ুই আমাদের **প্রাণ**। খাদ্য গ্রহণ না করিলে বা জল পান না করিলেও মানুষ কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাতাসের অভাবে মানুষের কয়েক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি আবার বদ্ধ ঘর, ঘন বসতি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদির দরুন দূষিত বায়ু হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নানারকমের রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া নিমেষেই মানুষকে রোগগ্রস্ত করিতে পারে।

তোমরা পড়িয়াছ, অক্সিজেন বা অম্লজান, নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান, কার্বন-ডায়োক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল—প্রধানত এই তিনটি গ্যাসের সংমিশ্রণেই বায়ুর সৃষ্টি। এইগুলির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। অক্সিজেন ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না। উহার দহনশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া উহার সহিত সর্বদাই নাইট্রোজেন সংমিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-মিশ্রিত এই গ্যাস প্রশ্বাসের সহিত দেহে গিয়া রক্ত-কণিকাগুলিকে জীবিত রাখে ও দেহের মধ্যে তাপের সঞ্চার করে। এই কারণেই জীবিতের দেহে তাপ থাকে ও মৃতের শরীর দেখিতে দেখিতে শীতল হইয়া যায়। এই মিশ্রিত গ্যাসই আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহস্থিত সমস্ত দূষিত পদার্থকে কার্বন-ডায়োক্সাইডরূপে বাহির করিয়া দেয়। কার্বন-ডায়োক্সাইড প্রাণদেহের পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু আবার গাছপালার জীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য। গাছের সবুজ পাতাগুলি আলোর সংস্পর্শে আসিয়া নিজের দেহের অক্সিজেন বাতাসে ছাড়িয়া দেয় এবং বায়ু হইতে কার্বন ডায়োক্সাইড টানিয়া



অক্সিজেন বাতাসে ছাড়িয়া দেয়

নয়। এই কারণেই বদ্ধ ঘরের বায়ু অপেক্ষা বাহিরের বায়ু অনেকখানি বিশুদ্ধ ও নির্মল।

বায়ু-চলাচল ঃ—

কোন গৃহের বা স্থানের আবদ্ধ দূষিত বায়ুকে বিতাড়িত করিয়া উহার স্থানে বাহিরের মুক্ত বায়ুকে লইয়া আসার নামই **'বায়ু-চলাচল করানো'** বা **'বায়ু-সঞ্চালন'**। ঘরের ভিতরকার বায়ুর যদি চলাচল না থাকে, অর্থাৎ বায়ুর যদি যথাযথ সঞ্চালন না হয়, তাহা হইলে ক্রমেই বায়ু দূষিত হইয়া উঠে ও উহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু-সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন। ঘন বসতি, অত্যধিক ভিড়, লোকজনের হাঁচিকাশি, ভিতরকার বাতাসের জলীয় বাষ্প, ধূলা, ধোঁয়া, নানারূপ গলিত পচা পদার্থ ও আবর্জনা ইত্যাদির দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। দূষিত বায়ু স্বাস্থ্যহানি ঘটায় ও নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে।



বায়ু-সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজন

সাধারণত দুই রকম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন করাইয়া ঘরের আবদ্ধ ও দূষিত বায়ুকে বিশোধিত করা যাইতে পারে ঃ

(১) নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক উপায়

(২) কৃত্রিম উপায়

নৈসর্গিক উপায় ঃ—

(ক) **সূর্যকিরণ দ্বারা ঃ**—তোমরা জান সূর্যের কিরণ আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষায় ও সুষ্ঠু জীবনযাত্রায় একান্ত প্রয়োজন। লক্ষ্য করিয়াছ নিশ্চয়ই, প্রচণ্ড

গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যকিরণে মাটি উত্তপ্ত হয় এবং পৃথিবীর তাপে বায়ুর যে অংশ ভূ-পৃষ্ঠের সন্নিহিত থাকে, সেই অংশও গরম হইয়া উঠে। এই গরম বাতাস হাল্কা হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে উপরে উঠিয়া যায় ও উপরকার বিশুদ্ধ, শীতল, ভারী হাওয়া নীচের ঐ শূন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। এইভাবে আমাদের গৃহের চারিদিককার দূষিত বায়ু সঞ্চালিত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায় এবং উপরের বিশুদ্ধ বায়ু নীচের দিকে সঞ্চালিত হয়। ইহা ছাড়া তোমরা পূর্বেও পড়িয়াছ, প্রখর সূর্যকিরণে রোগ-জীবাণু সকল বাঁচিয়া থাকিতে পারে-না। সূর্যকিরণ অপরিচ্ছন্ন আবর্জনাযুক্ত জায়গাগুলির সমস্ত পচনশীল পদার্থগুলিকে শুকাইয়া দেয় ও বায়ুকে বিশোধিত করে।

(খ) **গাছপালার দ্বারা** ঃ—তোমাদের চারিদিকে কত গাছপালা দেখিতে পাও। এগুলির দ্বারাও বায়ু অনেকাংশে বিশোধিত হয় এবং উহারা বায়ু-চলাচলেও সাহায্য করে। গাছপালার সবুজ পাতায় যে রঞ্জন-পদার্থ আছে, উহার নাম **ক্লোরোফিল** (Chlorophyll)। ঐ রঞ্জন-পদার্থ সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু হইতে অ্যামোনিয়া ও অঙ্গারাম্লের কার্বন আকর্ষণ করিয়া লয় এবং অক্সিজেন বাহির করিয়া দেয়। এই কারণেই বৃক্ষবহুল স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হয়।

এতদ্ব্যতীত তোমরা জান বৃক্ষবহুল স্থান বৃষ্টিবহুল হয়। বৃষ্টির জলে নানারকম দূষিত পদার্থ ইত্যাদি ধুইয়া যায় এবং বায়ুস্থিত ধূলা ও ধোঁয়ার পরিমাণও অনেকাংশে কমিয়া আসে।

গৃহের আশেপাশে গাছগাছড়া, বিশেষত ফুলগাছ থাকিলে হাওয়া সুবাসিত হইয়া উঠে। অনেক সময় দেখিবে, গৃহস্থ, গৃহের চারিপাশে নিম, তুলসী, ইউকেলিপ টাস, শাল, পাইন ইত্যাদি গাছ লাগাইয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, এই সকল গাছের হাওয়ায় বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

(গ) **ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা** ঃ—বায়ুর মধ্যে জৈব রেণু, ধূলা, ধোঁয়া, তূলার আঁশ, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি অনেক দূষিত পদার্থ থাকে। প্রবল বৃষ্টিপাতে এই সকল পদার্থ ধুইয়া যায় ও দূষিত গ্যাসও চলিয়া যায়। অধিকন্তু বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে ওজোনের মাত্রা বাড়িয়া যায়। **ঘনীভূত অক্সিজেনের নামই ওজোন।** তোমরা জান ওজোন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সময় বায়ুর বেগ বাড়িয়া যায়।

ঝড়ের বেগে বাহিরের বিশুদ্ধ হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘরের দূষিত হাওয়া বিতাড়িত হয়। এইভাবে ঝড়-বৃষ্টিও বায়ু-সঞ্চালনে সহায়তা করে।

কৃত্রিম উপায় :—কৃত্রিম উপায় দুই প্রকারের—

(ক) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া

(খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া

(ক) **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া** :—কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে বায়ু-সঞ্চালন করাইলে উহাকে যান্ত্রিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন করানো বলে। যেমন, ঘরের মধ্যে যদি পরস্পর বিপরীত দিকে অনেকগুলি দরজা-জানালা নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে ঘরের ভিতর বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা সহজ হয়। একটি ঘরের কেবল একদিকে যদি অনেকগুলি জানালা থাকে, তাহাতে বাহিরের মুক্ত বায়ুস্রোত সহজে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং গৃহ নির্মাণ করিবার সময় যতদূর সম্ভব ঘরের দরজা-জানালাগুলি মুখোমুখি করিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিবে। বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যেও ঘরের বদ্ধ বায়ু বিতাড়িত করিয়া বাহিরের মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে লইয়া আসা যায়। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে বা জানালার উপরি-ভাগে তোমরা অনেক সময় **'ভেন্টিলেটার'** বা ঘুলঘুলি দেখিতে পাও। ঘরের ভিতর-কার দূষিত গরম বায়ু যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ তোমরা



বিশুদ্ধ বায়ু লইয়া আসা যায়

পড়িয়াছ, বায়ুর প্রকৃতি অনুসারে উহা গরম হইবামাত্র হাল্‌কা হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। সেই সময় উপরের দিকে যদি কোন নির্গম-পথ পায়, তাহা হইলে ঐ গরম বায়ুর বাহির হওয়া অনেক সহজ হয়। শীতপ্রধান দেশে বেশীর ভাগ গৃহেই তোমরা অগ্নিতাপ ও চিমনির ব্যবস্থা দেখিয়া থাক। গরম

বায়ু ঐ চিমনি ও দরজা-জানালার উপরের অংশ দিয়া যতই বাহির হইয়া যায় ততই নীচের দিক দিয়া বাহিরের বিশোধিত বায়ু ঘরে আসিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করে। ঘরের মেঝেয় ও সেই অনুযায়ী ছাদের দিকেও যদি অনুরূপ নল বা ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে বায়ু-সঞ্চালন সহজ হয়।

বায়ুশূন্য ধূলিশোষক নলের দ্বারা (Vacuum Cleaner) ধূলা দূর করিলেও বায়ু বিশোধিত হয়।

আজকাল বড় বড় অফিসবাড়ী, ছায়াচিত্র-ঘর প্রভৃতিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে, বায়ু-সঞ্চালন না করাইয়াও যন্ত্রপাতি দ্বারা বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতাকে পরিমিত রাখা হয়। ইহাকেই বলে **বায়ু-নিয়মন প্রক্রিয়া** (air-conditioning)।

(খ) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**ঃ—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার দ্বারা ঘরের বায়ুকে কতক পরিমাণে বিশুদ্ধ করা যায়। ঘরের মধ্যে একটি পাত্রে কিছু কাঠ-কয়লা ও চুন রাখিয়া দিবে। চুন ও কাঠ-কয়লা ঘরের দূষিত গন্ধকে শোষণ করিয়া লয়।

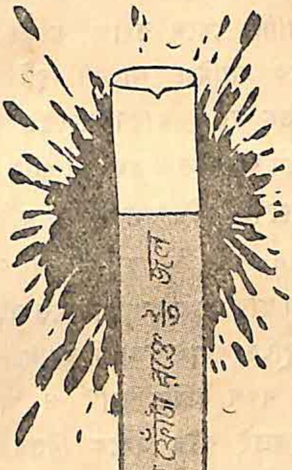
যদি তোমাদের ঘরগুলি অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে বোধ হয় তাহা হইলে ঘরের মধ্যে কিছু ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড রাখিয়া দিবে। ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড আর্দ্রতা টানিয়া লয়।

ঘর ফিনাইলের জল দিয়া ধৌত করিলে, কিংবা যদি মাঝে মাঝে ঘরের আশেপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়াইয়া দাও, তাহা হইলে রোগ-জীবাণু নষ্ট হইয়া যায় এবং বায়ুও বিশোধিত হয়।

তোমরা দেখিয়াছ নিশ্চয়ই, গ্রামের কুটিরগুলিতে এখনও প্রত্যহ প্রত্যূষে গোবরজলের ছিটা দেওয়ার রীতি আছে। টাটকা গোবরজলে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং বায়ুও কিছু পরিমাণে বিশোধিত হয়। ঘরের মধ্যে ধূপ-ধূনা জ্বালাইলেও ঘরের দূষিত পদার্থসকল কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

জল

জলের প্রয়োজনীয়তা—আমাদের জীবনধারণে বায়ুর ন্যায় জলেরও একান্ত প্রয়োজন। যে সকল উপাদানে আমাদের দেহ গঠিত, জল উহার তিন ভাগের একভাগ। আমাদের রক্তে প্রতি ফোঁটায় $\frac{২}{৩}$ জল। হাড়ের মধ্যেও অল্প-বিস্তর জল রহিয়াছে। আমাদের মস্তিষ্কেও জলের ভাগ কম নয়। ইহা ছাড়া আমাদের দেহের মধ্যে সব সময়েই একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে। জল ছাড়া এই প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যায়, জল জীবনধারণে অপরিহার্য। তোমরা জান, জলের অপর নাম **জীবন**। দৈহিক প্রক্রিয়ায় ঘাম ও প্রস্রাবের আকারে আমাদের দেহ হইতে দেহ-সঞ্চিত জলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ নিঃসৃত হইয়া যায়। কাজেই প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যহ এই জল পূরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া স্নান করা, কাপড় ধোয়া, রান্না করা, গৃহাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি সংসারের অনেক কাজের জন্যও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। কাজেই দেখিতে পাইতেছ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জল অপরিহার্য।



একজন মানুষের পক্ষে প্রতিদিন কতখানি জলের প্রয়োজন তাহা সঠিক বলা যায় না বা এ বিষয়ে কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভ্যাস ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অনুযায়ী জলের প্রয়োজনের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তবে শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের জলের প্রয়োজন অধিক। আবার লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, সকল ঋতুতেই মানুষের সম পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় না; গ্রীষ্মকালে সাধারণত জলের বেশী দরকার, শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই ঋতুভেদে জলের

প্রয়োজনের মাত্রারও তারতম্য হইয়া থাকে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির সর্ববিধ কাজের জন্য প্রতিদিন গড়ে ২ হইতে ৩ মণ জলের দরকার। কলিকাতায় প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য প্রায় ৪৫ গ্যালনেরও অধিক ফিল্টার-করা জল ধার্য আছে।

জল কোথা হইতে আসে :—

প্রথমে বৃষ্টির জলের কথাই ধরা যাক্। জল আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে এরূপ অপরিহার্য বলিয়াই হয়ত সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তোমরা জান, পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। সূর্যকিরণে এই জলের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেই বাষ্পই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া মেঘে রূপান্তরিত হয়, সেই মেঘই আবার বৃষ্টির জল হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে। বৃষ্টির জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বটে, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নয়। কারণ সমুদ্রের জল যখন বাষ্পের আকারে উপরে উঠিয়া যায়, তখন বায়ুস্থিত কতকগুলি গ্যাস আসিয়া ঐ বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হয়। এই কারণেই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, উহার মধ্যে কার্বলিক অ্যাসিড গ্যাস, অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি গ্যাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তোমরা জান বড় বড় শহরে কলকারখানার অ্যাসিড-মিশ্রিত ধোঁয়া ও দূষিত পদার্থ ইত্যাদি আসিয়া বায়ুতে সঞ্চিত হয়। বৃষ্টির জল বায়ু হইতে এই সকল দূষিত পদার্থ ও অ্যাসিড ইত্যাদি নিজের দেহে টানিয়া লয়। এইজন্যই বৃষ্টির জলকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নদী, হ্রদ, ঝরনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আর যে যে উপায়ে জল পাওয়া যাইতে পারে তন্মধ্যে বৃষ্টির জলই সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

বৃষ্টির জল হইতেই নদী, নালা, হ্রদ, ঝরনা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই সবগুলিই প্রাকৃতিক জলের পর্যায়ে পড়ে। নদীর প্রয়োজন মানুষের জীবনে অত্যধিক। পাহাড়-পর্বতের গায়ে পড়া বৃষ্টির স্বচ্ছ শীতল জল নদীর আকারে লোকালয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং মানুষের জলের প্রয়োজন মিটাইয়া সমস্ত দূষিত পদার্থকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কাজেই এই সকল প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া জলকে আমরা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার বলিতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিতে পারি না। সুতরাং পান করিবার পূর্বে এই জলগুলি বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

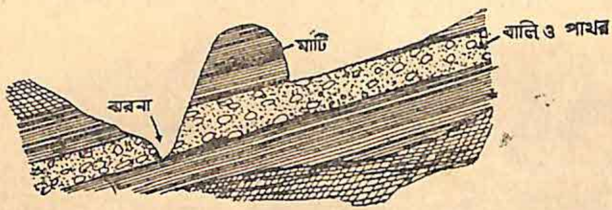
বৃষ্টির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে মাটিতে পড়িবার আগেই উহা সংগ্রহ করা উচিত নতুবা মাটির সংস্পর্শে আসিলেই উহাতে জৈব ও দূষিত পদার্থ ইত্যাদি মিশিয়া যাইতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রাকৃতিক যে যে উপায়ে জল পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিলাম। কৃত্রিম উপায়েও জল পাওয়া যাইতে পারে।

কৃত্রিম উপায় :—

কূপ, পুষ্করিণী, নলকূপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে, বেশীর ভাগ গ্রামেই ফিল্টার-করা কলের জল প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে না। সেই সকল ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতেই জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের আরও একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। যে জল পৃথিবীর যত গভীর তলদেশ হইতে আসে, সে জলে ধাতব পদার্থের পরিমাণ



ঝরনার কি ভাবে সৃষ্টি হয়

ততই অধিক। জলের কাজই দ্রাবণ করা। মাটির মধ্যে গিয়া জল পৃথিবীর নানান ধাতব পদার্থকে দ্রবীভূত করে।

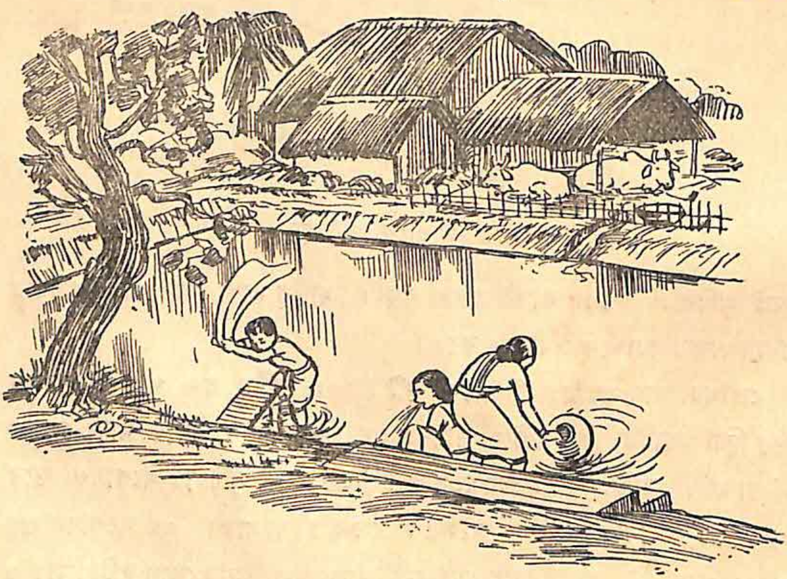
তোমরা জান ঝরনার কিভাবে সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া কিছু নদীতে পরিণত হয়, কিছু জল পৃথিবীর মাটি শোষণ করিয়া লয়। মাটির বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া এই জল পৃথিবীর অশোষক স্তরে গিয়া ঠেকে; সেইখানে সমস্ত জলের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই অশোষক স্তর যে যে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে জল উদ্দাম বেগে ছুটিয়া যায় ও পরে মাটি ভেদ করিয়া ঝরনারূপে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসে। এই কারণেই নদী বা হ্রদ অপেক্ষা ঝরনার জলে ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক। কূপ প্রভৃতির জলেও ধাতব পদার্থের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। এই ধাতব

পদার্থগুলির মধ্যে কতকগুলি উপকারী, আবার কতকগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী, যেমন—সীসা, দস্তা ইত্যাদি।

জল-প্রাপ্তির প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়গুলির বিষয় পড়িলে। এখন দেখা যাক্, জল কিভাবে দূষিত হইয়া থাকে।

জল দূষিত হইবার কারণ

আমাদের অজ্ঞতা ও অসাবধানতাই জল দূষিত হইবার প্রধান কারণ। পল্লীগ্রামে দেখা যায়, যে-জলাশয়ের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেই জলাশয়েই মানুষ নিঃসংকোচে স্নান করে, কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, বাসন মাজে এবং গরু ও মহিষ প্রভৃতি পালিত পশুগুলিকেও স্নান করায়। কখনও কখনও দেখা যায়, গৃহ হইতে নিষ্কাশিত নানারকম ময়লা ও আবর্জনা-মিশ্রিত জলগুলি কিভাবে জলাশয়ে গিয়া পড়িতে পারে গৃহের অধিবাসীরাই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। পানীয় জলের পুষ্করিণীতে মলমূত্র ত্যাগ করিতেও গ্রামের



লোকেরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। রন্ধন ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে মানুষের সতর্কতারও একান্ত অভাব দেখা যায়। জলে ঢাকা না দেওয়া, জলে ময়লা ঘটি-বাটি বা অপরিষ্কৃত হাত ডোবানো ইত্যাদি দোষ ত

অহরহই ঘটিয়া থাকে। লোকের অজ্ঞতাজনিত এই সকল অপরিচ্ছন্ন কার্যকলাপের ফলে জল যে কতখানি দূষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন।

গ্রামদেশে সাধারণত পুষ্করিণীর সন্নিকটে বা অন্যান্য জলাশয়ের পাড়ে ঝোপঝাড়, গাছপালা প্রভৃতি এত অধিক থাকে যে, সে জলে অনেক সময়ে সূর্যালোক পড়িতে পারে না। সূর্যালোকের অভাবে বহু রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয় এবং গাছের শুকনো পাতা ইত্যাদি জলে পড়িয়া পচিতে থাকে; ফলে জল দূষিত ও দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, মশা-মাছির সৃষ্টি হয়, এবং উহারা ডিম পাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে জলাশয়টি নানান রোগ-জীবাণু ও দূষিত পদার্থ ইত্যাদিতে ভরিয়া যায়। আবার অনেক সময় গ্রামদেশে মৃত পশুপক্ষী ইত্যাদিকেও দুর্গন্ধ ও গলিত অবস্থায় জলাশয় প্রভৃতির পাড়ে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। কখনও কখনও উহার কিছুটা জলে আসিয়াও পড়ে, কখনও বা পাখীরা ঠোঁটে করিয়াও উহার কিয়দংশ জলে ফেলিয়া যায়। ইহার দ্বারা জল যে কতখানি দূষিত ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা তোমরা সহজেই অনুমান করিতে পার।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জলের মধ্যে দৃশ্য দূষিত পদার্থগুলির বিষয় আলোচনা করিলাম। জলের উপরে ভাসমান লতা-পাতা, শেওলা, কচুরিপানা ইত্যাদি দূষিত পদার্থগুলিই দৃশ্য, অর্থাৎ উহাদের দেখা যায়। কিন্তু অদৃশ্য ভাবেও জলে বহু দূষিত পদার্থ থাকে, যেমন—আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের জীবাণু। এই সকল রোগ-জীবাণুগুলি সর্বদাই অবিশোধিত জলের সহিত মিশিয়া থাকে, যদিও আমরা উহাদের দেখিতে পাই না। দূষিত জল বলিলে এই রোগ-জীবাণুগুলির কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়।

ইহা ছাড়া পূর্বেই পড়িয়াছ, জলের মধ্যে অক্সিজেন ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাসও মিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, কিন্তু জলাভূমি হইতে উত্থিত মার্শ প্রভৃতি গ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং উহা জলকে দুর্গন্ধ করে।

এতদ্ব্যতীত জলের সহিত কিভাবে ধাতব-পদার্থ মিশ্রিত হয় তোমরা পড়িয়াছ। এই ধাতব-পদার্থের মধ্যে সীসা, নিকেল, দস্তা, তামা প্রভৃতি জিনিসগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। পানীয় জলে এইগুলির অত্যধিক উপস্থিতিতে হজম-ক্রিয়ায় নানারূপ বিঘ্ন দেখা দিতে পারে।

গৃহসজ্জা

গৃহই গৃহ-স্বামীর মনের ছবি :—

তোমরা পড়িয়াছ গৃহই মানুষের আশ্রয়। গৃহের অন্তরালেই মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। স্বাস্থ্যে, সম্পদে, বুদ্ধির দীপ্তিতে জীবনকে বিকশিত করে গৃহ। সুতরাং মানুষের জীবনে গৃহসজ্জারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। সুন্দর গৃহ ও গৃহ-পরিবেশ মানুষের জীবনেও সৌন্দর্য আনিয়া দেয় এবং জীবনকে আরও মনোরম ও লোভনীয় করিয়া তোলে। গৃহ-পরিবেশ যদি বিশৃঙ্খল ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে, মানুষের জীবনেও দেখিতে দেখিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং উহাদের মন সৌন্দর্য-বিমুখ হইয়া উঠে। গৃহসজ্জা বলিতে আমরা প্রধানত গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও আড়ম্বরহীন সেইটুকু সহজ প্রসাধনই বুঝিয়া থাকি, যাহার দ্বারা গৃহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শ্রী বর্ধিত হয় এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও



পরিচ্ছন্নতাই গৃহের সজ্জা

আরামে গৃহ শান্তির আকর হইয়া উঠে। গৃহকে সজ্জিত করিতে হইলে গৃহস্বামীর যে অঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্ন চারুকলা ও শিল্পগুলিতে পারদর্শী হইতে হইবে তাহা নহে। গৃহসজ্জায় প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন **সু-রুচি**। গৃহকে যদি শারীরিক ও মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়া তুলিতে হয়,

তাহা হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন সুশিক্ষা—এবং সেই সুশিক্ষার দ্বারা রুচির যথাযথ বিকাশ। মার্জিত-রুচি হওয়া চাই, তাহা না হইলে অনেক সময় প্রভূত অর্থ থাকিলেও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির অভাবে গৃহবাসীর মূল উদ্দেশ্যগুলিই ব্যর্থ হইয়া যায়। গৃহসজ্জা ও গৃহের ব্যবস্থা হইতেই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত বিভিন্ন পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভ্রান্ততা নির্ণীত হয়, সেই পরিবারের লোকদের কথাবার্তা, চালচলন ও গৃহের সাজসজ্জার দ্বারাই। প্রতি গৃহেরই একটি স্বতন্ত্র চেহারা থাকে, সেই চেহারায় গৃহস্বামীর নিজের মনখানিই প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই বিভিন্ন গৃহের পরিকল্পনা যেমন বিভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন গৃহের বা গৃহের বিভিন্ন অংশের সজ্জাও কখনও এক হইতে পারে না। বিভিন্ন প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজের রুচি অনুযায়ী গৃহ ও গৃহের বিভিন্ন অংশকে সজ্জিত করিতে হয়।

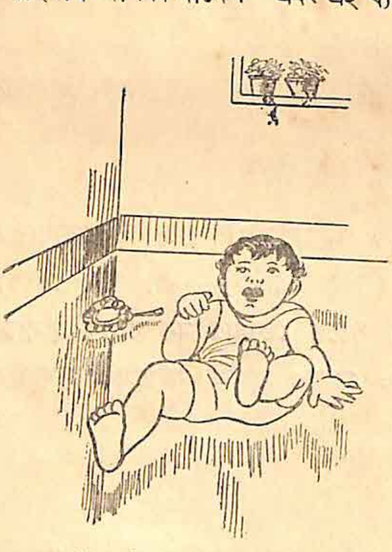
ঘরের মেঝে নির্বাচন

কোনও গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দৃষ্টি পড়ি:ব ঘরের মেঝের প্রতি। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তুমি যে স্থানে পা বাড়াইবে সে স্থানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তোমার মন স্বভাবতই সচেতন থাকে। সুতরাং ঘরের মেঝে ও মেঝের সজ্জাই সর্বাগ্রে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

মেঝের উপাদান :—

ঘরের প্রধান অংশই ঘরের মেঝে। মেঝেই ঘরের ভিত্তি। গৃহ নির্মাণ করিবার সময় ঘরের মেঝের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিংবা একই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও ব্যবহার অনুযায়ী উহাদের মেঝেও বিভিন্ন উপাদানে তৈয়ারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। যেমন, রন্ধনগৃহ ও শয়নকক্ষের মেঝের ব্যবহার এক রকম নয়। রন্ধনঘরের মেঝেয় প্রায়ই জল ইত্যাদি পড়িয়া থাকে এবং প্রত্যহই উহা ধোওয়া-মোছা আবশ্যক, কিন্তু শয়নঘরে বা বৈঠকখানায় তদ্রূপ নহে। সুতরাং রন্ধনঘর

নির্মাণ করিতে হইলে উহার মেঝে এমন উপাদান দিয়া তৈয়ারী করা আবশ্যক যাহাতে প্রত্যহ উহার ধোয়া-মোছা, ঘষা-মাজা ইত্যাদি অবাধে চলিতে পারে। অপরপক্ষে শয়নঘর বা বৈঠকখানা ইত্যাদির মেঝে হাল্‌কা-রং-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-কারুকার্য-খচিত হইলেই যেন ঐ ঘরের প্রয়োজনের সহিত উহার ঠিক সামঞ্জস্য থাকে। তেমনি শিশুদের ঘরের পরিকল্পনা করিবার সময়ও শিশুর বয়স, বৈশিষ্ট্য, উহার দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি চিন্তা করিয়াই সেই ঘরের মেঝেয় কোন্ উপাদান দেওয়া যুক্তিযুক্ত তাহা স্থির করা আবশ্যক। তোমার দুই বছরের ছোট ভাইটি সবেমাত্র টলিয়া টলিয়া চলিতে শিখিয়াছে। উহার ঘরের মেঝে যদি অত্যধিক পালিশ হয় ও উহাতে যদি কিছু পাতা না থাকে, তাহা হইলে প্রতি পদেই ভাইটির পড়িয়া যাওয়ার ও পড়িয়া চোট পাইবার আশঙ্কা থাকে। এবং এই ব্যবস্থায় উহার হাঁটার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে বর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমাগতই ব্যাহত হইতে থাকিবে। এই কারণেই, প্রয়োজন ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাধারণত কোন্ ঘরের মেঝেয় কোন্ উপাদান ব্যবহার করা হইবে তাহা স্থির করা হইয়া থাকে।



চোট পাইবার আশঙ্কা থাকে

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, ঘরের মেঝে এমন উপাদানে নির্মিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে উহা যথেষ্ট মজবুত হয় ও সহজে কোনরূপ আঁচড় কিংবা অ্যাসিড বা ক্ষার পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা কোনওরূপ দাগ না পড়ে। মেঝের উপাদান নির্বাচন করিবার সময় উহার মসৃণতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ঘরের মেঝে যথেষ্ট মসৃণ হইবে, কিন্তু উহা পিছল হইবে না। মেঝের সৌন্দর্যের উপর গৃহের সৌন্দর্যও অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং ঘরের মেঝের কথা চিন্তা করিবার সময় উহার রং বা সৌন্দর্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

মেঝের বিভিন্ন উপাদান :—

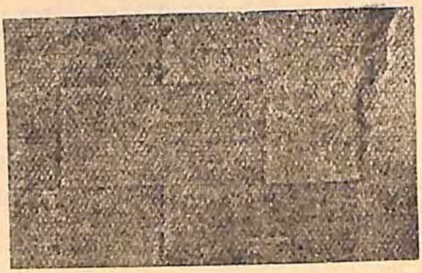
গৃহ যেমন বিভিন্ন উপাদানে তৈয়ারী থাকে তেমনই ঘরের মেঝেতেও বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তোমরা গ্রামদেশে মাটির ঘরে মাটির দাওয়া দেখিয়াছ। শহরের পাকা বাড়ীগুলির মেঝে সাধারণত সিমেণ্টেরই তৈয়ারী হয় এবং সিমেণ্টের মেঝেয় তোমরা চলাফেরা কর। সিমেণ্ট ছাড়া কেবলমাত্র সুরকি-জমানো মেঝেও কোন কোনও বাড়ীতে দেখা যায়' সাধারণ পাথর বা মার্বেল পাথরের মেঝেও তোমরা বড় বড় প্রাসাদ বা ইমারতগুলিতে দেখিয়া থাকিবে।

পশ্চিমের দেশগুলিতে এবং এদেশেও বহু শীতপ্রধান অঞ্চলে মেঝের জন্য কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঠ দুই রকমের—নরম কাঠ ও কঠিন কাঠ (soft wood & hard wood)। পেণ্ট লাগানো নরম কাঠই অনেক সময় মেঝের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দাম কম পড়ে যদিও, কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, ব্যবহারের দরুণ ইহার কোনও অংশ যদি দাগী হইয়া পড়ে তাহা হইলে পেণ্ট লাগাইয়া আবার উহাকে পূর্বের ন্যায় করিয়া তোলা দুষ্কর। নরম কাঠের উপর বার্নিশ লাগাইয়াও অনেক সময় উহা মেঝেয় ব্যবহার করা হয়। বার্নিশ লাগাইলে কাঠ যদিও দেখিতে সুন্দর হয়, কিন্তু উহাতে দাম বেশী পড়ে। অনেক সময় আবার মোমের প্রলেপ দিয়াও কাঠ ঘরের মেঝেয় ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বার্নিশ-করা কঠিন কাঠ মেঝের পক্ষে স্থায়িত্বের দিয়া অধিকতর মজবুত ও মসৃণ। মোমের প্রলেপে কাঠের কাঠিন্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহা কিছুটা পিছল হইয়া পড়ে। কাঠের মেঝেয় সামান্য চলাফেরা করিতেই শব্দ হয়।

মেঝের উপরকার উপাদান ও সজ্জা :—

আমাদের দেশে গৃহসজ্জা সম্বন্ধে মানুষ এখনও ততটা সচেতন নয়। বহু বাড়ীতেই কাঠের বা সিমেণ্টের মেঝে এমনিই পড়িয়া থাকে। অনুষ্ঠান উপলক্ষেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা গৃহ-প্রসাধনে তৎপর হইয়া উঠি। কিন্তু বাহিরের দেশগুলিতে গৃহ-সজ্জা দৈনন্দিন জীবনেরই একটি কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ সকল দেশের লোকেরা অনেক সময় পালিশ, বার্নিশ ইত্যাদি ছাড়াও অসুন্দর মেঝেকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য মেঝের উপর **রবার,**

অ্যাসফেল্ট (asphalt), **লিনোলিয়াম** (linoleum) ইত্যাদির পাত বিছাইয়া দিয়া থাকে। এই পাত মেঝের সমস্ত দীনতা ঢাকিয়া দিয়া উহার ঠাণ্ডা ভিজা ভাবকেও অনেকাংশে দূর করে। রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও শিশুদের ঘরের মেঝেয় লিনোলিয়ামের পাতের চল যথেষ্ট দেখা যায়। অনেক সময় আবার লিনোলিয়ামের পাতের উপর তেলের রঙে ছাপানো নক্শা ইত্যাদি দিয়া উহাকে আরও উজ্জ্বল ও মনোরম করিয়া তোলা হয়। অ্যাস্ফেল্টের পাত লিনোলিয়াম অপেক্ষা কম দামী এবং সেই কারণে লিনোলিয়ামের পরিবর্তে অনেকে আজকাল অ্যাস্ফেল্টের পাতই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অ্যাস্ফেল্টের পাতখানির দুইদিকেই একটি লাল রং মাখাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে উহা মেঝের সহিত আঁটিয়া যাইতে না পারে। অ্যাজ্‌বেস্টস্-এর আঁশ হইতেই অ্যাস্ফেল্ট তৈয়ারী। উহার মধ্যে রঙের গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। অ্যাস্ফেল্টের রং পাকা রং, উহা কখনও উঠিয়া যায় না বা মলিন হয় না। ছাপার মেশিনের সাহায্যে অ্যাস্ফেল্টের পাতের উপরেও নানান রকমের নক্শা ও ছবি ছাপানো হইয়া থাকে। রবারের পাত তৈয়ারী করিবার সময় উহার সহিত নানান রকম ধাতব পদার্থের গুঁড়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই গুঁড়াগুলিই রবারের পাতে মনোরম রং ও কাঠিন্য আনিয়া দেয়। রবারের লেপের দাম কিছু বেশী, কিন্তু সামান্য গরমজল অথবা এ্যামোনিয়া দিয়া উহা সহজেই পরিষ্কার করা যায়। উপরে বর্ণিত মেঝের প্রত্যেকটি পাতই জল ও সাবান দিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। তবে খেয়াল রাখিতে হইবে, যাহাতে সাবানটি বিশেষ কড়া না হয় ও জলও যেন পাতের অপর পৃষ্ঠে চলিয়া না যায়। বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে তৈয়ারী এই পাতগুলির ব্যবহারে ঘরের মেঝের ভাঙাচোরা প্রভৃতি যাবতীয় দৈন্য ও মলিনতা মুছিয়া যায়, ঘরের ভিজা স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব দূর হয় এবং পায়ে চলার শব্দও কমিয়া আসে। পাতগুলির উজ্জ্বল রং ও চাকচিক্যে ঘরের চেহারাও অনেকখানি বদলাইয়া



লিনোলিয়ামের পাত

যায়। তবে কেবল পাত বিছাইয়া অসুন্দরকে ঢাকিয়া দিলেই চলিবে না, উহার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হইবে, কারণ তোমরা পড়িয়াছ, **পরিচ্ছন্নতাই গৃহের প্রধান সৌন্দর্য**।

শহরের পাকা বাড়াগুলির মেঝে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সিমেণ্টের। কিন্তু অনেক জায়গায় আবার মোজেকের (mosaic) সাহায্যে মেঝের নানান রকম ছবি ও নক্শা করিবার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। মোজেক আর কিছুই নয়, সিমেণ্টের সহিত নানান রঙের পাথরের গুঁড়া মিশাইয়া নানান রঙের সৃষ্টি করা। মোজেকের মেঝে তৈয়ারী করিবার খরচও অনেক। এই কারণেই অনেকে

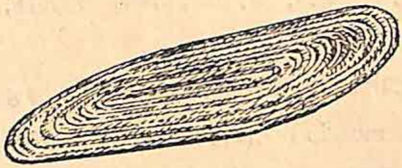


মেঝেয় মোজেকের নক্শা

আবার মেঝের চারিদিকে মোজেকের নক্সা করিয়া মাঝের প্লেন জায়গাটি নানান নক্শা করা ছোট এক টুকরা কার্পেট দিয়া ঢাকিয়া দেন। চারিদিকের মোজেকের ও মাঝখানের কার্পেটের নক্শা মিলিয়া যায়। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেঝের উপর উহার ঢাকা ও গৃহসজ্জা হিসাবে কার্পেটের বা নানান নক্শা করা শতরঞ্জির ব্যবহার দেখা যায়। কার্পেট অত্যন্ত দামী। কার্পেট সম্বন্ধে পরে বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে।

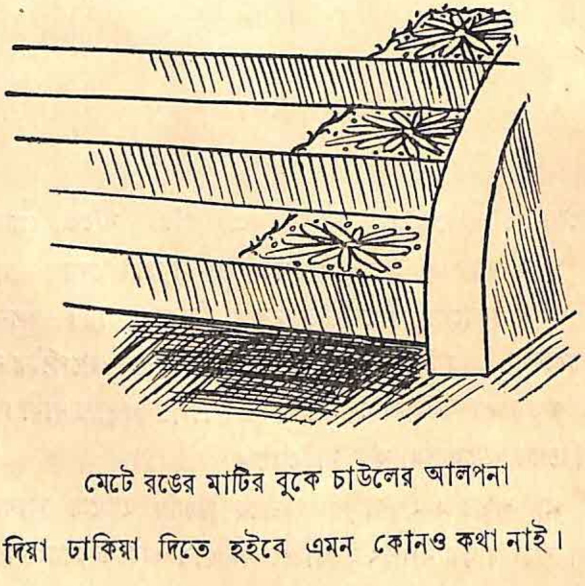
কার্পেট বা শতরঞ্জি ইত্যাদির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে আবার নানান রঙের নক্শা করা দড়ির ম্যাটিং ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু

কাঠের, সিমেণ্টের কিংবা অন্যান্য কোনও জিনিসের যে-কোনও মেঝেতেই উপরের বর্ণিত লিনোলিয়াম প্রভৃতির পাত কিম্বা রবার, কার্পেট, শতরঞ্চি ও দড়ির ম্যাটিং ইত্যাদি যে-কোনও জিনিসই ঢাকা হিসাবে ব্যবহার কর না কেন, উহা প্রত্যহ বা দু'-একদিন অন্তর পরিষ্কার করিয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক। নতুবা উহার উপর দিয়া চলাচলের দরুন মানুষের পায়ে করিয়া ও হাওয়ায়, বাহিরের যাবতীয় আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ আসিয়া ঐ মেঝের ঢাকাতে সঞ্চিত হইতে থাকিবে ও ক্রমাগতই ঘরের হাওয়াকে দূষিত করিয়া তুলিবে। মেঝের ঢাকাগুলি যদি নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঘরের মেঝে আ-ঢাকা থাকাই যুক্তিযুক্ত কারণ আ-ঢাকা খালি মেঝে পরিষ্কার করা হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ। ঘরের মেঝে ও দেওয়াল ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাই ঘরের সৌন্দর্য। ঘরের মেঝে সাজাইতে গিয়া যদি উহার পরিচ্ছন্নতাই ব্যাহত হয়, তাহা হইলে সাজানোর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল জানিবে।



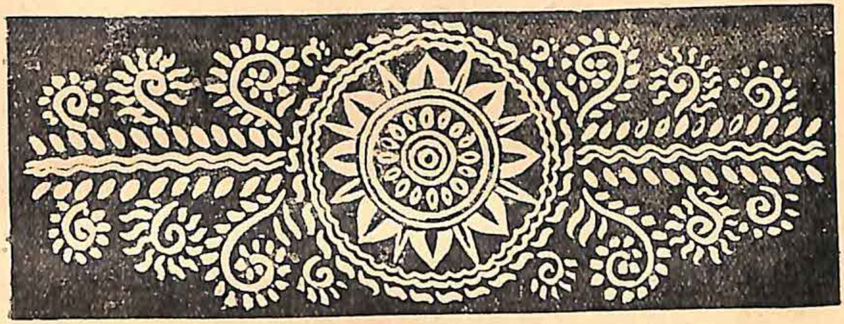
দড়ির ম্যাটিং

তা'ছাড়া, ঘরের মেঝে সাজাইতে হইলে যে, মেঝে কোনও-না-কোনও আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। গ্রামদেশে



মেটে রঙের মাটির বুকে চাউলের আলপনা

দেখিয়া থাকিবে, মাটির কুঁড়েঘরগুলিতে মেঝে ঢাকিয়া দিবার কোনও রীতিই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা গ্রামবাসীদের সামর্থ্যেরও বাহিরে। কিন্তু তথাপি গোবর দিয়া নিকানো পরিষ্কার মেঝেটিকে উহারা সাজাইবার যথেষ্ট প্রয়াস পায়। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, মাটির ছোট ঘরখানিতে চলাচলের পথটুকু ছাড়িয়া দিয়া ঘরের বিভিন্ন অংশ ও তক্তাপোশ ইত্যাদি ঘরের বিভিন্ন জিনিসগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, ঘরের মেয়েরা চাউলের গুঁড়া দিয়া আলপনা আঁকিয়া রাখিয়াছে। মেটে রঙের মাটির বুকে চাউলের গুঁড়ার শাদা আলপনায় মেঝের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই দেখিতেছ, মেঝে



পূজা-গৃহে মেঝের আলপনা

সাজাইতে হইলেই যে মেঝের আচ্ছাদন বা ঢাকা ইত্যাদির সর্বদাই প্রয়োজন তাহা নহে। ঠাকুর-দালানে বা পূজাগৃহে কখনও কার্পেট ইত্যাদির দ্বারা মেঝে

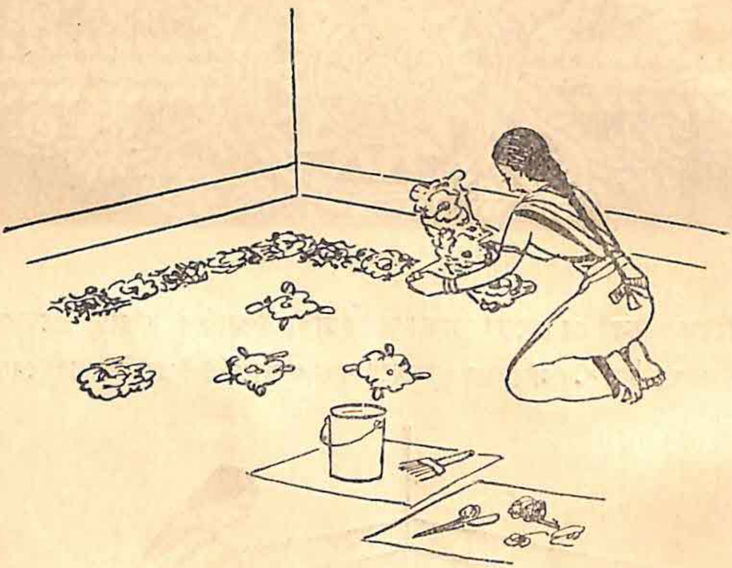


ফুলের আলপনায় মেঝের সজ্জা

সাজাইতে দেখিয়াছ কি? ঐ সকল ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ জায়গাতেই দেখিতে পাইবে, হয় চাউলের গুঁড়া, নয় ফুলের আলপনায় মেঝের সজ্জা রচনা করা

হইয়াছে। শহরের পাকা দালানগুলিতে বিভিন্ন কক্ষের সিমেণ্টের মেঝেও, চলাচল ও ব্যবহারের জায়গাগুলি ছাড়িয়া দিয়া তোমরা ঠিক সেইরূপ সহজ ভাবেই চাউলের গুঁড়ার আলপনা দিয়া সজ্জিত করিতে পার। চাউলের গুঁড়ার সহিত যদি পরিমাণ অনুযায়ী সামান্য গঁদ মিশাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে।

পশ্চিমের অনেক জায়গায় এবং আমাদের দেশেও, বিশেষত শীতপ্রধান অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সুন্দর সুন্দর নক্‌শাযুক্ত দেওয়াল-কাগজ কিনিয়া—উহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারে কাটিয়া, উহার দ্বারাই মেঝের সজ্জা রচিত হয়। ঐ কাগজগুলিকেই কখনও কখনও মেঝের চারিপাশে



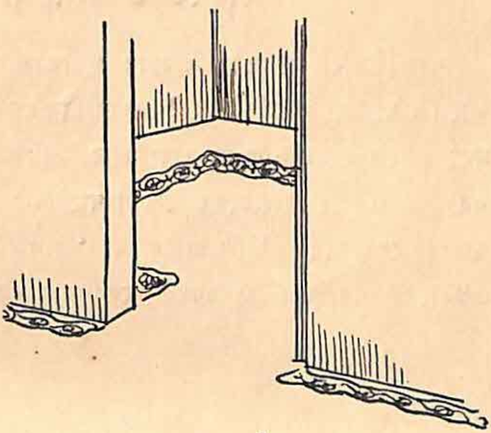
দেওয়াল-কাগজ দিয়াও মেঝের সজ্জা রচিত হয়

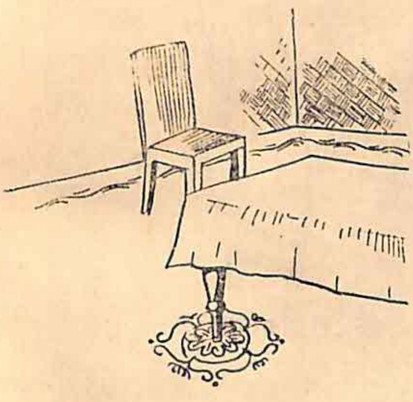
আঠা দিয়া লাগাইয়া দিতে দেখা যায়। অনেক দিনের পুরোনো সিমেণ্ট-ওঠা, ফাটলযুক্ত মেঝে হইলে উহা এই দেওয়াল-কাগজের সাহায্যে সহজে ঢাকিয়া দেওয়া যায়।

দেওয়াল-কাগজ বা আলপনা যাহাই ব্যবহার কর না কেন, সাজাইবার পূর্বে ঘরের আসবাবপত্রগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাযথ সংস্থান করিয়া লওয়া আবশ্যক—যাহাতে প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে কোনও কোনও

আসবাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার চারিদিকে আলপনার রেখা টানিয়া দেওয়া যায়। বিভিন্ন জায়গা ও তাহার অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই

চলাচলের জায়গা ছাড়িয়া দিয়া আলপনা দাও





জিনিসগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আলপনা দাও

আলপনা দিবার রীতি। ঘরের মেঝে ও অন্যান্য যে-কোনও অংশই সাজাওনা কেন, সর্বদাই সেই অংশের সহজ শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। মনে রাখিবে, **গৃহসজ্জায় আড়ম্বরের স্থান নাই**। বাহুল্য বর্জন করাই গৃহসজ্জার প্রথম ও প্রধান নীতি।

কার্পেট ও উহার ব্যবহার

কার্পেট বা গালিচার ব্যবহার পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কার্পেট বয়ন বা কার্পেটের সৃষ্টি এত প্রাচীন যে উহা কোন্ দেশে বা কোন্ সময় হইতে প্রথম চালু হয় তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে সাধারণত বলা হয় এশিয়া মহাদেশের মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেই উহার প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। 'ইজিপ্সিয়ান' বা 'পার্শিয়ান' কার্পেট আজ পৃথিবীতে একনামেই পরিচিত। তখনকার দিনে একখানি হাতে বোনা আসল কার্পেট



কার্পেট পৃথিবীর একটি সেরা জিনিস

উহার শিল্প-নৈপুণ্যে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন কারুকার্যে পৃথিবীর একটি সেরা জিনিসরূপেই পরিগণিত হইত। রাজা-মহারাজারা কার্পেট একটি অতি মূল্যবান উপহার বলিয়া মনে করিতেন। যুদ্ধ-বিজেতারা দেশ-দেশান্তর হইতে কার্পেট লুঠ করিয়া নিজেদের তাঁবুতে লইয়া আসিতেন। কখনও বা দেখা যাইত, কার্পেট রাজা-মহারাজার সিংহাসনের শোভা বর্ধন করিতেছে। তখনকার দিনে কার্পেটের উপর হাঁটিতে বা উপবেশন করিতে হইলে মানুষ জুতা খুলিয়া রাখিত।



পার্শিয়ান কার্পেট

কালক্রমে, কলে কার্পেট বোনার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে বোনা এই আসল কার্পেটগুলির মূল্য কমিয়া যায় এবং মানুষও উহার সযত্ন ব্যবহার হইতে বিরত হয়। কিন্তু তথাপি এই কার্পেট আজও গৃহসজ্জায় একটি প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেঝেয় কার্পেটের ব্যবহার আজও গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যেরই পরিচয় দেয়। একখানি ভাল কার্পেটের দাম নিতান্ত কম নয় এবং উহা এত মজবুত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় যে, বংশানুক্রমে কয়েক শত বৎসর ব্যবহার করিলেও উহা নষ্ট হয় না।

কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার :—

কার্পেট যে কেবল মেঝের ঢাকা হিসাবেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। অনেক সময় চেয়ারের উপরেও কার্পেট পাতিয়া দেওয়া হয়। কার্পেটের

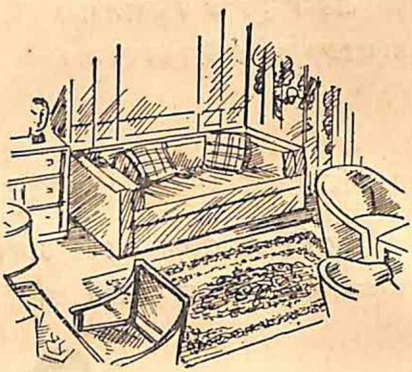


চেয়ারের উপরেও কার্পেট পাতিয়া দেওয়া হয়

আসনেরও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অনেক সময় আবার বহু বর্ণে বিচিত্র ছোট ছোট কার্পেট জায়গা-বিশেষে দেওয়ালের গায়েও ঝুলাইয়া রাখা হয়। তবে বেশীর ভাগ ধনীর গৃহেই কার্পেটের অধিক ব্যবহার দেখা যায় মেঝেতেই।

মেঝেয় কার্পেট পরিষ্কার না করিয়া অনবরত ব্যবহার করিলে উহাতে যেমন দূষিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হইয়া গৃহের আবহাওয়াকে দূষিত করিয়া তোলে, তেমনি আবার কার্পেট পাতিয়া রাখিলে ধূলাগুলি উহার আঁশের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং গৃহে সহজে ছড়াইতে পারে না।

শীতপ্রধান অঞ্চলে ঘরের মেঝেয় কার্পেটের ব্যবহার বিশেষ আরামদায়ক। মেঝেয় পাতা কার্পেট কেবল যে ঠাণ্ডা রোধ করে তাহা নহে। কার্পেটের উপর দিয়া খালি পায়ে চলিতেও বিশেষ আরাম বোধ হয় কার্পেটের জমিন নরম ও পুরু হওয়াতে চলিবার সময় শরীরে মোটেই ঝাঁকি লাগে না, অধিকন্তু পায়ের তলায় অত্যন্ত নরম ও মোলায়েম একটি অনুভূতি হয়। কাঠের বা সিমেণ্টের খালি মেঝেতে অনেক সময় চলাচল করিতে অত্যধিক শব্দ হইয়া থাকে। কার্পেটের ব্যবহারে সেই শব্দও দূর হয়। ঘরের কাঠের মেঝেয় যদি কার্পেট পাতা থাকে এবং সেই কার্পেটের উপর দিয়া কেউ যদি ভারী পদক্ষেপেও হাঁটিয়া যায়, তাহা হইলেও অনেক সময় উহা নীচের ঘর হইতে বুঝিবার উপায় থাকে না। এতদ্ব্যতীত ঘরের মেঝেয় কতকগুলি বিশেষ ধরণের কার্পেট বিশেষভাবে পাতিলে, উহা দ্বারা ঘরের আয়তনকেও ছোট-বড় করিয়া দেখানো যায়। কাজেই দেখিতেছ, গৃহসজ্জায় কার্পেট বা গালিচার স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে। পূর্বেই পড়িয়াছ, কার্পেট গৃহ-প্রসাধনের একটি প্রধান উপকরণ।



কার্পেটের অধিক ব্যবহার মেঝেতেই

গৃহ-প্রসাধনের দিক হইতে দেখিতে গেলে কার্পেটকে নীচের দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) এক রঙের কার্পেট,
(২) বহু বর্ণে বিচিত্র কার্পেট।

এই দুই রকম কার্পেটেরই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং শিল্প-নৈপুণ্যের দিক দিয়া দুইটিই মনোরম। এক রঙের কার্পেটে মেঝের আয়তনকে অনেক বড়

মনে হয়। আজকাল অনেকেই এক রঙের কার্পেটই পছন্দ করিয়া থাকেন। কারণ উহা ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র ও সাজসজ্জার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একটি স্নিগ্ধ পটভূমির কাজ করে। অধিকন্তু আধুনিক জীবনের কর্মকোলাহল ও অনবরত সংঘাতের দরুন মানুষের মন ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠে। বাহুল্য-বর্জিত এক-রঙা কার্পেট ক্লান্ত মনের বিশ্রামে সহায়তা করে। ক্লান্ত মানুষের দৃষ্টিও স্বভাবতই ক্লান্ত থাকে। সে-দৃষ্টির সম্মুখে আড়ম্বরপূর্ণ বহু-কারুকার্য-খচিত নক্শা বা চিত্রের বিভিন্ন রেখা বা রং হয়তো পীড়াদায়কই হইয়া পড়ে।

আবার বহু বর্ণে চিত্রিত কার্পেটেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ঘরের অন্যান্য জিনিসকে প্রাধান্য দিয়া মনোরম আবহাওয়া বা পটভূমি রচনা করার পরিবর্তে উহা নিজেই নিজের সৌন্দর্যে ও বর্ণ-প্রাচুর্যে প্রধান হইয়া উঠে। যে সকল কক্ষে আসবাব ও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণাদির অভাব দেখা যায়, সেই সকল কক্ষে এই কার্পেট নিজের বিচিত্র রং ও কারুকার্যে সমস্ত অভাব ঢাকিয়া দেয়। ছোট ঘরে, বহু রঙে রঞ্জিত কার্পেট ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ উহাতে ঘরের পরিসরকে আরও সংকীর্ণ মনে হইবে। কাজেই দেখিলে, কত রকমের কার্পেট, আবার তাহার ব্যবহারও কত রকমের হইতে পারে এবং উহাদের প্রয়োজনীয়তাই বা কি ও কতখানি। এইবার ঘরের পর্দা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

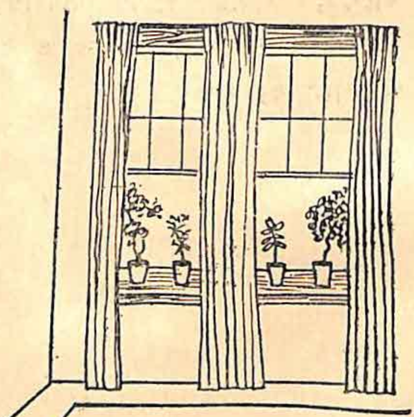
পর্দা

গৃহ-সজ্জার পর্দাও একটি প্রধান অঙ্গ। তুমি কিছুদিন অন্তর অন্তর প্রতিনিয়ত পর্দার পরিবর্তন কর—দেখিবে তোমার গৃহখানিও নিত্যই নূতন রূপ ধারণ করিবে। পর্দা-সংযোজনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির ও মাত্রাজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। পর্দা—দেওয়ালের রং, ঘরের আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণাদির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিবার একটি যোগসূত্র।



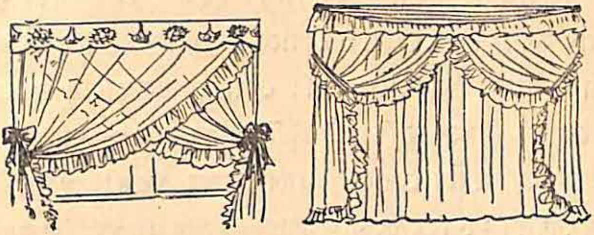
পর্দা গৃহসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ

পর্দা বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কতকগুলি পর্দা প্রায় জানালার কাচের সঙ্গে লাগাইয়া জানালার সমান সমান করিয়া টাঙানো হয়। কতকগুলি পর্দা আবার জানালা হইতে কিছুটা দূরে একটি পিতল বা লোহার 'রড' হইতে মেঝের সঙ্গে লাগাইয়া বা মেঝে হইতে এক ইঞ্চি উপর করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই পর্দাগুলি সাধারণত মোটা কাপড়ের হইয়া থাকে ও উহাতে যথেষ্ট ভাঁজ পড়ে। গৃহের প্রচ্ছদপট বা পটভূমি রচনা করিতে এই পর্দাগুলি অদ্বিতীয়। কতকগুলি জানালা আছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, যেগুলি ঘরের ভিতর ও বাহির দুইদিকেই খোলা যায়। এই জানালাগুলির পর্দা



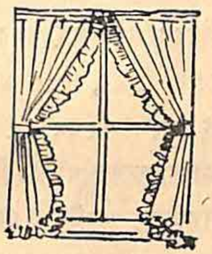
উহাতে যথেষ্ট ভাঁজ পড়ে

আবার অন্য ধরণের। জানালার ফ্রেমের সহিত এই পর্দাগুলি আঁটা থাকে, যাহাতে জানালা খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময় পর্দার জন্য কোনও



নূতন ডিজাইনের পরিকল্পনা করা হয়

রকম অসুবিধা না হয়। এই পর্দাগুলিকে টানিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য পিতল বা টিন কখনও বা কাঠের একরকম ক্লিপের মতন ব্যবহৃত হয় ইহা ছাড়াও ভালো ভালো ফিতা ইত্যাদি দিয়া বিভিন্ন জায়গায় পর্দাগুলিকে বাঁধিয়া পর্দার নূতন নূতন 'ডিজাইন'-এর পরিকল্পনা করা হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জানালার আকার ও আয়তন অনুযায়ী আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারের পর্দা তৈয়ারী হইয়া থাকে ও কুচি, ফ্রিল, লেইস ইত্যাদি লাগাইয়া প্রায় প্রতি পর্দায়ই কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য রচনার চেষ্টা করা হয়।



ফ্রেমের সহিত আঁটা থাকে

পর্দার কাজ ও প্রয়োজনীয়তা :—

পর্দার প্রয়োজন কেবলমাত্র যে কোনও অপ্রীতিকর দৃশ্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বা গৃহের আব্রু রক্ষা করিবার জন্যই তাহা নহে। পর্দা থাকিলে বাহিরের ধূলাবালিও সহজে গৃহে আসিতে পারে না, কতকটা বাধা পাইয়া পর্দায় ঠেকিয়া যায়।

পর্দার প্রয়োজন প্রধানত জানালার সজ্জায়। পর্দা জানালার কাঠামো হিসাবে ব্যবহৃত হয়—জানালার কাঠের কাঠিন্য পর্দা-সংযোজনায় কতকটা নরম হইয়া প্রতিভাত হয় ও দৃষ্টির স্নিগ্ধতা আনয়ন করে। বাহিরের দৃশ্যাবলীকে ঢাকিয়া দেওয়া বা অস্পষ্ট করিয়া তোলা পর্দার কাজ নয়। পর্দার কাজ বাহিরের **দৃশ্যাবলীর দৃশ্যপট হওয়া,** অর্থাৎ বাহিরের দৃশ্যাবলীকে পর্দার ফ্রেমে

আরও মনোরম করিয়া ফুটাইয়া তোলা। গৃহসজ্জা হিসাবে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। পর্দা সংযোজনায় যথেষ্ট রুচির প্রয়োজন। বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন পর্দার নিপুণ সংযোজনায় কক্ষখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া উঠে। পর্দা গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান উপকরণ। ঘরের মধ্যে যেখানে উজ্জ্বল-রং-বিশিষ্ট ও বহু-কারুকার্য-খচিত নানান আসবাবপত্র থাকে, পর্দা সেখানে প্রচ্ছদপটের কাজ করে। অর্থাৎ পর্দা সেখানে পিছনে থাকিয়া ঐ জিনিসগুলির রং ও সৌন্দর্যকে সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে। আবার যেখানে আসবাবপত্রের স্বল্পতায় গৃহস্বামী বিব্রত বোধ করেন, সেখানে মনোরম রং বা নক্শার একখানি বড় পর্দা নিজের সৌন্দর্যে নিজেই ফুটিয়া ওঠে ও গৃহের সমস্ত দীনতা ঢাকিয়া দেয়। কাজেই দেখিতেছ, পর্দা একাধারে **গৃহসজ্জা** ও **গৃহসজ্জার প্রচ্ছদপট**, দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়।

ইহা ছাড়াও বাহিরের আলোককে উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল করিতে পর্দার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। দরজা-জানালায় পর্দা টাঙানো থাকিলে বাহিরের অত্যুজ্জ্বল প্রখর আলোক কথঞ্চিৎ ম্লান ও স্নিগ্ধ হইয়াই গৃহে প্রবেশ করে। যেমন, ফিকে নীল রঙের পর্দার মধ্য দিয়া যখন আলো ঘরে আসে, সেই আলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মনে হয়। এইভাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পর্দার সাহায্যে ঘরের আবহাওয়াকে মনোরম ও স্নিগ্ধ করিয়া তোলা যায়। আবার অপরপক্ষে একটি উত্তরমুখী ঘরে—যেখানে সূর্যালোক কদাচিৎ প্রবেশ করে, সেখানে এই নীল পর্দা ঘরের আবহাওয়াকে আরও ম্লান, আরও অন্ধকার করিয়া তুলিবে। সেই ঘরের আলোককে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলার জন্য হাল্কা হলুদ রং, সোনালী রং, অথবা ফিকে গোলাপী রঙের পর্দা সংযোজনা করাই যুক্তিযুক্ত। কাজেই দেখিতেছ, পর্দার সাহায্যে কিভাবে ঘরের আলোককে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

নিপুণভাবে পর্দা-সংযোজনায় জানালা-দরজার আয়তনও আপাতদৃষ্টিতে ছোট-বড় প্রতীয়মান হয়। যেমন অত্যধিক লম্বা জানালার দৈর্ঘ্য কমাইয়া তুমি যদি উহাকে অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া দেখাইতে চাও, তাহা হইলে উহাতে সেই অনুযায়ী পর্দা সংযোজনা কর। অর্থাৎ পর্দা যোজনার দ্বারা জানালার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেখানো যায়। কাজেই দেখিলে, গৃহসজ্জায় পর্দার প্রয়োজনীয়তা কেন এত অধিক এবং পর্দা-সংযোজনায় মাত্রাজ্ঞান ও সামঞ্জস্য-বোধেরই বা কেন এত প্রয়োজন।

পুষ্পবিন্যাস

গৃহসজ্জায় পুষ্পবিন্যাসও একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। অতি দরিদ্রের কুটিরেও যেখানে প্রতি বস্তুতেই দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট, সেখানেও সুবিন্যস্ত কয়েকটি লতা বা পুষ্প-স্তবক গৃহের রূপ আমূল বদলাইয়া দিতে পারে। জাপানে, যত দরিদ্রই হোক না কেন, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই কিছু-না-কিছু ফুলের গাছ দেখা যায়। বিশেষ করিয়া চেরী ফুলের গাছ নাই এমন গৃহ জাপানে বিরল। জাপানীদের পুষ্পপ্রীতি আসাধারণ। প্রতি কক্ষে ফুল, প্রতি প্রবেশপথে নিপুণভাবে রক্ষিত লতা, দেখিলেই মনে হয় উহাই যেন জাপানী জীবনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশে গৃহস্থের সংসারে ফুলের প্রয়োজনীয়তা এখনও পূজার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে—যদিও আজকাল সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে দৈনন্দিন জীবনেও বিভিন্ন কাজকর্মে ফুলের অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহার দেখা যাইতেছে।



পুষ্পবিন্যাসের এতই প্রয়োজন

পুষ্পবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা :—

পুষ্পবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা যে কেবলমাত্র গৃহের শোভা বর্ধনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। উহা গৃহস্থের মনকেও প্রফুল্ল করিয়া তোলে। ফুলের বিচিত্র রূপ, বর্ণ ও গন্ধ মনের যাবতীয় গ্লানি ও মলিনতা মুছিয়া দেয়। কর্মের অন্তরালে সুবিন্যস্ত একগুচ্ছ পুষ্পের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই দেখিবে কিছুক্ষণের জন্য হইলেও তোমার মন যেন বিরাট বাহিরের দিকে চলিয়া যাইবে। এই কারণেই সংসারীর পক্ষে সংসারে পুষ্পবিন্যাসের এতই প্রয়োজন। ফুলের রূপ ও সৌরভ কক্ষের অন্যান্য বস্তুর সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই চলে এবং কক্ষের আবহাওয়াকেও মনোরম করিয়া তোলে। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, তোমার পরিশ্রান্ত মন যখন পুষ্পের সংস্পর্শে আসে, উহা দেখিতে

দেখিতেই সতেজ ও কর্মক্ষম হইয়া উঠে। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। **সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ জীবনের সংস্পর্শে আসিলে, মানুষের জীবনও কিছুক্ষণের জন্য সুন্দর** হইয়া উঠে—উহা যতই স্বল্পকালস্থায়ী হোক্ না কেন।

পুষ্পবিন্যাসের রীতি :

পুষ্প নির্বাচন :—পর্দা বা কার্পেট ব্যবহারে যেমন, তেমনি পুষ্পবিন্যাসেও কতকগুলি নিয়ম বা রীতি আছে। পুষ্পবিন্যাস করিতে গেলে প্রথমেই চিন্তা করিবে উহা কোন্ কক্ষের কি প্রয়োজনের জন্য বিন্যস্ত হইতে চলিয়াছে।



বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন ধরণের পুষ্প প্রয়োজন

পুষ্পবিন্যাসেও বিভিন্ন কক্ষ ও বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন কাজের দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিবে। যেমন রোগী-কক্ষের জন্য পুষ্প-নির্বাচন বা উহার বিন্যাস অন্যান্য কক্ষ হইতে সাধারণত কিছুটা ভিন্ন হইবে।

কোনও কক্ষের জন্য পুষ্প-নির্বাচন করিতে প্রথমেই চিন্তা করিবে, সেই কক্ষের রঙের পরিকল্পনার সহিত তোমার ফুলের রূপ ও রঙের সামঞ্জস্য থাকিবে কিনা। লক্ষ্য রাখিবে, ঘরের দেওয়ালের রং, পর্দার রং, আসবাবপত্র ইত্যাদির রং মিলিয়া ঘরের মধ্যে যে সহজ সুর ও সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তোমার নির্বাচিত লেফু যেন সে সমন্বয় নষ্ট না হয়, বা সে সহজ সুর কাটিয়া না যায়।

পুষ্প সংগ্রহ করিবার সময় তুমি আরও লক্ষ্য রাখিবে, ঐ পুষ্প তুমি কক্ষের কোন্ স্থানে, কিভাবে, কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে বিন্যস্ত করিতে চলিয়াছ। বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন ধরণের পুষ্প সংগ্রহ করিতে হয়। যথা, খাবার টেবিলে তুমি যেমন ফুল ব্যবহার করিবে, জানালার কার্নিসের জন্য তুমি সেরূপ ফুল নির্বাচন না করিয়া ভিন্ন ফুল নির্বাচন করিবে। কিংবা ধর, একটি উঁচু জায়গায় যে ধরণের ফুল ব্যবহৃত হইবে, একটি নীচু জায়গায় তদ্রূপ হইবে না।

অনেক সময় দুই-তিন রঙের ফুল দিয়াও ঘর সাজানো হইয়া থাকে। সেই সকল ক্ষেত্রেও পুষ্প সংগ্রহ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে বিভিন্ন ফুলের রং, বৃন্ত ও আকারের মধ্যে যেন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যতই সুন্দর ও সৌরভযুক্ত ফুল হউক না কেন, অন্যান্য ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবে উহা নিতান্তই বেমানান ও বেখাপ্‌পা দেখাইতে পারে।

ফুলদানি বা পুষ্পের আধার নির্বাচন ঃ—

পুষ্পের ন্যায় পুষ্পের আধার নির্বাচনেও যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন। অনেক সময় পুষ্পের আধারের জন্যই পুষ্পের সৌন্দর্য আরও বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পুষ্পের ভাল আধার সংগ্রহ করিতে হইলেই যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা একবারও মনে করিও না। তোমাদের গৃহে নিশ্চয়ই জ্যাম, জেলি ও অন্যান্য আহার্য দ্রব্যাদি বহু সুদৃশ্য বোতল ও টিনে করিয়া আমদানী হয়। সামান্য রুচি-বোধ থাকিলে এইগুলিকেই তোমরা পুষ্প-সজ্জায় বিভিন্ন ফুলদানি ও পুষ্পের আধার হিসাবে ব্যবহার করিতে পার। বহু-কারুকার্য-খচিত ফুলদানিতে ফুল সাজাইলে ফুলের সৌন্দর্য অপেক্ষা আধারের সৌন্দর্যই প্রধান হইয়া উঠে। এই কারণেই দামী উজ্জল রং-বিশিষ্ট কারুকার্য-খচিত ফুলদানি পুষ্প-বিন্যাসে বিশেষ সহায়তা করে না। আধারের জন্য সাধারণত নরম কাঁচা মাটির রং, কাঠের রং,

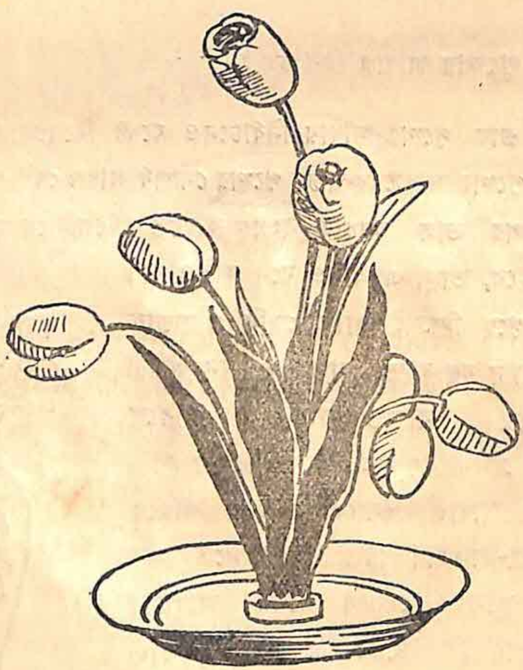


আধারের সৌন্দর্যই প্রধান হইয়া উঠে

হাল্‌কা নীল বা সবুজ অথবা একেবারে সাদা কিংবা কালো প্রভৃতি রং-এর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুষ্পবিন্যাসের জন্য পরিষ্কার কাঁচের ফুলদানিও মন্দ নয়।

ফুলগুলি স্বাভাবিক নিয়মে যে ভাবে প্রকৃতির বুকে ও বৃন্তে ফুটিয়া থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আধার নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত। যেমন, যে সমস্ত ফুলগুলির বোঁটা ছোট, সেই সমস্ত ফুলের জন্য নীচু ফুলদানিই প্রশস্ত, উঁচু ফুলদানিতে এই সকল ফুল সাজাইলে অত্যন্ত বেমানান দেখাইবে। অপরপক্ষে দীর্ঘ-বোঁটা-যুক্ত ফুল, উঁচু বা নীচু উভয় প্রকার ফুলদানিতেই সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা যায়। পুষ্পগুচ্ছের আকার, আয়তন ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুষ্পের আধার নির্বাচন করিবে। পুষ্প ও পুষ্পের আধার কি-ভাবে নির্বাচন করিতে হয়, উহা জানিলে। এখন দেখা যাক্, পুষ্পগুলিকে কিভাবে বিন্যস্ত করিবে।

পুষ্পবিন্যাসঃ—যে ফুলগুলিকে সাজাইবে উহার মধ্যে যে ফুলটি



পর পর ধাপে ধাপে নামিয়া আসে

বর্ণ, বৃন্ত, আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট সেই ফুলটি বাছিয়া লও। সেই ফুলটিকে মাঝখানে রাখিয়া উহার চারিদিকে অন্যান্য ফুলগুলি সাজাইবে।

ফুল সাজাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে মাঝখানের দীর্ঘতম অথবা বৃহত্তম ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্তের দৈর্ঘ্য অনুসারে অন্যান্য ফুলগুলি পর পর ধাপে ধাপে নামিয়া আসে। পুষ্পসজ্জায় সমতা বা সামঞ্জস্যই প্রধান এবং প্রথম



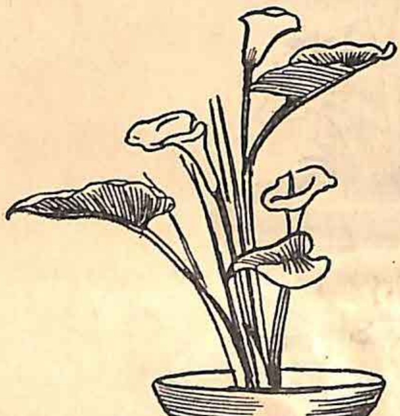
ফুলগুলিকে আলগা রাখিবে

বিবেচনার বিষয়। মাঝখানের ফুলটির চারিপাশে অন্যান্য ফুলগুলিকে এমনভাবে সাজাইবে, যাহাতে ঐ ফুলটির অন্যান্য ফুলগুলির সহিত সামঞ্জস্য ও সমতা থাকে। যে ফুলগুলি মাঝের ফুলটি হইতে অনেক ছোট বা অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, অর্থাৎ যে ফুলগুলি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না—যতদূর সম্ভব সেই ফুলগুলিকে মাঝের ফুলটি হইতে দূরে রাখ, যাহাতে তফাৎ সহজে চোখে না পড়ে।

ফুল সাজাইবার সময় ফুলগুলি আঁট ছিপির ন্যায় করিয়া ফুলদানির মধ্যে ঠেলিয়া দিবে না। যতদূর সম্ভব ফুলগুলিকে আল্‌গা রাখিবে। যদি দেখ ফুলদানির মধ্যে বোঁটাগুলি পরস্পরের গায়ে ঠাসিয়া গিয়াছে তাহা হইলে ফুলদানির মধ্যে আঙুল দিয়া বোঁটা নাড়িয়া চাড়িয়া আলগা করিয়া দাও। ফুল সাজাইবার সময় সমস্ত ফুলের বোঁটাগুলি কখনও এক মাপের করিয়া কাটিবে-না। কোনটি লম্বা, কোনটি ছোট, এইভাবে বিভিন্ন মাপের বোঁটা কাটিলে,

ফুলগুলি আর ছিপির মত হইয়া সমস্তই ফুলদানির মুখের কাছে গিয়া জড় হইতে পারে না। ফুলগুলি এমনভাবে সংন্যস্ত করিবে, যাহাতে বিভিন্ন ফুলের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং বিভিন্ন মাপের বোঁটাগুলির মধ্যেও সামঞ্জস্যের অভাব না হয়।

পুষ্পবিন্যাসে পাতার প্রয়োজনও কম নয়। ফুলের পাতা নির্বাচন করিতেও যথেষ্ট বিচার ও বিবেচনার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পাতাগুলির যথাযথ নির্বাচন ও সংস্থানের জন্যই ফুলের রূপ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। যতদূর সম্ভব যে গাছের যে ফুল, সেই গাছের পাতা দিয়াই পুষ্পবিন্যাস করা উচিত, কারণ উহাতে মনে হইবে পাতার বুকে ফুলটি যেন স্বাভাবিকভাবেই ফুটিয়া রহিয়াছে। একই পাতা পাওয়া যদি দুষ্কর হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব পাতাগুলি যেন উহার কাছাকাছি হয় তাহার চেষ্টা করিবে। অত্যধিক পাতা দিয়া ফুলদানিকে বোঝাই করিবে না, উহাতে ফুলের প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়।



পাতার বুকেই যেন ফুলটি ফুটিয়া আছে

তুমি যে-স্থানের জন্য যে-ভাবেই ফুল সাজাও না কেন, লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহাদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট না হয়। ফুলগুলি পাতার বুকে গাছে যে ভাবে ফুটিয়া থাকে, তুমি যদি তোমার পুষ্পবিন্যাসের মধ্যে সেই ভাবটি বজায় রাখিতে পার, তাহা হইলেই জানিবে তোমার পুষ্প-রচনা নিখুঁত হইয়াছে। কারণ **স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কাছে অন্যান্য সকল সৌন্দর্যই ম্লান হইয়া যায়।**

ফুলগুলি সাজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে—ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে নূতন দৃষ্টি লইয়া ফুলগুলিকে দেখিবে। হয়ত তোমার মনে হইবে কোনও একটি বোঁটা লম্বা হইয়াছে বা কোনও একটি ফুল ঢাকিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উহাকে বদলাইয়া দিবে। এই কারণেই প্রথমবার বোঁটাগুলিকে একটু লম্বা করিয়া

রাখিয়া দিবে, যাহাতে প্রয়োজনমত উহাকে পরে কাটিয়া ছোট করিয়া লওয়া যায়। প্রথমবারেই কোন্ ফুলটিকে কোন্ দিক হইতে সুন্দর দেখাইবে উহা চোখে নাও পড়িতে পারে। সৌন্দর্যের মাপকাঠি প্রথম দৃষ্টিতেই নির্ণয় করা সব সময়ে সম্ভব হয় না।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পুষ্পসজ্জার রীতিগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। কিন্তু সব সময়েই যে অর্থব্যয় করিয়া ফুল কিনিয়া গৃহ রচনা করিতে হইবে এমন নয়। পুষ্পবিন্যাসের মধ্যে লতাপাতা, ডালপালা ইত্যাদির সজ্জাও একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পুষ্পের যথাযথ ব্যবস্থা করা অনেক সময় দুষ্কর। সেই সকল



ডালপালা ইত্যাদি দিয়াও ঘর সাজাইতে পার

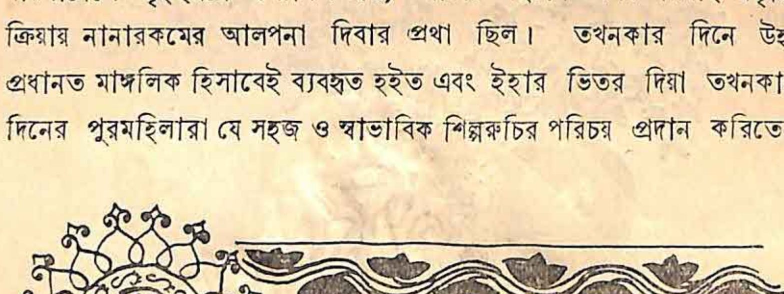
ক্ষেত্রে ডালপালা, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি দিয়াও অনেক সময় মনোরম করিয়া গৃহসজ্জা রচনা করিতে পার। সামান্য সবুজের ছোঁয়া গৃহের রূপই আমূল বদলাইয়া দিতে পারে। সর্বদাই মনে রাখিবে ঋতু অনুযায়ী সহজলভ্য ফুল, লতাপাতা, গাছের ডালপালা ইত্যাদি দিয়া গৃহসজ্জা রচনা করাই পুষ্প-বিন্যাসের মূলরীতি।

আলপনা

আলপনার চল ঃ—

অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায় মানুষ নানান লোকাচার, পূজা, অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে মেঝেয় নানাবিধ আলপনা ও চিত্র অঙ্কন করিয়া উহাদের গৃহখানিকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিত। গৃহসজ্জায় আলপনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইহা একটি কারুকলা, রূপসজ্জাই আলপনার প্রধান লক্ষণ।

আমাদের বাংলাদেশেও বহুকাল হইতেই আলপনার প্রচলন রহিয়াছে। প্রাচীন-বাংলার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু বৎসর পূর্বেও বাংলাদেশে গৃহস্থঘরে লৌকিক-ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান এবং বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ায় নানারকমের আলপনা দিবার প্রথা ছিল। তখনকার দিনে উহা প্রধানত মাঙ্গলিক হিসাবেই ব্যবহৃত হইত এবং ইহার ভিতর দিয়া তখনকার দিনের পুরমহিলারা যে সহজ ও স্বাভাবিক শিল্পরুচির পরিচয় প্রদান করিতেন



লক্ষ্মীপূজার আলপনা—মাঝখানে ধানের ছড়া ও লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

তাহা সত্যই প্রশংসনীয়; সুতরাং ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, এই আলপনা বাংলাদেশে পুরনারীদেরই দান—বংশানুক্রমে তাঁহাদেরই সহজ প্রতিভায় ইহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙালীর পর্ণকুটিরে শিল্পসাধনার অতি সামান্য উপকরণ হইতে বাংলার কুলমহিলাদের স্বাভাবিক শিল্প-অনুরাগ ও সহজ প্রতিভার মধ্যেই এই আলপনা-শিল্পের জন্ম। তাঁহারা বরাসনের পিঁড়ি,

ঘরের সিকা ও ঘরের দেওয়ালে যেসব সুন্দর আলপনা আঁকিয়া অন্তঃপুরের শোভাবর্ধন করিতেন, পল্লীগ্রামে তাহার ধারা আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনের মোচালতা, কলাছড়ি, কলমিলতা, শঙ্খলতা প্রভৃতি আলপনার শিল্প-চাতুর্য সত্যই প্রশংসনীয়।

আলপনা নানা রকমের হইয়া থাকে। স্থান-বিশেষে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রূপ ও আকৃতির আলপনার প্রয়োজন হয়; যেমন, মেঝের কয়েকটি বিশেষ আলপনা ছাড়া বেশীর ভাগ আলপনাই দেওয়ালে আঁকিলে বেমানান দেখা যায়। আলপনা দিবার সময় দেওয়াল বা মেঝের আকার ও অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আলপনাতেও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও সহজ মাত্রাজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। আলপনার দুইটি দিক্ আছে—বাহিরের আকৃতি ও ভিতরের শৃঙ্খলা বা বিভাগ। আলপনা দিবার সময়ে বিশেষ ধৈর্য সহকারে এই দুইটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, মণ্ডন-শিল্পের রচনায় রূপ ও ছন্দের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই আলপনা আঁকার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

পূজা বা মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্ম ভিন্ন গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনেও আলপনার একটি বিশেষ স্থান আছে। কারণ ইহার দ্বারা গৃহসজ্জার অনেকখানি সহায়তা



বরাসনের পিঁড়ি চিত্রণ

হয়। অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, মনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য শয়নঘরের মেঝেতে আলপনা দিবার রীতি আছে। মানুষ যেখানে বাস করে সেখানকার

পরিবেশটি যাহাতে সর্বপ্রকারে মনোরম হয়, সেইদিকে তাহার একটি স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। স্বল্পব্যয়ে প্রতিদিন গৃহের ভিতরের সৌন্দর্য-সৃষ্টি করিবার পক্ষে আলপনা অত্যন্ত উপযোগী।

আলপনা দিবার কতকগুলি রীতি-নীতি আছে পূর্বেই বলিয়াছি। যে স্থানটিতে আলপনা দিতে হইবে, প্রথমে সেই স্থানটি ধুইয়া মুছিয়া বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। তাহার পর স্থানটির আকার, পারিপার্শ্বিক এবং আলপনা দিবার উপলক্ষ কি—এই সমস্ত ভাবিয়া কি ধরণের আলপনা দিলে মানাইবে, তাহা মনে মনে কল্পনা করিবে। আলপনা সাধারণত সাদা রঙের হইয়া থাকে, তবে উহাতে বর্ণ-বৈচিত্র্য তেমন ভাবে প্রকাশ পায় না বলিয়া আজকাল রঙিন আলপনার প্রচলন হইয়াছে। আলপনার নক্‌শাটি ঠিক করিয়া লওয়া দরকার, তাহা না হইলে উহার জ্যামিতিক রেখাগুলি পরস্পর সমান হইবে না এবং সমগ্র আলপনাটিতেই রূপ ও ছন্দ বজায় থাকিবে না। তাহার পর সেই নক্‌শা ধরিয়া কেন্দ্র হইতে আলপনা আঁকিতে আরম্ভ করিবে।



নক্‌শাটি ঠিক করিয়া লইবে

আগেই বলিয়াছি, অল্প পরিশ্রমের কাজ হইলেও ইহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও অখণ্ড মনোযোগের প্রয়োজন, নতুবা এতটুকু অসাবধান হইলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। আলপনা আঁকা শেষ হইবার পর উহার আশপাশ খুব সাবধানে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। আলপনার চারিদিকে যতই ফাঁকা জায়গা থাকিবে, উহা দেখিতে ততই সুন্দর হইবে।

আজকাল বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই গৃহ-শিল্পটি শিক্ষা দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনে আলপনা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বলিতে গেলে বাংলা-দেশে রবীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে এই গৃহ-শিল্পটির পুনরুজ্জীবন করেন। এবং সেইজন্য আজকাল আলপনা-শিল্পে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

সাধারণত চাউলের গুঁড়া দিয়াই আলপনা দিতে হয়। একটি বাটিতে কিছু আতপ চাউল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে, শিলে ঐ চাউল খুব মিহি করিয়া বাটিয়া লইবে। ঐ বাটা চাউলের সহিত সামান্য জল মিশাইবে, খেয়াল রাখিবে যাহাতে ঐ তরল পদার্থটি বেশ ঘন হয়। এইভাবে আলপনার মণ্ড তৈয়ারী করিতে হয়। তারপর একখানি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দক্ষিণ-হস্তের আঙুলে



আঙুল দিয়াই তুলির কাজ করিতে হয়

জড়াইয়া লইবে। আলপনায় সাধারণত তুলির ব্যবহার হয় না। হাতের আঙুল দিয়াই তুলির কাজ করিতে হয়। সেইজন্য আঙুলে ঐভাবে বস্ত্রখণ্ড জড়াইবার নিয়ম। তাহার পর ঐ চাউল-বাটা জলের পাত্রে বারে বারে আঙুল ডুবাইয়া লইয়া আলপনা আঁকিতে হয়।

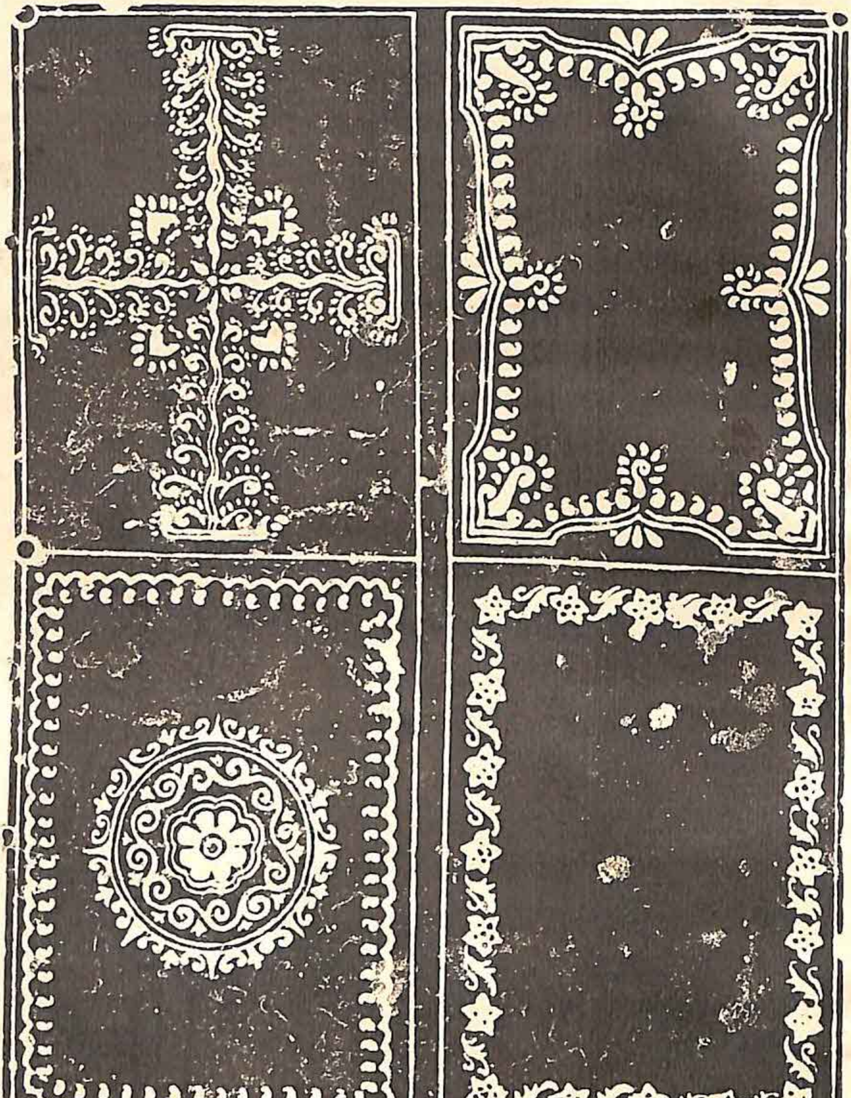
অনেক জায়গায় চাউলের গুঁড়া দিয়া শুক্‌নো আল্‌পনা দিবার রীতি দেখা যায়। শুক্‌নো আলপনায় চাউলের গুঁড়ার সহিত জল মিশানো হয় না। চাউলের গুঁড়ার সহিত অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রয়োজন মত লাল, হলুদ বা

সবুজ রং ইত্যাদি মিশাইয়া লওয়া হয়। এই ধরণের শুক্‌নো আলপনা মেঝে বা সমতল স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও দেওয়া চলে না। দেওয়ালের পক্ষে ভিজা আলপনাই প্রশস্ত।

মেঝেয় ও দেওয়ালে দিবার জন্য আলপনার কয়েকটি নক্‌শা এখানে দেওয়া হইল।



দেওয়ালে দরজা-জানালার খিলানের উপরে দিবার
আলপনার নক্‌শা



মেঝের আলপনার নক্‌শা।

গৃহ-পরিচালনা

গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য

তোমরা ছোট-বড় সকলেই গৃহে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস কর, কিন্তু উহা কিরূপে সম্ভব হয় কখনও ভাবিয়াছ কি ? তোমাদের দেহ ও মনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যে দুটি মঙ্গলহস্ত অহরহ নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহার কথা হয়ত কখনও চিন্তা কর নাই। গৃহকর্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়াই সংসার গড়িয়া উঠে ; গৃহকর্ত্রীর উপরেই গৃহ-পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।



দুটি মঙ্গলহস্ত নিয়োজিত রহিয়াছে.

গৃহ-পরিচালনার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য—গৃহের যথাযথ পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রতি গৃহকেই একটি সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলার নিলয় করিয়া গড়িয়া তোলা। সুনিপুণ পরিচালনার দ্বারা **গৃহ-সৃষ্টি করাই গৃহকর্ত্রীর আসল কাজ।**

গৃহের যথাযথ পরিচালনার উপরেই নির্ভর করে গৃহের অধিবাসীদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। কেবল প্রচুর অর্থ থাকিলেই যে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা

করা যায়, তাহা নহে। উহাতে যথেষ্ট বিবেচনা ও বিচারের প্রয়োজন হয়। তোমরা জান, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, রন্ধন, ভোজন, স্নান, নিদ্রা, বিশ্রাম, সংসারে ব্যয় ও সঞ্চয়, শুশ্রূষা প্রভৃতি যে কাজগুলি প্রতিনিয়তই গৃহাভ্যন্তরে সম্পাদিত হয় সেইগুলির সু-পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। গৃহাভ্যন্তরের এই দৈনন্দিন কাজগুলির সুনিয়ন্ত্রণ করাই গৃহ-পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি মানুষ যখন সু-পরিচালনার দ্বারা, উহাদের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই কেবল উহারা সংসারকে বা সমাজকে উহাদের যাহা দেয়, তাহা দিতে পারিবে। কাজেই দেখিতেছ, গৃহের সুপরিচালনা এই দিক্ দিয়াও আমাদের সহায়তা করে।

গৃহই গড়িয়া তোলে সমাজ। সমাজ আর কিছুই নয়—কতিপয় গৃহের সমষ্টি মাত্র। সু-পরিচালনার দ্বারা গৃহকর্ত্রী যদি গৃহের সুখ ও সম্পদ্ ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজও দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সুতরাং গৃহের সম্পদ বাড়াইতে ও সেই সঙ্গে সমাজকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে গৃহ-পরিচালনার গুরুত্ব কম নয়।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই নির্ভর করে গৃহের উপর। যে গৃহ সু-পরিচালিত নয়, বা যে গৃহ সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর নয়—সে গৃহের শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে না। শিশুর শরীর ও মনের সু-গঠনের জন্য সু-পরিচালিত গৃহের একান্ত প্রয়োজন। গৃহের সু-পরিচালনার উপরেই নির্ভর করে শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। কেবলমাত্র শিশু কেন—প্রত্যেক মানুষেরই সুরুচি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতি মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সু-পরিচালিত গৃহ ও গৃহ-পরিবেশ হইতেই আসে। কাজেই দেখিতেছ, সমাজ গঠনে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সূক্ষ্ম অনুভূতিতে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলার কাজে গৃহ-পরিচালনা প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

গৃহ-পরিচালনার কাজ :—

তোমরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু চিন্তা করিয়াছ কি কখনও ঐ পরিবারের মধ্যে প্রতিনিয়ত কত রকম কাজ সম্পাদিত

হইতেছে? সংসারের কাজগুলিকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করিবার বিষয় ভাবিয়াছ কি কখনও?

পূর্বেই বলিয়াছি, গৃহ-পরিচালনা বলিতে আমরা সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে যে কাজগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে ঐগুলিরই যথাযথ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়া থাকি। গৃহের কাজগুলিকে প্রধানত গৃহ-রচনা, খাদ্য-ব্যবস্থা, পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা, শিশু-শিক্ষা ও সংসারের অপরাপর সমস্যা ইত্যাদি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি ভাগের এখন মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে।

গৃহ-রচনা—গৃহ-রচনা বলিতে আমরা গৃহ-পরিকল্পনা, গৃহ-পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনাদি নিষ্কাশন, গৃহ-সজ্জা, আসবাবপত্র ইত্যাদির যথাযথ সংস্থান ও বিন্যাস



কিভাবে শ্রীমণ্ডিত করিবে

প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ই বুঝিয়া থাকি। তুমি যে-গৃহের পরিচালনার ভার লইয়াছ, প্রথমেই দেখিবে তুমি কিভাবে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা উহার বিভিন্ন কক্ষগুলিকে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়া সংসারের সকল প্রয়োজন মিটাইতে পার। তার পরেই তুমি চেষ্টা করিবে, ভিতরে ও বাহিরে উহার পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিয়া, সজ্জার বিভিন্ন উপকরণগুলি দিয়া কিভাবে উহাকে শ্রীমণ্ডিত ও স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়া তুলিতে পার।

খাদ্য-ব্যবস্থা—খাদ্য-পরিকল্পনা ও খাদ্য-ব্যবস্থা গৃহ-পরিচালনার একটি প্রধান ও অপরিহার্য অঙ্গ। তোমরা প্রত্যেকেই জান খাদ্যের উপরেই আমাদের পুষ্টি ও প্রাণ নির্ভর করে। সুতরাং খাদ্য-ব্যবস্থায় খাদ্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও বিবেচনা আবশ্যক। খাদ্য-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিলে কোন্ বয়সে বা কোন্ অবস্থায় কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, উহার প্রস্তুতি-প্রণালী বা উহা দিবার রীতি

কি ইত্যাদি সকল বিষয়গুলিই জানা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলেও প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-ভোজন প্রভৃতি দিনের বিভিন্ন সময়ের খাদ্যগুলি কিভাবে নির্বাচিত করিবে, খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবে কিভাবে ইত্যাদি বিষয়গুলিও জানা প্রয়োজন।



খাদ্যের উপরেই পুষ্টি ও প্রাণ নির্ভর করে

পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা—খাদ্যের পরেই আসে পরিচ্ছদের সমস্যা। পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবার সময় পরিবারের কোন্ ব্যক্তির জন্য কি ধরণের পরিচ্ছদ নির্বাচন করিবে, উহা কি ধরণে প্রস্তুত করিবে ইত্যাদি সকল বিষয়গুলি সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পুরানো পোশাকে সামান্য অদল-বদল করিয়া উহাকে নূতন পোশাকের ন্যায় মজবুত ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়। পরিচ্ছদ নির্বাচন, পরিচ্ছদ তৈয়ারী করা, পুরানো পরিচ্ছদের সংস্কার, পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়গুলি এই বিভাগে পড়ে।



খাদ্যের পরেই আসে পরিচ্ছদের সমস্যা

শিশু শিক্ষা—গৃহ-পরিচালনার সর্বাপেক্ষা কঠিন ও প্রধান কাজ শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা। শিশুর স্নান, খাওয়া, নিদ্রা, ব্যায়াম ও বিশ্রাম, সু-অভ্যাস গঠন ও শিক্ষা, শিশুর প্রয়োজন ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই গৃহকর্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি ও সুনিপুণ পরিচালনা একান্ত আবশ্যক।



প্রধান কাজ শিশুর শিক্ষা

গৃহ-পরিচালনা



স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, শিশুর শিক্ষা, খাদ্য ও আয়-ব্যয় প্রভৃতির
যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সুনিপুণ পরিচালনার দ্বারা
গৃহকে একটি সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার নিলয়
করিয়া গড়িয়া তোলাই গৃহকর্ত্রীর
আসল কাজ।

গৃহের অপরাপর সমস্যার সমাধান—উপরের বর্ণিত গৃহ-পরিচালনার প্রধান বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক গুরুতর সমস্যা থাকিয়া যায়। যেমন, গৃহে রোগ ও উহার পরিচর্যা, সংসারের সঞ্চয় ও আয়-ব্যয় প্রভৃতির ব্যবস্থা,



রোগ ও উহার পরিচর্যা



আয়-ব্যয় প্রভৃতির ব্যবস্থা

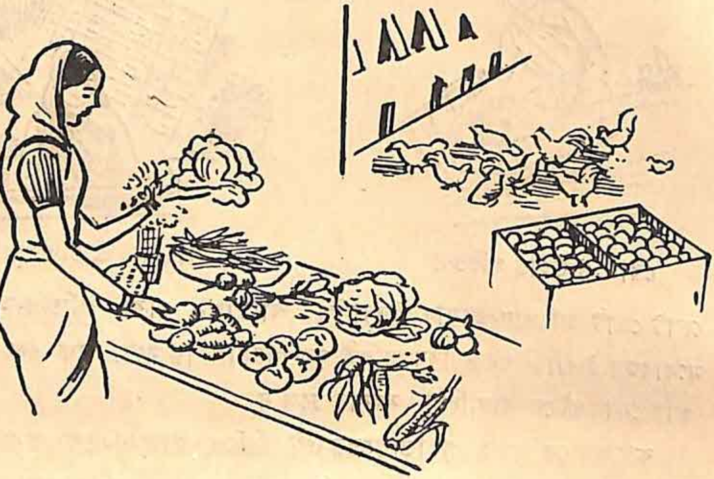
ছোট ছোট আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির আয়োজন দ্বারা অতিথি-অভ্যাগতের মনোরঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলিই গৃহ-পরিচালনার মধ্যে পড়ে এবং এইগুলির প্রায় কোনওটিকে বাদ দিয়াই সংসার চলে না।

কাজেই দেখিতেছ, গৃহাভ্যন্তরের এই বিভিন্ন কাজগুলিকে সু-পরিকল্পনার দ্বারা সুশৃঙ্খল ভাবে চালাইয়া যাওয়ারই অপর নাম **গৃহ-পরিচালনা**।

সু-গৃহিণী

সেই গৃহকর্ত্রীকেই সুনিপুণা বলা যায় যাঁর পরিচালনায় সুখ-শান্তি ও সম্পদে গৃহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সংসারের আয়ের ভাগ বাড়াইয়া, অযথা ব্যয়ের ভাগ সংকোচ করিয়া যিনি গৃহে শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সমর্থ হইয়াছেন—যথার্থ গৃহ-পরিচালনার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহারই আছে বলিতে হইবে। তাঁহাকেই সু-কুশলা গৃহকর্ত্রী বলা যায়, যাঁর সুপরিচালনায় ও মধুর ব্যবহারে অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে একটি সহানুভূতি ও প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে ও সংসারের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্যকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে। এক কথায়, গৃহের প্রত্যেকটি বিষয় যাঁর নখদর্পণে এবং গৃহকর্মের প্রত্যেকটি বিভাগ যাঁর নেতৃত্বে সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, তিনিই **আদর্শ গৃহকর্ত্রীর** আসন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। তিনিই **সুগৃহিণী**।

সুনিপুণা গৃহকর্ত্রীর লক্ষণগুলি পড়িলে। গৃহকর্ত্রীর গৃহ-পরিচালনায় কোন্ কোন্ কর্তব্যকর্মগুলি সমাধা হয় তাহাও মোটামুটি পড়িয়াছ। এখন দেখা যাক্, কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে গৃহ-পরিচালনার কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি—সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিচালনার উপরেই।



সংসারের আয় বাড়ানো গৃহকর্ত্রীর একটি প্রধান কাজ

সংসারের অতিরিক্ত ব্যয়ভার সংকুচিত করিয়া গৃহের আয় বা সঞ্চয় বাড়ানো গৃহকর্ত্রীর একটি প্রধান কাজ। এই কারণেই গৃহকর্ত্রীর অপর নাম **গৃহলক্ষ্মী**। এই কাজ ভালভাবে পরিচালনা করিতে হইলে গৃহকর্ত্রীকে যথেষ্ট পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও দূরদর্শী হইতে হয়।

গৃহকে গৃহরূপে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব একান্তভাবে গৃহকর্ত্রীর। সুতরাং গৃহ-পরিকল্পনা, খাদ্য-ব্যবস্থা, শিশুপালন, সংসারের আয়-ব্যয়, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহকর্ত্রীর জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক তাঁহার সু-শিক্ষা, মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের। গৃহকে উহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, প্রসাধন ইত্যাদির দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলাই গৃহকর্ত্রীর কাজ। শ্রীহীন গৃহ ছন্নছাড়া জীবনেরই সূচনা করে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রভূত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সু-শিক্ষা ও মার্জিত রুচির অভাবে গৃহবাসীর মূল উদ্দেশ্যগুলি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সু-শিক্ষা ও সু-রুচি কেবলমাত্র যে গৃহ-

প্রসাধনের জন্যই গৃহকর্ত্রীর পক্ষে আবশ্যক তাহা নহে; ঐ দুইটি জিনিস ব্যতীত গৃহকে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের আকর করিয়া তোলাও গৃহকর্ত্রীর পক্ষে একরকম অসম্ভব বলিয়াই জানিবে। কোনও দুইটি মানুষের প্রকৃতি সব সময়ে একরূপ হইতে পারে না। সংসারে ভিন্ন প্রকৃতির বহু মানুষ থাকে। বিভিন্ন প্রকৃতির সকলের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া সকলকে চালাইবার ভার গৃহকর্ত্রীর। সুতরাং একদিকে যেমন গৃহকর্ত্রীর সুন্দর ও উদার-স্বভাব হওয়া উচিত, অপরদিকে আবার তেমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অসহিষ্ণু কোপন-স্বভাব লোকের পক্ষে সকলকে খুশী করিয়া মানাইয়া চলা কঠিন। মানসিক সংযম ও সমতা প্রভৃতি গুণগুলি না থাকিলে, গৃহের কোনও লোক যদি কখনও রূঢ় ব্যবহার করে কিংবা বাক্যের ভিতর দিয়া তিক্ত অভিব্যক্তি করে, তাহা হইলে গৃহকর্ত্রীর পক্ষে হাল্‌কা হাসি ও কথায় উহা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন হয়। এইভাবেই মনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য দূর হইয়া যায় ও ক্রমেই মনোমালিন্য ঘটে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, গৃহ-পরিচালনার কাজ নিতান্ত সহজ ও সকলের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু বস্তুত—যথাযথ গৃহ-পরিচালনা করিতে হইলে একটি স্বাভাবিক মমতা, একটি সুসঙ্গত মন ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক। তোমরা পড়িয়াছ, গৃহকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিলয় করিয়া গড়িয়া তোলা, নূতন সমাজের জন্য সুস্থ দেহ-মনের নূতন মানুষ তৈরি করাই গৃহকর্ত্রীর কাজ। এই দুইটির কোন কাজটিই সহজসাধ্য নয়। উহার জন্য গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট শান্ত, সংযত, সুশৃঙ্খল ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষা বা মানুষের মনের পরিবর্তন মনের প্রসারতা দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং গৃহকর্ত্রীকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্না হইতে হইবে যাহাতে তিনি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গৃহের ছোট-বড়, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী—সকলের উপরেই নেতৃত্ব করিতে পারেন ও প্রয়োজন হইলে উহাদের মনের পরিবর্তনও আনিতে পারেন। নেতৃত্ব করিতে হইলে একদিকে যেমন কিছুটা কাঠিন্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, অপরদিকে আবার তেমনি পরের দুঃখ বুঝিবার ও উহা মুছাইবার জন্য, অর্থাৎ পরের মনে প্রবেশ করিবার জন্য একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনশীল মনেরও একান্ত আবশ্যক। কারণ সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে গৃহকর্ত্রীই একমাত্র নির্ভর—এই দৃঢ়বিশ্বাসটি গৃহবাসীর মনে জাগাইবার গুরু

দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীর। আরও একটি কথা জানিয়া রাখ—মানুষকে পরিচালনা করিতে হইলে, অর্থাৎ মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতে হইলে, **মানুষকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিতে হয়।** উহাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ নিজের বলিয়া মনে করিতে হয়। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সেই গুণটিরই, যাহার দ্বারা তিনি গৃহের অধিবাসীদের গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহা হইলেই দেখিবে গৃহের অন্যান্য অধিবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে, উহাদের আনন্দ বর্ধনে গৃহকর্ত্রী আপনা হইতেই সচেষ্ট হইবেন। উহাদের প্রতিদিনকার ছোট-খাট প্রয়োজনগুলি মিটাইতে, উহাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে গৃহকর্ত্রীর যে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি, সময়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলির প্রয়োজন, উহা আপনা হইতেই দেখা দিবে। গৃহের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারার দরুনই অনেক সময় দেখিবে গৃহকর্ত্রী গৃহকর্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, গৃহকর্ত্রী হিসাবে তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। গৃহকর্ত্রী কর্তব্যপরায়ণা হইবেন, কর্তব্যপালনে তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও প্রয়োজন এই কর্তব্যের সঙ্গে তাঁহার নিজের মনখানিও কিছু পরিমাণে মিশাইয়া দেওয়া। মনকে বাদ দিয়া কর্তব্য পালনে কখনও কাহারও মন ভরে না জানিবে।

পরিজনবর্গ ও দাসদাসীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার

পরিজনবর্গের প্রতি :—

সংসারের অন্যান্য পরিজনদিগের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার সর্বদা স্নেহপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নিজের ছেলেমেয়ে বা স্বামীরই আদর-যত্ন করিব, অন্যদের করিব না, ইহা কখনও সুগৃহিণীর আদর্শ হইতে পারে না। সংসারে থাকিতে হইলে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি সজীব রাখিতে হয়। অন্যের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সর্বদা কেবল নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। অনেক সময় অনেক সংসারে দেখা যায় গৃহিণী কেবল নিজের ঘরখানির কথাই চিন্তা করেন। গৃহের অপর কক্ষগুলি

যেন অপর কাহারও, তাঁহার সংসারের বহির্ভূত! অপর পরিজনদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহাদের বিপদ-আপদ, তাহাদের জীবনের সমস্যা যেন তাঁহার মনকে স্পর্শই করে না, কেবলমাত্র তাঁহার নিজের ও নিজের স্বামী-পুত্রের চিন্তাতেই তাঁহার মন ভরপূর। অপরের কথা চিন্তা করিবেন সে অবসরই যেন তাঁহার নাই, দিবারাত্র স্বার্থচিন্তাতে তাঁহার মন এমনই সংকুচিত হইয়া গিয়াছে! এইরূপ রমণী গৃহিণী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি গৃহকর্ত্রীর পদের অনুপযুক্ত। তাঁহার দ্বারা গৃহ-পরিচালনার কাজ চলিতে পারে না। নিজের মন যাঁহার মরিয়া গিয়াছে তিনি অপর অতগুলি মনের ভার লইবেন কি করিয়া? কেবলমাত্র অর্থের দ্বারাই গৃহস্থালী পরিচালনা করা যায় না, **গৃহ-পরিচালনায় প্রাণের সজীবতা ও হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিরও সহজ বিকাশ একান্ত আবশ্যক।**

আমাদের দেশে সাধারণত পরিবারগুলির পরিজন-সংখ্যা অধিক। শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-পরিজন-পরিবেষ্টিত এক-একটি সংসার। সে সংসারের ভার গৃহকর্ত্রীকে যথাযথ গ্রহণ করিতে হইলে পরিবারের প্রত্যেক পরিজনের প্রতিই তাঁহার যথোচিত সম্মান বা স্নেহসূচক ব্যবহার করা প্রয়োজন। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতামাতার মতনই তাঁহাকে জ্ঞান করিতে হইবে। তাঁহাদের শত ত্রুটি সত্ত্বেও সমস্ত সহ্য করিয়া হাসিমুখে সমস্ত মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। শ্বশুর-শাশুড়ী যতই শাসন করুন না কেন, গৃহকর্ত্রীকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সে শাসনের মধ্যে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাঁহাদের সস্নেহ আশীর্বাদ। ঠিক তেমনি করিয়া স্বামীর ছোট ভাইবোনদেরও গৃহকর্ত্রীর নিজের ভাইবোনের মতনই মনে করিতে হইবে। তাহাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সর্বদা সহৃদয় ও সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। উহাদের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার একদিকে যেমন স্নেহ ও মমতা-ব্যঞ্জক হইবে, অপরদিকে তেমনি আবার প্রয়োজন হইলে উহাদের মঙ্গলের জন্য উহাদের কঠিন শাসন করিতেও তিনি বিরত হইবেন না। অনেক সময় নিকট-আত্মীয় না হইলেও অর্থাভাব ও নানান অসুবিধার জন্য অনেক দূর-সম্পর্কীয় পরিজনদেরও সংসারে থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর অধিকতর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। গৃহকর্ত্রীকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাঁহার কথায় বা আচরণে এমন কিছু প্রকাশ না পায়, যাহাতে ঐ পরিজনেরা মনে

করিতে পারেন, নানান বিপত্তি ও অভাববশত তাঁহার সংসারে আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়াই গৃহকর্ত্রী তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন।

সন্তানের প্রতি :—

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শিশুপালন ও শিশুর রক্ষা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সংসারের যাবতীয় কাজ গৃহকর্ত্রীর উপর ন্যস্ত আছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক হইবে **—স্নেহের, শাসনের ও বন্ধুত্বের।** আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পিতা-মাতার সম্বন্ধ হয়—হয় অত্যধিক স্নেহের, নয় অত্যধিক শাসনের। ছেলেমেয়েকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে এখনও খুব কম পিতামাতাকেই দেখা যায়, যদিও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেলেমেয়ের মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ উহাতে ছেলেমেয়েরা নিঃসংকোচে তাহাদের সমস্যাগুলির বিষয় পিতামাতার নিকট বলিতে পারে। পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ বা অত্যধিক শাসন—কোনটাই ছেলেমেয়ের মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

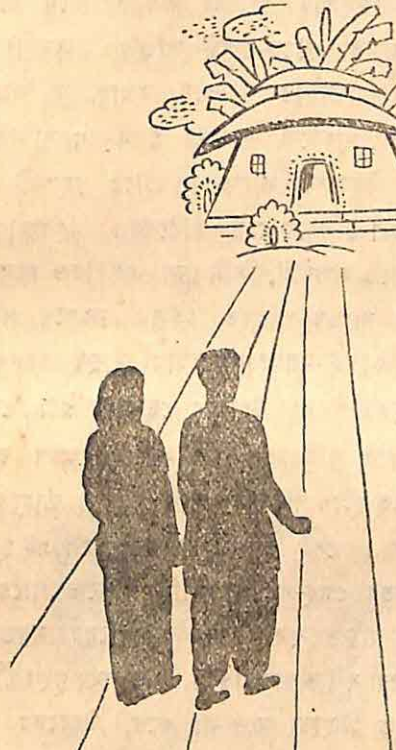


দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না

স্বামীর প্রতি :—

সংসারের প্রায় প্রতি মানুষের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার কিরূপ হইবে আলোচনা করা গেল, একমাত্র স্বামীর প্রতি ছাড়া। স্বামীর প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার সাধারণত কিরূপ হওয়া উচিত উহাও মোটামুটি জানিয়া রাখা আবশ্যক। তোমরা জান, বিবাহের সময় স্বামী, স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন বলিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। কিন্তু স্ত্রীকেও স্বামীর বহু দায়িত্ব ও বহু কাজের ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই গৃহকর্ত্রীই স্বামীর উপযুক্ত গৃহধর্মিণী যিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা দিয়া সংসারের ভিতরে ও সংসারের বাহিরে স্বামীর প্রতিটি মঙ্গলকার্যে সহায়তা করেন। সেই গৃহকর্ত্রীই উপযুক্ত স্ত্রী, যিনি তাঁহার

অসীম ধৈর্য, অপরিসীম মনোবল ও অফুরন্ত উৎসাহ দিয়া অত্যন্ত বিপদের মুখেও স্বামীর কাজে অনবরত প্রেরণা যোগাইয়া যান। স্ত্রীর ধর্মই সেবা। ধরিত্রীর ন্যায় নীরব অকৃত্রিম সেবায় অহরহ যিনি স্বামীর সংসারের মন ভরাইয়া রাখিয়াছেন, সেই গৃহকর্ত্রীরই যথার্থ স্ত্রীর আসন গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে।



মনের মিলনেই গড়িয়া উঠে সুন্দর সংসার

এক কথায় বলিতে গেলে, সেই স্ত্রীই আদর্শ স্ত্রী—যাঁহার মন স্বামীর মন হইতে কখনও ভিন্ন নয়। স্বামী-স্ত্রীর, অর্থাৎ গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর **অভিন্ন মনের মিলনেই গড়িয়া উঠে সুন্দর ও সুস্থ সংসার।**

দাসদাসীর প্রতি :—

রাজা-মহারাজা হউন আর পথের ভিখারীই হউন, প্রত্যেকেই মানুষ। প্রত্যেকেরই মান-অপমান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বর্তমান। প্রত্যেকেরই আছে একটি মন। সংসারে দাসদাসী ও ভৃত্যদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর সর্বদা এই কথাটিই মনে রাখা আবশ্যক যে **মন আছে বলিয়াই আমরা প্রত্যেকেই মানুষ।** সুতরাং গৃহকর্ত্রী সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে তাঁহার আচরণে, কথায়, বা আদেশের ভঙ্গীতে এমন কিছু প্রকাশ না পায়, যাহাতে উহাদের ঐ মন অপমানিত বা অসম্মানিত বোধ করিতে পারে। উহাদের সহিত ব্যবহারে গৃহকর্ত্রী সর্বদা উহাদের **মনুষ্যত্বকে সম্মান** করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন। গৃহকর্ত্রীর নিকট সেবক বা সেবিকারূপে আসিয়াছে বলিয়াই, তিনি যেন একবারও মনে না করেন যে, সে অধঃপতিত নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হইল। সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে অর্থোপার্জনের কাজ সৎকাজই—সৎকাজের দ্বারা মানুষ কখনও ছোট হইতে পারে না—সুতরাং গৃহকর্ত্রীই বা উহাদের ছোট করিয়া দেখিবেন কেন? উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বহু অভাবে ও বহু দুঃখে পড়িয়াই আজ উহারা তাঁহার গৃহে ভৃত্যের কাজ করিতে আসিয়াছে। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে এই দুঃখী মানুষেরাই গৃহকর্ত্রীর নিকট অধিকতর স্নেহ-মমতার দাবি করিতে পারে। সেই স্নেহ-মমতা হইতে উহাদের বঞ্চিত করার অর্থই উহাদের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীর এরূপ আচরণ করিতে হইবে যাহাতে উহারা মনে না করে, উহাদের আত্মীয়-পরিজন-বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। উহাদের সহিত ব্যবহারে গৃহকর্ত্রীর সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটি প্রকট হইয়া না উঠে। গৃহকর্ত্রীর সামান্য স্নেহ ও সহানুভূতির বিনিময়ে উহারা সময়ে সময়ে প্রাণ দান করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। **মনের বিনিময়েই মন পাওয়া যায়**—গৃহের দাসদাসীর সহিত ব্যবহার করিবার সময় গৃহকর্ত্রীকে এই কথাটাই স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। পরিবারবর্গের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তিনি যেমন সর্বদা সতর্ক, তেমনি দাসদাসীর বেলাতেও, উহাদের খাওয়া-দাওয়া, আরাম, বিশ্রাম প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারে গৃহকর্ত্রীকে সজাগ ও সযত্ন হইতে

হইবে। তবেই গৃহকর্ত্রী উহাদের নিকট হইতেও ততখানি সহৃদয় ও সযত্ন ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন। গৃহের দাসদাসীদের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার একদিকে যেমন আন্তরিক ও স্নেহসূচক হইবে—একদিকে যেমন রোগে শোকে, বিপদে-আপদে গৃহকর্ত্রী উহাদের আগলাইয়া রাখিবেন—অপরদিকে আবার তেমনি কর্তব্য-পালনে উহাদের স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির কঠোর সমালোচনা ও শাসন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। মানুষকে আপন করিতে হইলে **বা** মানুষের আপন হইতে হইলে **স্নেহ ও শাসন** দুইয়েরই সমান প্রয়োজন।

অতিথি-সেবা

ধর্ম বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা হইলে জানিবে, মানুষের **সেবার মতন বড় ধর্ম আর নাই**। মানুষের জন্ম বা জীবনের উদ্দেশ্যই মানুষের সেবা করা। সুতরাং তোমরা এখন হইতে নিজেদের সেবা-ধর্মে দীক্ষিত কর। যদি কখনও কাহারও এতটুকু কিছু করিবার সুযোগ পাও, তাহা হইলে প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া উহার ঐ কাজটুকু করিয়া দিবে।

অতিথিসেবা বা আতিথেয়তা গৃহস্থের একটি পরম ধর্ম। আমাদের দেশে



আতিথেয়তা গৃহস্থের পরম ধর্ম

পূর্বে অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যা করা সংসারের অন্যতম কর্তব্যকর্ম বলিয়াই পরিগণিত হইত। অতিথি আসিলেই যেন গৃহে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যাইত।

গৃহকর্ত্রী পাদ্য-অর্ঘ্য সাজাইয়া দিতেন—তালপত্রের পাখা হাতে ব্যজন করিতে করিতে নানান কথায় ও গল্পে অতিথির পথশ্রম দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। ওদিকে গৃহস্বামী ছুটিতেন, ক্ষেতের নূতন ফসলটি, পুকুরের ভাল মাছটি অতিথির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে। অতিথিসেবায় গৃহেরই কল্যাণ—গৃহস্থের মনে ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই গৃহস্থ উহার সাধ্যমত অতিথিসেবা হইতে বিরত হইত না। তখনকার মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত—'যে-গৃহস্থের দ্বার হইতে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়, যে-গৃহে অতিথি আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া আশ্রয় পায় না, সেই গৃহ বা গৃহস্থের কোনদিনই মঙ্গল হয় না'। মহাভারতের এই নীতিবাক্যটি তখনকার দিনে কেবলমাত্র যে কথাচ্ছলে বলা হইত তাহা নহে, উহার মধ্যে গার্হস্থ্য-জীবনের বিশেষ ধর্ম বা আদর্শ **সেবা-ব্রতের কথাটিই** প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহাই ছিল মনে প্রাণে তাহাদের বিশ্বাস।

অতিথিসেবা সমাজসেবারই নামান্তর। সেবাধর্মের মধ্যেই দয়া, দাক্ষিণ্য, দান, সবই নিহিত রহিয়াছে। দানের অর্থ কেবল অর্থদান নহে। দানের অর্থ



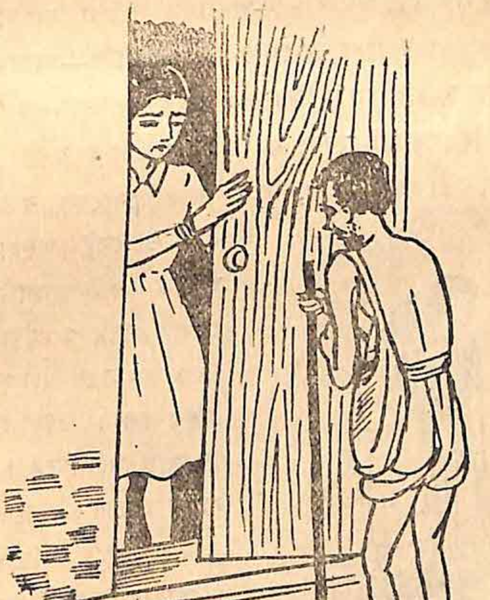
সকলেরই মন অতিথি-সেবার জন্য উন্মুখ

নিজেকে দান করা—নিজের মন, নিজের দেহ, কায়িক শ্রম ইত্যাদি মানুষের

সেবায় নিয়োজিত করা। প্রত্যেক গৃহেরই এই আদর্শগুলি গ্রহণ করা উচিত।

লক্ষ্য করিলেই দেখিবে—যে-গৃহে সদা-সর্বদা অতিথিসেবা লাগিয়া রহিয়াছে, সে-গৃহের ছোট-বড় সকলেরই মন অতিথিসেবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, অতিথিসেবার মধ্য দিয়া মানুষের মন আপনাতে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরের দিকে প্রসারিত হয়—অপরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শেখে। অতিথিসেবার মধ্য দিয়া মানুষের মন, দিবার শিক্ষা গ্রহণ করে। বস্তুত দিবার শিক্ষাই আসল শিক্ষা, হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবার শিক্ষা, শিক্ষা নয়।

আজকাল যে সংসারের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক কারণেই অতিথি-পরিচর্যা বা আতিথেয়তা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে। আজকাল মানুষের মনও



মনও সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে

অনেকখানি সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও উহারা আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত এই কারণেই অনেকে স্বভাবতই অতিথিবিমুখ। তবে অবশ্য একথাও

অনস্বীকার্য যে ক্ষমতার অভাবেই আশ্রয় দান করা আজকাল অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়না। কিন্তু তবু প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দিয়া—যার যতখানি ক্ষমতা ও সাধ্য সেই অনুযায়ী অতিথির সেবা ও সৎকার করিতে পারে। নিতান্ত কিছুই সম্ভব না হইলে মিষ্টি কথা ও ব্যবহার দিয়া, দুটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া অতিথিকে বিদায় করা যায়। কিন্তু ক্রমে আধুনিক শিক্ষায় তাহাও দুর্লভ হইতে চলিয়াছে। সংসার-খরচের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব করিবার সময় অতিথি-অভ্যাগতের সেবা ও পরিচর্যার জন্য যদি কিছু অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আর অসময়ে অতিথি আসিলে গৃহকর্ত্রীকে বিব্রত বা বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিতে হয় না।

অতিথিসেবায় গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য

আমাদের গৃহ হইতে অতিথি-অভ্যাগত চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনেক সময় উহাদের সমালোচনা করিয়া থাকি—কাহার কি দোষ ছিল, কাহার কোথায় ত্রুটি হইয়াছে ইত্যাদি; কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না, অতিথিসেবক হিসাবে আমাদেরই বা কি কি কর্তব্য বা করণীয় ছিল। অতিথির গুণাগুণ বিচার করা হয়ত সহজ, কিন্তু অতিথিসেবকের কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত কঠিন জানিবে। অতিথি-সেবার প্রথম ও প্রধান নিয়ম হইল সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া গৃহে **অতিথিকে গ্রহণ করা**। তাহা হইলেই জানিবে, তোমার অতিথিসেবা প্রায় সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে চলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষেও তুমি কিভাবে অতিথিকে গ্রহণ কর —তাহার উপরই নির্ভর করে তোমার আতিথেয়তার সার্থকতা। অতিথি-সেবার প্রত্যেক ধাপেই অতিথির সুবিধা, অসুবিধা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়গুলি চিন্তা করিবে। অতিথিসেবায় সামাজিক রীতি-নীতি



গৃহে অতিথিকে গ্রহণ করা

সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও অতিথির প্রতি বিবেচনা আবশ্যক। কারণ অতিথিকে কেন্দ্র করিয়াই অতিথিসেবার বিভিন্ন পরিকল্পনা করিতে হয়।

অতিথি বলিতে আমরা সাধারণত গৃহে আগন্তুক, অভ্যাগত জনদেরই বুঝিয়া থাকি। যে অভ্যাগত জনদের তোমার গৃহে স্থিতি নাই, অর্থাৎ স্থায়িভাবে বসবাস করিবার কথা নয় তাঁহারাই অতিথি। এইভাবে দেখিতে গেলে আমরা অতিথিকে মোটামুটি **তিনটি ভাগে** ফেলিতে পারি—

(১) যাঁহারা দিন কয়েকের জন্য তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছেন।

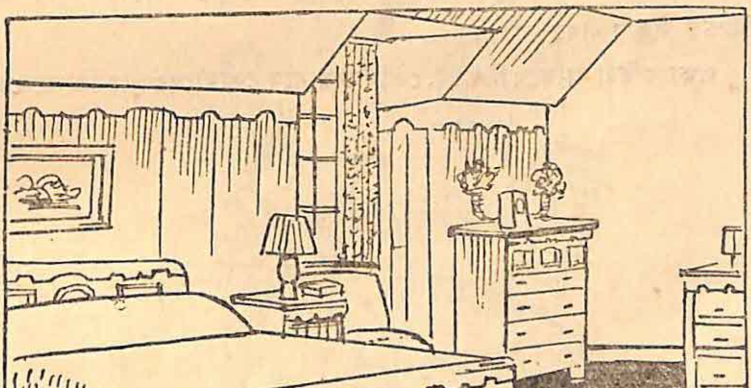
(২) যাঁহারা তোমার দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া তোমার গৃহে আহার গ্রহণের জন্য আসিয়াছেন।

(৩) যাঁহারা অনাহূত, অর্থাৎ বিনা আহ্বানে অকস্মাৎ তোমার দ্বারে আসিয়া আহার বা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন।

ইঁহাদের প্রত্যেকেই অতিথি। তুমি যদি গৃহকর্ত্রী বা গৃহস্বামী হও, ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিই তোমার যথাযথ কর্তব্য রহিয়াছে।

দিনকয়েকের অতিথি :—

তোমার গৃহে যদি অতিথি রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছুক হন ও দিন কয়েক



রুচি অনুযায়ী গুছাইয়া রাখিবে

বসবাস করেন—তাহা হইলে তুমি প্রথমেই তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানিকে তাঁহার প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী গুছাইয়া রাখিবে। তাঁহার স্নান, খাওয়া,

পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজগুলির যথাযথ ব্যবস্থা যথাসময়ে তাঁহার অগোচরেই করিয়া রাখিবে। অগোচরে করিবার কারণ এই—অতিথির কাজগুলি লইয়া তুমি যদি তাঁহার সামনেই অস্থির হইয়া উঠ, তাহা হইলে অতিথির বিব্রত বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র আহার গ্রহণের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে অতিথির ফলমূল ইত্যাদি কিছু খাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। সুতরাং অর্থানুকূল্য থাকিলে তুমি সর্বদাই ফলমূল ইত্যাদি কিছু-না-কিছু খাদ্যদ্রব্য অতিথির ঘরে রাখিয়া দিবে।

গৃহকর্ত্রীর সর্বদাই খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি গৃহের বিভিন্ন কর্মধারাগুলি ও উহার নির্দিষ্ট সময়ের সহিত অতিথিকে পরিচয় করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ঐগুলি সঠিক জানা না থাকিলে, 'গৃহস্বামীর অসুবিধা করিলাম'—মনে করিয়া অতিথিকে সর্বদাই সংকুচিত ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। অনেক সময় অতিথিকে তাঁহার শয্যাখানি দেখাইয়া দিয়া গৃহস্থকে বলিতে শোনা যায়—"আপনি যখন ইচ্ছা শয্যাত্যাগ করিবেন।' ইহা শুনিতে আরামজনক মনে হইতে পারে কিন্তু উহাতে অতিথি নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারেন না। সুতরাং তুমি যদি গৃহকর্ত্রী হও, তোমার উচিত হইবে, যতদূর সম্ভব অতিথির মনকে এই অস্বচ্ছ ধারণা ও অহেতুক চিন্তা বা ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া উহার জন্য নিশ্চিন্ত নিদ্রার ব্যবস্থা করা।

লক্ষ্য করিয়া থাকিবে নিশ্চয়ই, তোমাদের সঙ্গে তোমাদের গৃহে দিনকয়েকের



কিছু ক্রয় করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন

জন্য যদি কোনও অতিথি আশ্রয় গ্রহণ করেন, তোমাদের জন্য কিছু ক্রয় করিতে

বা তোমাদের কোনও-না-কোনও কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিতে তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তোমাদের সুন্দর ব্যবহারে তাঁহার মন এতই অভিভূত হইয়াছে যে তিনিও নিজেকে তোমাদের কাজে লাগাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই আদর্শ গৃহকর্ত্রী অথবা অতিথিসেবক হিসাবে তোমাদেরও উচিত হইবে না—তাঁহাকে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করা।

যথার্থ গৃহকর্ত্রী ও অতিথিসেবক হইতে যদি চাও, তাহা হইলে অতিথির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম ইত্যাদি যাবতীয় আচরণ যাহাতে সহজ, স্বাভাবিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তোমার কাজে বা আচরণে কোথাও যদি এতটুকু অতিশয্য বা অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তোমার



মন দিয়াই মনকে মুগ্ধ করিতে হয়

অতিথিও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিবেন। তোমার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় যে-আড়ম্বর বা বাহুল্য নাই, কেবলমাত্র অতিথি আসিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সামনে অনর্থক সে আয়োজন করিতে গিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইবে না। আড়ম্বর দেখাইয়া কখনও অতিথিকে সন্তুষ্ট করা যায় না। **মন দিয়াই মনকে মুগ্ধ করিতে হয়।** সুতরাং তোমার যদি সংসারে কোথাও দীনতার ছাপ থাকে, তুমি সেই দীনবেশেই অতিথিকে তোমার মনের ঐশ্বর্য দেখাইয়া

দাও। বস্তুত অতিথিসেবায় যে যথেষ্ট অর্থ, প্রচুর বিলাস-সামগ্রী ও অনেক



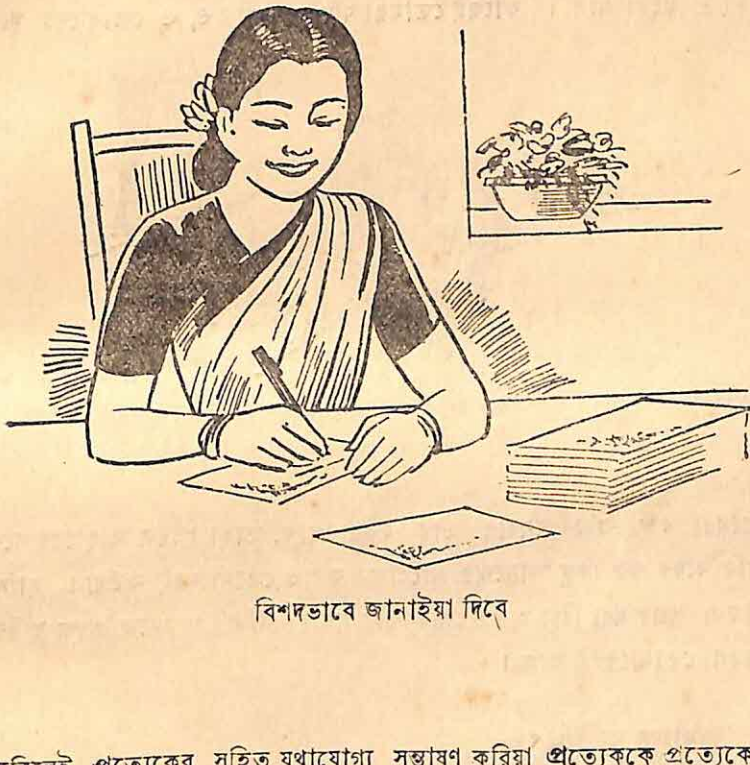
মনের ঐশ্বর্য দেখাইয়া দাও

কায়দা-কানুনের প্রয়োজন তাহা নহে। যথাযথ অতিথিসেবায় **চরিত্রের মাধুর্য ও অন্তরের সৌন্দর্যেরই** একমাত্র প্রয়োজন।

আহারে নিমন্ত্রিত অতিথি ঃ—

উল্লিখিত নীতিগুলি সকল রকম অতিথির পক্ষেই প্রযোজ্য। তোমার দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া যদি এক বা ততোধিক অতিথি তোমার গৃহে উপস্থিত হন, তাঁহাদের নিকটও তোমার আড়ম্বর প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার সাধ্য অনুসারে—তোমার যে ক্ষমতা আছে উহার মধ্যেই অভ্যাগতের জন্য আহার্য প্রস্তুত কর। কেবলমাত্র আহার্য নির্বাচন করিবার সময় সেই খাদ্যদ্রব্যগুলিই বিশেষভাবে নির্বাচিত করিবে যাহা সাধারণতই লোকে পছন্দ করে, যে-আহার্য পছন্দ করিতে বিশেষ কোনও রুচির প্রয়োজন হয় না। তবে এই ক্ষেত্রেও—স্বল্প সময়ের জন্য আগত আমন্ত্রিত অতিথিদের বেলায়ও তোমাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের সহিত পরিচয় না থাকার দরুন, কিংবা কি উপলক্ষে আমন্ত্রণ উহা জানা না

থাকায়, অথবা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে না পারার দরুন, কেহ কোথাও কোনরকম অসুবিধা বা বিব্রত বোধ করিতেছেন কিনা। অতিথির শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তোমাকে সর্বদাই সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিমন্ত্রণ পাঠাইবার সময়েই কি অনুষ্ঠান, নির্ধারিত সময় কি ইত্যাদি বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব বিশদভাবে জানাইয়া দিবে। অতিথি গৃহে পদার্পণ

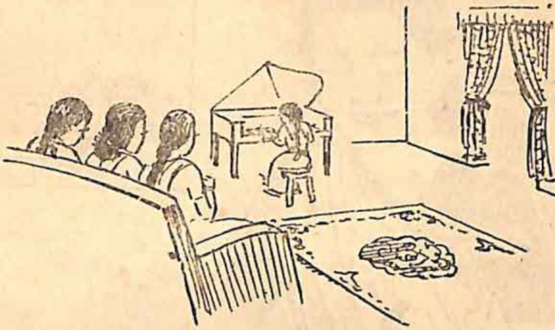


বিশদভাবে জানাইয়া দিবে

করিলেই প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে। আহারের জায়গায় অনেক সময় অনেক রকম আলোচনা ইত্যাদি হইয়া থাকে। লক্ষ্য রাখিবে, সকলেই সেই আলোচনায় যোগদান করিতে পারিতেছে কিনা; নতুবা কৌশলে আলোচনার বিষয়টির মোড় ফিরাইয়া দিবে। কিংবা যদি দেখ, এমন আলোচনার অবতারণা করা হইতেছে—যাহা অন্যের বিরক্তির কারণ হইবে বা অন্যকে অসুখী করিয়া তুলিবে তৎক্ষণাৎ কৌশলে সে আলোচনা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। আহারের সময়কার আলোচনায় যাহাতে নানান তর্ক-বিতর্ক বা রাগারাগির সৃষ্টি না হয়

তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঐ সময়কার আলোচনাকে হাল্কা ও মনোরম করিয়া তোলার দায়িত্ব, যাঁহার উপরে আতিথ্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারই।

আহারের নিমন্ত্রণে গৃহে অতিথি আসিলেও মনে করিও না যে উহারা কেবল আহার করিতেই আসিয়াছেন। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, মেলা-মেশা ইত্যাদির প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দের আদান-প্রদান, একটানা একস্থরে চলা দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য লইয়া আসা। কাজেই তোমরা যদি গৃহকর্ত্রী হও, ও তোমাদের গৃহে



কিছু আনন্দের আয়োজন কর

তোমরা যদি অতিথিসেবার ভার লইয়া থাক, তাহা হইলে আহারের পরে অতিথিদের জন্য কিছু আনন্দের আয়োজন করাও তোমাদেরই কর্তব্য। হাসি, গান ও গল্পের মধ্য দিয়া অন্তত সেদিনকার সন্ধ্যায় অতিথির মনকে প্রফুল্ল করিয়া তোলা তোমাদেরই কাজ।

অনাহূত অতিথি :—

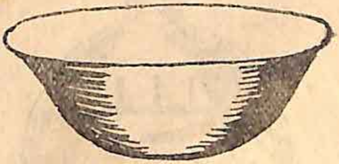
আমরা এখনও অনাহূত বা অকস্মাৎ-আগত প্রার্থী বা অতিথির কথা আলোচনা করি নাই। গৃহস্থের দ্বারে এই অতিথির দাবিই সর্বাপেক্ষা অধিক। আশ্রয় নাই বলিয়াই তিনি আজ তোমার দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী, আহার্যের অভাব বলিয়াই তিনি তোমার দুয়ারে দু'মুষ্টি আহার্য যাচ্ঞা করিতেছেন। এই অতিথিকে তুমি ফিরাইবে কি বলিয়া? বস্তুত এই অতিথির প্রতিই তোমার কর্তব্য সর্বাপেক্ষা বড়। মানুষের দাবি লইয়া, মানুষের মনুষ্যত্বের কথা ভাবিয়া তিনি মানুষের কাছে আসিয়াছেন। সুতরাং মানুষ হিসাবে তোমার সর্বপ্রথম

কর্তব্য সমাজেরই অপর একটি মানুষকে গ্রহণ করা। তোমার আশ্রয় দেওয়ার মত ক্ষমতা না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি উহার পথশ্রম দূর করিতে পার। তোমার আহার্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি উহাকে পানীয় প্রদান করিতে পার। আগেকার দিনে কিছু না থাকিলেও গৃহস্থ এক ঘটি জল ও দুটি বাতাসা দিয়া অতিথিকে পরিতৃপ্ত করিত। তোমাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে তোমরা সেই দিনগুলিকে আবার ফিরাইতে পার না?

কাপড়-কাচার সাজ-সরঞ্জাম

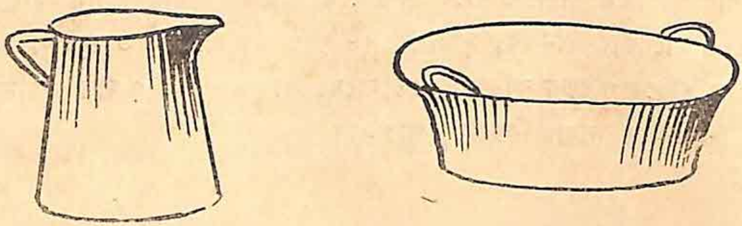
কাপড়-চোপড় কাচা গৃহের একটি প্রাত্যহিক কাজ। শহরের তৈলাক্ত ধোঁয়া, ধূলা, আমাদের দেহ-নিঃসৃত ঘাম ইত্যাদি নানান দূষিত পদার্থে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় কিভাবে ময়লা হয়, তোমরা পড়িয়াছ। সূতার জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিলের কাপড়, বালিশের ওয়াড় ও অন্যান্য শয্যাদ্রব্যাদি কিভাবে পরিষ্কার করিতে হয় ও উহার প্রণালী কি তাহাও তোমরা জান। এখন দেখা যাক, কাপড়-চোপড় কাচিতে হইলে উহার জন্য কি কি সাজ-সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয়।

আজকাল প্রায় প্রতি গৃহেই কাপড় কাচিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ঠিক ঠিক সরঞ্জামাদির অভাবে যাঁহারা কাপড় কাচেন, তাঁহাদের অত্যধিক পরিশ্রম হয় এবং কাপড়ও যথাযথভাবে কাচা হয় না। কাপড় কাচিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় **টব** বা **গামলার**। বালতি, মগ প্রভৃতির প্রয়োজন তো আছেই। অনেক জায়গাতেই যদিও কাঠের টবের ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু উহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া অনেকেই আবার আজকাল এনামেল করা অথবা দস্তার লেপ দেওয়া পাত্র ব্যবহার করিয়া



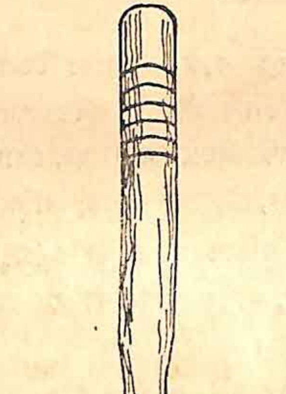
গামলার প্রয়োজন হয়

থাকেন। তোমরা হয়ত জান না, অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে দস্তা গলিয়া যায়। সুতরাং দস্তার পাত্রে কখনও কোনওরূপ অ্যাসিড ইত্যাদি ঢালিবে-



মগ প্রভৃতির প্রয়োজন ত আছেই

না। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রও কাপড় কাচার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, কারণ, অত্যধিক গরম জলে উহাও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তোমরা কাপড় কাচার জন্য **পিতল** বা **তামার পাত্র** ব্যবহার করিতে পার যদিও উহার মুল্য কিছু অধিক।

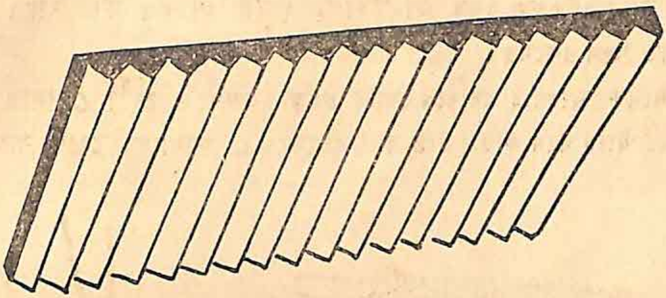


ভ্যাকুয়াম কোন্

গরম সাবান বা সোডার জলের মধ্যে যাহাতে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত ডুবাইয়া রাখিতে না হয় সেইজন্য অনেক বাড়ীতে তামা বা কাঠের বড় লাঠি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ধোপাখানা প্রভৃতি অনেক বড় বড় কাপড়-কাচার জায়গাগুলিতে আবার অনেক সময় একরকম **বায়ুশূন্য-চোঙের** ব্যবহার দেখা যায়, ইহাকে ভ্যাকুয়াম কোন্ (Vacuum Cone) বলা হয়। পাশের ছবিখানায় দেখ, এই যন্ত্রের নীচের দিকে পেয়ালার মত অংশটিতে যে কতকগুলি গোঁজের মতন দেখিতেছ উহাতে কাপড় একবার টানিয়া লয় ও পরে আবার ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে টানা ও ছাড়ার দরুণ ময়লা কাপড়খানির রন্ধ্রে

রন্ধ্রে সাবানজল প্রবেশ করে এবং ইহাতে ময়লা কাপড়খানির ময়লা ছাড়ানও সহজ হয়।

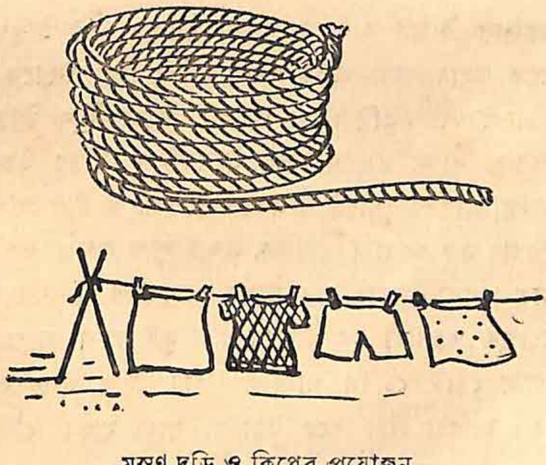
তোমরা পড়িয়াছ, সাবানজল সহ কাপড়খানি থুপিয়া থুপিয়া কাচিতে



সমকুঞ্চিত তক্তার প্রয়োজন

হয়। এইভাবে কাপড় কাচিবার জন্য ছবিতে যেরূপ দেখা যাইতেছে সেইরূপ কয়েকখানি **সমকুঞ্চিত** (corrugated) **কাঠের তক্তার** প্রয়োজন।

কাপড় কেবল ধুইলেই চলিবে না। গৃহস্থের বাড়ীতে কাপড় শুকাইবারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। **মসৃণ দড়ি** অথবা র‍্যাকের ব্যবস্থা থাকিলেই উহাতে



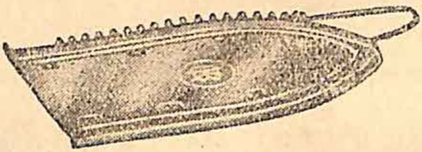
মসৃণ দড়ি ও ক্লিপের প্রয়োজন

কাপড় শুকানো যায়। সেই সঙ্গে অবশ্য কাপড় আটকাইয়া দিবার জন্য কিছু কিছু **ক্লিপের** প্রয়োজন। যদি ঘাসে ঢাকা জমি থাকে তাহা হইলে উহার

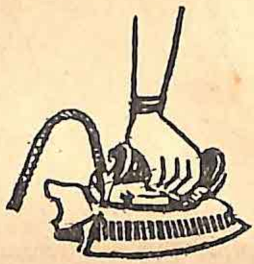
উপরও কাপড় মেলিয়া দেওয়া যায়। বস্তুতঃ উহাই কাপড় শুকাইবার উৎকৃষ্ট উপায়।

ইস্ত্রি—আজকাল প্রত্যেক গৃহেই **ইস্ত্রির** প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ইস্ত্রির সাহায্যে সকল রকম জামা-কাপড় গৃহেই সুবিন্যস্ত করা যায়। ইস্ত্রি প্রধানত **তিন** রকমের।

অনেক জায়গায় দেখিবে মোটা চওড়া একখানি ভারী **লোহার পাত** উনুনের আঁচে গরম করিয়া ইস্ত্রি করা হইতেছে। আমাদের দেশে সাধারণত



লোহার পাত

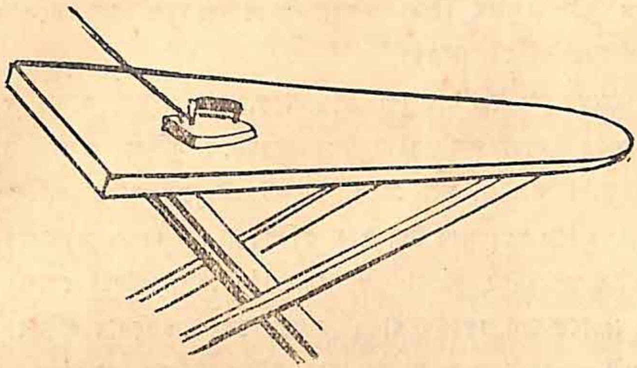


ইলেকট্রিক ইস্ত্রি

ধোপারা **কয়লার ইস্ত্রিই** ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ইস্ত্রিগুলি বাক্সের মতন হওয়াতে উহার মধ্যে জ্বলন্ত কয়লা ভরিয়া দিয়া উহাকে গরম করা হয় এবং ঐ ভাবেই কাপড় ইস্ত্রি হইয়া থাকে। **ইলেকট্রিক ইস্ত্রি** দিয়া ইস্ত্রি করাই সর্বাপেক্ষা সহজ, এই কারণেই ইলেকট্রিক ইস্ত্রির চল সর্বাপেক্ষা অধিক। তোমরা প্রায় প্রতিঘরেই আজকাল ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দেখিতে পাও।

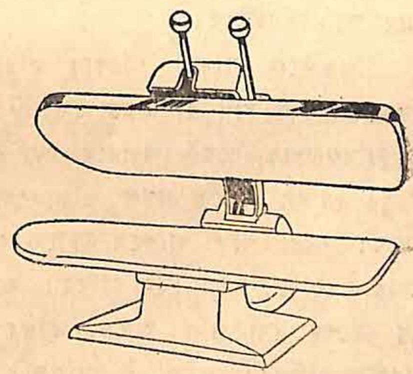
ইস্ত্রি করিবার জন্য একখানি **টেবিল,** একটি **পুরু কম্বল** ও উহার উপর পাতিবার জন্য একখানি সাদা ভারী **চাদর** প্রয়োজন। টেবিলখানির উচ্চতা যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী হয় উহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পাশে আরও একখানি ছোট টেবিল থাকিলে উহার উপর ইস্ত্রি করা কাপড়-গুলি কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া পরে উঠাইয়া রাখা যায়। টেবিলে চওড়া কাপড়গুলিই সাধারণত ইস্ত্রি হয়। কিন্তু জামার হাতা প্রভৃতি টেবিলে ইস্ত্রি করা কঠিন। উহার জন্য বিশেষ বোর্ডের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া প্রয়োজন —ঐগুলিকে **স্লিভ বোর্ড** (Sleeve Board) বলা হয়। বিছানার চাদর প্রভৃতি

বড় ও মোটা জিনিসগুলি ইস্ত্রি করার তেমন প্রয়োজন হয় না। ঐ কাপড়গুলি ভাঁজ করিয়া একটা ভারী কিছু দিয়া চাপিয়া দিলেই উহা ইস্ত্রি করা কাপড়ের



স্লিভ বোর্ড

মতনই হইবে। চাপ দিবার এইরূপ একটি যন্ত্রের ছবি নীচে দেওয়া গেল। ইহার নাম **ম্যাঙ্গলার** (mangler)। এই যন্ত্রটির সহিত ইলেকট্রিক তার সংযুক্ত আছে, এই কারণেই স্থইচ্ টিপিয়া দিলেই ইহার উপরের ধাতু-নির্মিত ঢাকনিটি সহজে গরম হইয়া যায়। নীচের অংশটি ধাতুনির্মিত ও উহাতে প্যাড আঁটা আছে। চাপ দিবার সময় দুইটি অংশই পরস্পর লাগিয়া যায়।



ম্যাঙ্গলার

যন্ত্রপাতির যত্ন :—তোমাদের দেহযন্ত্রটিকে যেমন চালু ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে উহার যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যা আবশ্যক, তেমনি যে-কোনও কাজের যে-কোনও যন্ত্রপাতিই হোক না কেন, তোমরা যদি প্রয়োজনে উহাদের নিকট হইতে কোনও রকম কাজের প্রত্যাশী হও, তাহা হইলে তোমাদেরও উহাদের যথাযথ যত্ন লইতে হইবে।

কাপড় কাচিবার পর প্রত্যেকটি বালতি ও মগ, প্রত্যেকটি কাঠের টব ধুইয়া উপুড় করিয়া রাখিবে যাহাতে জল ঝরিয়া যায়। কাঠের টব যদি

জলশুদ্ধ রাখিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে কাঠ পচিয়া যাইবে। লেপ দেওয়া গামলাগুলি কাপড় কাচিবার পর মুছিয়া শুকাইয়া রাখিবে। কারণ ঐ পাত্র যদি জলশুদ্ধ ভিজা অবস্থাতেই রাখিয়া দাও তাহা হইলে জায়গায় জায়গায় উঠিয়া যাইতে পারে।

তোমাদের গৃহে যদি **বায়ুশূন্য চোঙ** থাকে, তাহা হইলে কাপড় কাচিবার পরে যন্ত্রটির সাবানজল ধুইয়া উহা উত্তমরূপে মুছিয়া তুলিয়া রাখিবে। চোঙের মধ্যে জল থাকিয়া গেলে সহজেই উহাতে মরিচা পড়িতে পারে এবং তাহা হইলে পরে আর উহা কাজ করিবে না। কাপড় কাচিবার কাঠের তক্তাগুলিও জল হইতে তুলিয়া মুছিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া সোজা করিয়া রাখিবে যাহাতে জল শুকাইয়া যায়। কাপড় শুকাইতে দিবার দড়ি বা র‍্যাক-গুলির যদি প্রত্যহ ব্যবহার না হয় তাহা হইলে উহাতে বাহিরের ধূলাবালি ইত্যাদি জড় হইতে পারে এবং পরে কাপড় শুকাইতে দিলে উহাতে দাগ ধরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রত্যহ প্রয়োজন না থাকিলে দড়িগুলি তুলিয়া রাখিবে এবং কাপড় শুকাইতে দিবার র‍্যাকটিকেও উঠাইয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া রাখিবে।

ইস্ত্রিগুলিকে সর্বদাই পরিষ্কার করিয়া রাখিবে যাহাতে ইস্ত্রির গায়ে কোনও প্রকার দাগ বা মরিচা ইত্যাদি না পড়ে। ইস্ত্রি করিতে হইলে ইস্ত্রির মসৃণতার দিকেই সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইস্ত্রি হইয়া গেলে ইস্ত্রির টেবিল হইতে কম্বল ও চাদরখানি তুলিয়া ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিবে; সর্বদা পাতা থাকিলে উহাতে বাহিরের ধূলাবালি ইত্যাদি পড়িয়া দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া যাইবে। জামার হাতা ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার যে বিশেষ বোর্ডগুলি আছে, ইস্ত্রির পরে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া ওয়াড় পরাইয়া রাখিবে। কারণ ঐ প্যাডগুলি যদি একবার ময়লা হইয়া যায়, পরে আবার উহা পরিষ্কার করা কঠিন হইবে।

কাপড় কাচিবার জল

নরম ও কঠিন জল :—

কাপড় কাচিবার প্রথম ও প্রধান উপকরণ জল। এই জল দুই রকমের হইয়া থাকে :—

(১) কঠিন বা খর জল

(২) নরম বা মৃদু জল

বস্ত্রাদি ধুইবার জন্য নরম জলেরই প্রয়োজন। এখন দেখা যাক্ নরম বা কঠিন জল কাহাকে বলে, এবং কাপড় ধুইবার পক্ষে নরম জলই বা প্রশস্ত কেন।

কঠিন জল—যে জলে গলিত ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে উহাকে 'কঠিন জল' বলা হয়।

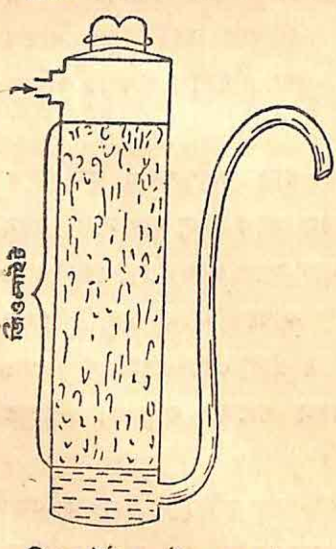
'কঠিন' বলার অর্থ এই যে, উহাতে সহজে সাবানের ফেনা হয় না এবং ফলে কাপড় কাচা প্রভৃতি কষ্টকর হইয়া উঠে ও অধিক পরিমাণে সাবানের প্রয়োজন হয়। এই জলে সাবান গায়ে মাখিলে গায়ের ময়লা কাটা দূরের কথা, বরঞ্চ গায়ে ময়লার একটি পর্দা পড়িয়া যায়। এই জল মাটি-গলিত ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে উহা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

নরম জল—অপরপক্ষে নরম জলে গলিত ধাতব-লবণ-পদার্থ কম থাকে এবং এই কারণে কঠিন জলের দোষগুলি নরম জলে দেখা যায় না। নরম জল **সুস্বাদু** এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। নরম জলে কার্বন ডায়োক্সাইড ও আরও নানাবিধ অম্ল বর্তমান থাকে। এই কারণে নরম জল, বিশেষত পানীয় জল, তামা, সীসা বা দস্তার পাত্রে রাখা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ঐ জল আংশিকভাবে এই সকল পাত্রের ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে পারে।

কঠিন জলকে নরম করিবার উপায়—কঠিন জল ফুটাইলে উহার কঠিনতা কিছু পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। কঠিন জল ফুটাইবার পরে কেটলির ঢাকার গায়ে বা কেটলির চারিদিকে অনেক সময় একটি সাদা শুকনো কঠিন বস্তুর পর্দা পড়িতে দেখা যায়। ঐ সাদা পদার্থটি কি? তোমরা জান বৃষ্টির

জল বায়ু হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস গ্রহণ করে ; কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস-মিশ্রিত জল, মাটির মধ্যে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা কার্বনেট অব্ লাইম থাকে উহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে। সুতরাং কেটলির জল যখন ফুটিতে থাকে, কেটলির জলের কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস উড়িয়া যায় এবং এই গ্যাসের অভাবে জলেরও মাটি হইতে আহৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে দ্রবীভূত করিয়া ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতাটি চলিয়া যায় ও ইহার ফলে কার্বনেট কেটলির তলায় বা গায়ে লাগিয়া থাকে। সুতরাং কেটলির গায়ের শ্বেত পদার্থ আর কিছুই নহে—জলের পরিত্যক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এইভাবে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটও কখনও কখনও কেটলির তলায় পড়িয়া থাকিতে পারে।

কাজেই দেখিতেছ, জলের ক্যালসিয়াম কার্বনেট হইতে সৃষ্ট যে কাঠিন্য উহা অস্থায়ী, কারণ জল ফুটাইলেই ঐ কাঠিন্য দূর হয়। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, জল ফুটাইলে এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট নীচে পড়িয়া থাকিলেও জলের কাঠিন্য দূর হয় না। ইহার কারণ, অনেক সময় জলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ম্যাগনেসিয়াম ব্যতীত আরও অনেক ধাতব লবণ থাকে, যাহার প্রভাব এইভাবে কেবলমাত্র জল ফুটাইয়া দূর করা সম্ভব নয়। এই কাঠিন্যকে **স্থায়ী কাঠিন্য** বলা হয়। জলের স্থায়ী কাঠিন্যের উৎপত্তি সাধারণত ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হইতেই। জলের সহিত যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাপড়কাচা সোডা মিশাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে স্থায়ী কাঠিন্য দূরীভূত হইতে পারে।



জিওলাইট ওয়াটার সফ্নার

এতদ্ব্যতীত জিওলাইট ওয়াটার সফ্নার (Zeolite Water Softner) নামক যন্ত্রের সাহায্যেও স্থায়ী কঠিন জলকে নরম করা যাইতে পারে। **জিওলাইট** কতকগুলি খনিজ পদার্থের সমবায়। উক্ত যন্ত্রের মধ্যে এই জিওলাইট পদার্থ থাকে এবং কঠিন জলকে উহার মধ্য দিয়াই চালিত করা হয়। জিওলাইট-দ্রব কঠিন জলের

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম টানিয়া লইয়া উহার স্থান সোডিয়াম সল্ট্ দ্বারা পূরণ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সোডার সংমিশ্রণে জলের কাঠিন্য কতক পরিমাণে দূর হয়।

সিল্ক বা রেশম বস্ত্র ধুইবার প্রণালী :—

রেশম 'গুটপোকা' অথবা 'রেশমকীট' নামক একপ্রকার কীটের দেহনিঃসৃত নির্যাস হইতে প্রস্তুত এক রকম সূক্ষ্ম তন্তু বিশেষ। ইহা স্বভাবত মসৃণ ও উজ্জ্বল। কাজেই অত্যধিক উত্তাপে ইহার ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতা নষ্ট হইয়া যায়। অত্যধিক রগড়ানো বা ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগও রেশম-বস্ত্রে নিষিদ্ধ। রেশম-বস্ত্র ধুইতে হইলে বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার প্রয়োজন। রেশমী কাপড় কাচিতে অল্প গরম জলই প্রশস্ত। সূতি ও লিনেন কাপড়-চোপড়ে ময়লা যেমন গভীরভাবে বসিয়া যায়, রেশম-বস্ত্রে ময়লা সেইরূপ ভাবে বসিয়া যাইতে পারে না। কাজেই উহা বেশীক্ষণ সাবানগোলা গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। রেশম-বস্ত্র ধুইতে হইলে সমস্ত জলটুকুই ঈষদুষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিছুটা ঈষদুষ্ণ গরম জল লইয়া উহার সহিত হয় লাক্স সাবানের চূর্ণ (Lux flakes) নয় কোনও উৎকৃষ্ট কাপড়-কাচা সাবানের গুঁড়া মিশাইয়া লও। পূর্বেই বলিয়াছি রেশমবস্ত্র রগড়াইতে নাই। ঐ জলের মধ্যে রেশম কাপড়খানি ডুবাইয়া উহা কচলাইয়া, পরে কাঠের উপর রাখিয়া, সামান্য জলের ছিটা দিয়া থুপিয়া থুপিয়া কাচিবে যাহাতে উহার আঁশগুলির উপর অত্যধিক জোর না পড়ে ও উহা সরিয়া না যায়। পাছে রেশমের আঁশগুলি কুঞ্চিত হইয়া যায়, এই কারণে রেশম-কাপড় জোরে মোচড় দিয়া নিংড়ানো নিষিদ্ধ। তলায় দুই হাত দিয়া রেশমবস্ত্রখানি জল হইতে উঠাইয়া লইবে। এই ভাবে পরিষ্কার জল দিয়া রেশমের কাপড়খানি বার বার ধুইয়া লও। শেষবার ধুইবার সময় রেশমের কাপড় ঠাণ্ডা জলেও ডুবাইতে পার, কারণ জলের তাপের তারতম্য রেশম বস্ত্রের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না। ধুইবার পর হাতে চাপিয়াই রেশমবস্ত্র হইতে সমস্ত জলটুকু বাহির করিয়া দাও।

রেশমের কাপড়ে সাধারণত কলপের প্রয়োজন হয় না। তবে অত্যন্ত পাতলা সিল্ক ইত্যাদিতে যদি নিতান্তই কলপ দিতে হয়, তাহা হইলে গঁদের কলপ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। দুই পাইণ্ট জলে ৪ আউন্স গঁদের প্রয়োজন;

এই হিসাবেই গঁদ ব্যবহার করিবে। গঁদের টুকরাগুলি ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জলটি ছাঁকিয়া লইবে ও বোতলে ভরিয়া রাখিয়া দিবে। বোতলে ভরিবার সময় উহাতে কয়েক ফোঁটা ফরমালিন মিশাইয়া দিতে পার, উহাতে চিতি পড়া বন্ধ হইবে। তোমার কাপড়কে তুমি যেরূপ কঠিন করিতে চাও, সেই অনুযায়ী জলের সহিত বড় চামচে এক চামচ বা দু' চামচ গঁদের জল মিশাইয়া উহার মধ্যে কাপড়খানি ডুবাইয়া লইবে।

অত্যন্ত ভারী ও পুরু রেশম না হইলে উহা কখনও ঝুলাইয়া শুকাইতে দিবে না। পাতলা রেশমের কাপড় শুকাইতে হইলে উহা একটি বড় টাওয়েলের উপর পাতিয়া একটি রোলারে জড়াইয়া লও, টাওয়েলখানি তোমার কাপড় হইতে জল শুষিয়া লইবে। রেশমের কাপড় ইস্ত্রি করিবার সময় উহাতে কখনও জলের ছিটা দিবে না, কারণ দাগ পড়িয়া যাইবে। ইস্ত্রি অল্প গরম হইলে ইস্ত্রির উপর যথেষ্ট চাপ দিয়া ক্ষিপ্রহাতে

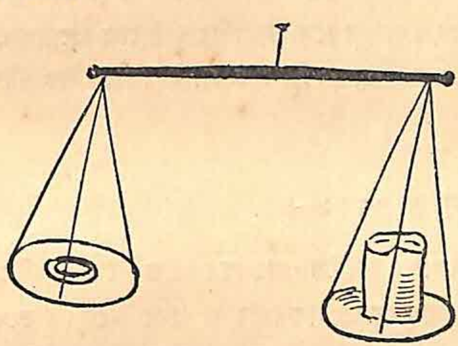


ক্ষিপ্রহাতে ইস্ত্রি চালাইয়া যাও

ইস্ত্রি চালাইয়া যাও। তোমার রেশমের কাপড়খানি যদি রঙিন হয় ও উহার একপিঠ সোজা ও অন্য পিঠ উল্‌টা থাকে তাহা হইলে ইস্ত্রি করিবার সময় উল্‌টা পিঠেই করিবে। ক্রেপ প্রভৃতি কৃত্রিম সিল্কের শাড়ী বা জামা ইত্যাদি ধুইবার সময় যদিও একই প্রণালী প্রয়োগ করিবে, কিন্তু উহাতে অধিকতর সাবধানতা প্রয়োজন, কারণ উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অত্যধিক গরম জল, অত্যধিক তাপ, ধুইবার সময় রগড়ানো, নিংড়ানো ইত্যাদি, কৃত্রিম রেশমের বেলায় একেবারেই বর্জন করিবে।

রন্ধনে মাপ ও মাত্রা

গৃহ-পরিকল্পনার বহুবিধ কাজের মধ্যে রান্নাও একটি। ইহাকে একটি কলাবিদ্যা বলা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে রান্নার কাজে আবার শিক্ষা করিবার কি আছে? ইহা তাঁহাদের নিতান্তই ভুল ধারণা। লেখাপড়া, গান বা সূচীশিল্প যেমন শিক্ষাসাপেক্ষ, ভাল রান্নাও তেমনি যথেষ্ট শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ইহার জন্যও যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের দরকার।



মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার প্রধান উপকরণ উপযুক্ত খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য তৈয়ারী করিতে হইলে উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তু নির্বাচন, উহার ভালমন্দ-বিচার, খাদ্য-প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা সকলের আগে দরকার। সুঘ্রাণযুক্ত, সহজপাচ্য, সুস্বাদু এবং পরিপাটী ভোজ্যদ্রব্য রন্ধন করিতে হইলে সে বিষয়েও শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

খাদ্যকে পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও সুস্বাদু করিয়া তৈয়ারী করিতে হইলে যেমন খাদ্য-উপাদান ও প্রস্তুতি-প্রণালী প্রভৃতি বিষয় জানিতে হয়, তেমনই খাদ্যের বিভিন্ন বস্তু ও উহা তৈয়ারী করিবার বিভিন্ন মাল-মসলাগুলির মাপ ও মাত্রা সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। রন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্যই খাদ্যের স্বাদ ও সুঘ্রাণ বাড়াইয়া খাদ্যকে **সুরুচিকর** ও **সুস্বাদু** করিয়া তোলা। এবং তোমরা জান খাদ্যের ঘ্রাণ ও স্বাদ এই দুইটি জিনিসই প্রধানত নির্ভর করে খাদ্যবস্তু ও রন্ধনের মাল-মসলাগুলির যথাযথ মাপ ও পরিমাণের উপর।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে প্রায় সমস্ত জায়গাতেই খাদ্যের প্রস্তাত-প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত। উহারা জানে, জাতিকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, মানুষের জীবনযাত্রায় খাদ্যকে প্রধান স্থান দিতে হয়। এই কারণেই উহাদের খাদ্য-নির্বাচন, খাদ্য-প্রস্তুতি, খাদ্য গ্রহণ করিবার রীতি ইত্যাদি প্রত্যেকটির পিছনেই রহিয়াছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। খাদ্যকে সুস্বাদু বা সুঘ্রাণবিশিষ্ট করা যেমন প্রয়োজন, তেমনিই প্রয়োজন খাদ্যের পুষ্টি, সহজ-পাচ্যতা, ইত্যাদি গুণগুলি সংরক্ষণ করা। এই কারণেই উহাদের দেশে যে-কোনও খাদ্যের প্রস্তুতি-প্রণালীতে রন্ধনের বিভিন্ন উপকরণ ও মাল-মসলাদির যথাযথ পরিমাণ ও মাত্রা ইত্যাদি দেওয়া থাকে। ইহা ছাড়া, কোন্ বস্তু কত মিনিট সিদ্ধ করিবে, কোন্ বস্তুতে কি পরিমাণ আঁচের প্রয়োজন, তৈয়ারী হইয়া গেলে উহা কিভাবে পরিবেষণ করিবে ইত্যাদি বিষয়গুলিও বিশদভাবে লিখিত থাকে।

বিভিন্ন মাপ ও ওজন :—

আমাদের দেশেও বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর প্রস্তুতিতে বিভিন্ন উপকরণগুলির যথাযথ মাপ ও মাত্রার যে প্রয়োজন হয় না এমন নহে। তবে সেই মাপ ও মাত্রা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিরূপিত হয়, মানুষের এই বিষয়ে পরিণত দৃষ্টি ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রত্যহের রান্নায় নুন, তেল, জল, মসলা ইত্যাদি আমরা খুব কদাচিৎ মাপিয়া দিয়া থাকি। আমরা চোখের দৃষ্টি দিয়া আন্দাজ করিয়াই উহাদের পরিমাণ ঠিক করিয়া লই। তবে বড় বড় অনুষ্ঠানাদিতে চিনি, ময়দা, আটা ইত্যাদি দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে সেরি, পোয়া, ছটাক, কাঁচ্চা, তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন বাটখারা দ্বারা অনেক সময়ে মাপিয়াও লওয়া হইয়া থাকে।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে আবার—বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে—দাঁড়িপাল্লার পরিবর্তে গৃহিণীরা বেতের তৈয়ারী **'কুনকে'** ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা একটা মাপের ও মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়। এক পোয়া হইতে এক সের পর্যন্ত মাপের কুন্‌কে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তরিতরকারিতে ছাড়াও বিভিন্ন সংসারে লোক হিসাব করিয়া প্রতিদিনের চাল, ডাল ইত্যাদি মাপিবার সময়েও তাঁহারা এই কুন্‌কেগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আবার তেল, ঘি প্রভৃতির বেলায় সাধারণত বড় চামচ বা **পলার মাপই** প্রচলিত। প্রতিদিন একটি ছোট গৃহস্থের সংসারে রাঁধিবার জন্য গড়ে এক পোয়া সরিষার তৈলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের ঘরে সেজন্য এক পোয়া মাপের বাটিই থাকে। রান্না করিবার পূর্বে ঐ বাটিতে তেল ঢালিয়া লইয়া পরে বিভিন্ন ব্যঞ্জন অনুসারে পলা বা চামচ করিয়া তাঁহারা তেল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মাত্রা নির্ধারণ :-

আজকাল শহরে বহু আধুনিক পরিবারে চামচ, মাপের গেলাস, পেয়ালা ইত্যাদি দ্বারা মাপ ঠিক করা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ মাপগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এক চামচ, দু'চামচ প্রভৃতি মাপে, অর্থাৎ চামচ প্রভৃতির ওজনে আসলে কতখানি জিনিস হয়, নীচে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

শুকনো ময়দা জাতীয় জিনিস ইত্যাদির মাপ :—

সমান করিয়া মাপা বড় চামচে (Table spoon) এক চামচ = ১ আউন্স

" " " মাঝারি চামচ (dessert spoon) এক চামচ = $\frac{১}{২}$ "

" " " চায়ের চামচ (tea spoon) " " = $\frac{১}{৪}$ "

যে-কোনও শুকনো জিনিস চামচ দিয়া মাপিবার সময় প্রথমে জিনিসটি নাড়িয়া চাড়িয়া লইবে—কারণ ময়দা জাতীয় জিনিস অনেক দিন একভাবে থাকিতে থাকিতে ক্রমশ জমাট হইয়া যায়। চামচ দিয়া মাত্রা ঠিক করিবার সময় প্রথমেই চামচখানি দিয়া স্তূপীকৃত করিয়া এক চামচ জিনিস উঠাইবে। পরে ছুরির ফলা বা ঐ রকম পাতলা ও চওড়া অন্য কোনও জিনিসের সাহায্যে ঐ স্তূপীকৃত ময়দার উদ্বৃত্ত উপরের অংশটি ছাঁটিয়া ফেলিবে—যে অবশিষ্ট অংশটি চামচে রহিল উহাই তোমার **এক চামচের মাপ**। আধ চামচ লইতে হইলে উপরি উক্ত উপায়ে লম্বালম্বি ভাবে চামচখানিকে ভাগ করিয়া অর্ধেক অংশ বাদ দিবে।

ময়দা জাতীয় শুকনো জিনিসগুলি স্বল্প পরিমাণ হইলে আমরা সাধারণত চামচ দিয়া মাপিয়া লইয়া থাকি—কিন্তু সম্ভব হইলে সেই সকল জিনিসও **ওজন করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ জানিবে।** মাখন প্রভৃতি জমানো চর্বিজাতীয়

জিনিসগুলি চামচ দিয়া মাপা অপেক্ষা ওজন করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। যে সকল ক্ষেত্রে মাপিয়া লওয়া সম্ভব হয় না, সেই সকল ক্ষেত্রে মোটামুটি নীচের হিসাবে মাপ নির্ধারণ করিতে পার—

২ পেয়ালা মাখন = ১ পাউণ্ড মাখন

$\frac{1}{2}$ " " = $\frac{1}{4}$ " "

এই সঙ্গে ইহা জানিয়া রাখিবে—বড় চামচের (table spoon) আট চামচ জিনিসে একটি পেয়ালার অর্ধেকটা পূর্ণ হয়। তরল পদার্থ ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করিতে অনেক সময়—বিশেষ করিয়া পশ্চিমের দেশগুলিতে, **পাইণ্ট** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। **এক পাইণ্ট ২০ আউন্সের সমান** জানিয়া রাখিবে।

উপকরণের তালিকা (Recipe) :—

উপরি-বর্ণিত উপায়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হইবে, এইরূপ বিভিন্ন উপকরণ ও উহাদের মাত্রা এবং পরিমাণ প্রথমেই ঠিক করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাই হইবে তোমাদের কোনও একটি বিশেষ খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করিবার উপকরণের তালিকা। রন্ধনে এই উপকরণের তালিকার বিশেষ প্রয়োজন। ইহার দ্বারাই তুমি তোমার ঐ বিশেষ খাদ্যবস্তু প্রণয়নে কত খরচ পড়িবে, উহা ব্যয়সাপেক্ষ হইবে কিনা, ঐ খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের উপাদান ও উপকরণগুলি ব্যবহার করার দরুন উহার গুণাগুণই বা কিরূপ হইবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি জানিয়া লইতে পার। তা ছাড়া কি কি জিনিস ঐ বিশেষ বস্তুটি তৈয়ারী করিতে তোমার প্রয়োজন হইবে, সেই সম্বন্ধে তোমার সঠিক ধারণা থাকার দরুন তুমি জিনিসগুলি পূর্বেই সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পার, যাহাতে রন্ধনের কাজ আরম্ভ করিয়া তোমাকে বারে বারে বিভিন্ন জিনিসের জন্য ছুটাছুটি করিতে না হয়। উহাতে মানসিক একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায় এবং রান্নাও আশানুরূপ হয় না। রন্ধনের কাজে প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস হাতের কাছে গুছানো থাকা প্রয়োজন। মোটের উপর বলিতে গেলে এই উপকরণের তালিকার উপর ভিত্তি করিয়াই রন্ধনের কাজ অগ্রসর হয়। কাজেই এইরূপ একটি উপকরণের তালিকা যে একান্তই আবশ্যক তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ।

মাপ ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা :—

প্রায় প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেই বিভিন্ন উপকরণগুলি একটি বিশেষ মাপ ও মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়। বিভিন্ন রন্ধনাদিতে কতটা লবণ বা কি পরিমাণ তেল-ঘি দিতে হইবে, কিংবা কতখানি মসলার প্রয়োজন হইবে, এইগুলি ঠিক মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারার উপরেই রান্নার স্বাদ, বর্ণ ও ঘ্রাণ নির্ভর করে। আগেই বলা হইয়াছে যে, রন্ধনকার্য একটি শিল্পকলা এবং এই শিল্পকলা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে রন্ধনের প্রত্যেকটি উপকরণ সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে শিখিতে হয় নতুবা রান্না সুস্বাদু হইবে না। অধিকন্তু রান্না করা জিনিসগুলির নিখুঁত রং ও বর্ণ, অর্থাৎ রান্না করা জিনিসগুলির পরিপাটী সৌন্দর্য ও রমণীয়তা পরিমিত মাপ ও মাত্রার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে। আমাদের দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতি-প্রণালী ও উপকরণগুলির বিভিন্ন মাপ ও মাত্রা যদি আমাদের জানা থাকে তাহা হইলে প্রস্তুতির দোষে ঐ খাদ্যদ্রব্য সহজে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইতে পারে না। এবং ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে পরিণত-বয়স্কদের প্রায় সকলেই বিনা-দ্বিধায় রন্ধনকার্যে অগ্রসর হইতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত রন্ধনের প্রত্যেকটি বিষয়েই যদি যথাযথ নিয়ম ও ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে উহাতে সংসারের অপচয়ও অনেকাংশে কমানো যাইতে পারে। কাজেই দেখিলে, রন্ধনে মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। এমন কি, রন্ধনকার্যে উহা অপরিহার্য বলিয়াই মনে করিতে পার।

খাদ্য

খাদ্যের কাজ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তোমরা পড়িয়াছ। দেহকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও স্বাভাবিক রাখিবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। শরীর সম্পর্কে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রধানত দুই রকমের :—

(১) দেহ-পরিপোষণ

(২) জীবনীশক্তি-সংরক্ষণ

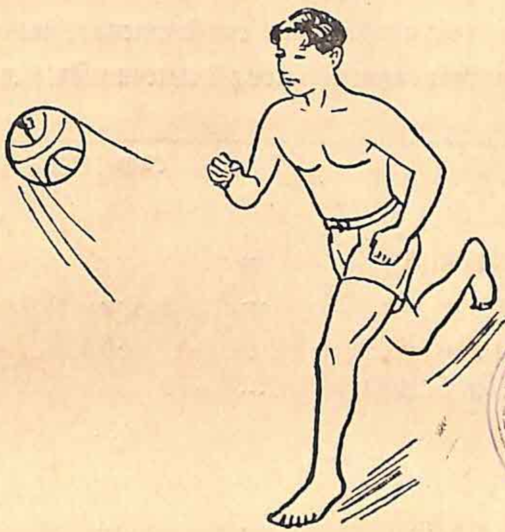
প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্যসকল 'দেহ-পরিপোষক' খাদ্যের অন্তর্গত ; আর জল, খনিজ লবণাদি ও ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণসমূহ



দেহ-পরিপোষণ

জীবনীশক্তিবর্ধক খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। তোমরা ইহাও পড়িয়াছ, খাদ্য বলিতে কেবলমাত্র রুটি, ঘি প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যবস্তু বুঝায় না। খাদ্য বলিতে প্রোটিন, স্নেহ, শ্বেতসার প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণকে বুঝায়। মানুষের শরীর প্রধানত **ছয় প্রকার** উপাদান দ্বারা গঠিত ও পরিপুষ্ট। সুতরাং শরীরের পরিপুষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য আমরা যে খাদ্য ও পানীয় প্রত্যহ গ্রহণ করি, উহা হইতে আমরা ঐ ছয় প্রকার উপাদানই সংগ্রহ করিয়া থাকি। **প্রোটিন** বা আমিষজাতীয় উপাদান,

শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় উপাদান, চবি বা **স্নেহ** জাতীয় উপাদান, **লবণ** জাতীয় উপাদান, **জল** এবং খাদ্যপ্রাণ বা **ভাইটামিন**—প্রত্যেক খাদ্যেই কম-



জীবনীশক্তি সংরক্ষণ

বেশী এই ছয়টি উপাদান আছে। যে খাদ্যে যে উপাদান বেশী থাকে, সেই খাদ্যকে সেই উপাদানের পর্যায়ে ফেলা হইয়া থাকে তোমরা জান,—যেমন, 'শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য' বলিলে শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যই বুঝাইবে।

স্নেহজাতীয় খাদ্য

স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের উপাদান :—

মাখন, তেল, ঘি, চর্বি ইত্যাদি স্নেহপ্রধান খাদ্য। স্নেহপ্রধান খাদ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন—এই তিনটি উপাদান আছে, যদিও উপাদানগুলির মাত্রা সমান নয়; যেমন, কার্বনের তুলনায় অক্সিজেনের মাত্রা খুব সামান্য।

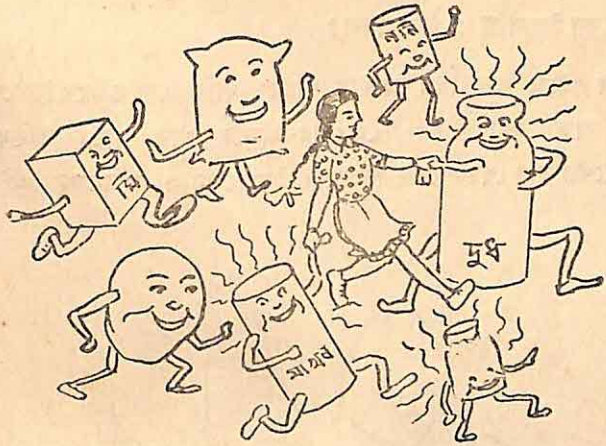
স্নেহজাতীয় খাদ্যে সকল সময়ে যে স্নেহ-উপাদানের পরিমাণ সমান থাকে তাহা নয়। যেমন মাখনে শতকরা ৮৫ ভাগ স্নেহ-জাতীয় উপাদান ও বাকী ১৫ ভাগ জল থাকে। অপরপক্ষে আবার শূকরের চর্বি কিংবা আগুনে ঝলসানো মাংসের যে গলিত মেদ পাওয়া যায় উহার মধ্যে স্নেহ-উপাদানের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। কয়েকটি স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

খাদ্য			স্নেহজাতীয় উপাদানের ভাগ (শতকরা)
মাটন (ভেড়ার মাংস)	...	...	২৫·৫
তৈল ...	...	...	১০০
কড্ লিভার তেল	...	...	১০০
ঘি ...	...	...	১০০
মাখন ...	...	...	৮৫
বাদাম ...	...	...	৬০
পনীর ...	...	...	৩০-৩৭
ননী ...	...	...	১০০

স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা :—

স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিশেষ কাজ শরীরে তাপ সঞ্চয় করা ও কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া দেওয়া। তাপই জীবন, তোমরা পড়িয়াছ। যাহার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য যত বেশী, কর্মচাঞ্চল্যও তাহার ততই অধিক। স্নেহজাতীয় খাদ্যের কর্মশক্তি বাড়াইবার এই ক্ষমতা শ্বেতসার বা আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রায় দ্বিগুণ। এই জন্যই শীতপ্রধান দেশে স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী অনুভূত হয়। ইহা ছাড়া, স্নেহজাতীয় খাদ্যে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে বলিয়া উহা আমাদের স্নায়ু-গঠনেও যথেষ্ট সহায়তা করে। এইজন্যই ছাত্র, ছাত্রী ও শিশুদের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ অত্যধিক হইলে একদিকে যেমন শরীরে মেদবৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা থাকে, অপরদিকে আবার

তেমনি ইহার অভাব ঘটিলেও ক্ষয়কাশ, শ্বাসরোগ প্রভৃতি উপসর্গগুলি দেখা দিতে পারে। কেবলমাত্র স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের উপরেই জীবনধারণ করা চলে-



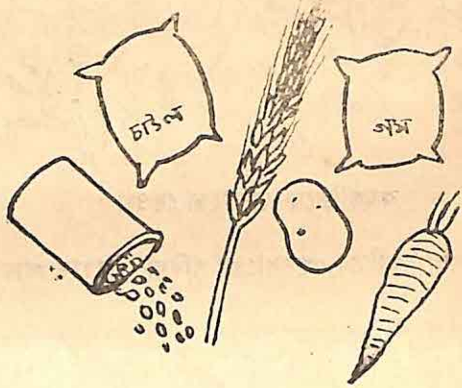
কর্মশক্তিকে বাড়াইয়া দেওয়া

না। যতটা স্নেহ-পদার্থ খাইবে শ্বেতসারের পরিমাণ তাহার প্রায় দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য

শ্বেতসারের উৎপত্তি ও উৎপাদন :—

উদ্ভিদ হইতে আমরা যে সব খাদ্য পাইয়া থাকি সেইগুলিকেই 'শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য' বলা হয়। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য মাত্রই উদ্ভিদ-উদ্ভূত। স্নেহ-পদার্থের ন্যায় শ্বেতসারেও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনটি



শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য

উপাদান আছে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছ যে, শ্বেতসার ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্য, দুইয়ের কোনটাতেই নাইট্রোজেন নাই এবং এই জন্যই এই উভয় প্রকার খাদ্য দৈহিক পরিপোষণ অপেক্ষা দৈহিক তাপ-সংরক্ষণে অধিকতর সহায়তা করে।

শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) বিশুদ্ধ-শর্করা-জাতীয় (Monosaccharides)

(২) সংযুক্ত-শর্করা-জাতীয় (Disaccharides)

(৩) বিশুদ্ধ শ্বেতসার বা ঘনীভূত শর্করা (Polysaccharides, e.g. starches)

বিশুদ্ধ শর্করা :—বিশুদ্ধ-শর্করা-জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আঙুরের শর্করা বা গ্লুকোজ (glucose), ফলের শর্করা বা ফ্রাকটোস (fructose), দুধের শর্করা বা ল্যাক্‌টোস (lactose)—এই তিন রকম শর্করাই বিশুদ্ধ শর্করার পর্যায়ে পড়ে।

সংযুক্ত শর্করা :—সাদা চিনি, লাল চিনি, নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ চিনি ও শস্যশর্করা বা ম্যালটোস (maltose) ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। এই শর্করার প্রতি কণা বিশুদ্ধ শর্করার দুই কণার সমান।

ঘনীভূত শর্করা :—দুই বা ততোধিক বিশুদ্ধ শর্করার সংমিশ্রণেই ঘনীভূত শর্করার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আবার ঘনীভূত শর্করার মধ্যে কোনও একটি বিশুদ্ধ শর্করার বহুল পরিমাণে উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন, স্টার্চ একটি ঘনীভূত শর্করা, কিন্তু ইহার মধ্যে গ্লুকোজ-জাতীয় শর্করাই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। এরোরুট, সাগু, ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যে প্রায় ৯০ ভাগ স্টার্চ ও সামান্য জল আছে। আলু, চাউল, শটি প্রভৃতিও স্টার্চের পর্যায়েই পড়ে। সেলুলোজও (cellulose) একপ্রকার ঘনীভূত শর্করা-জাতীয় খাদ্য। শাক-সবজি, তরিতরকারি ইত্যাদি সেলুলোজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সেলুলোজ কি :—

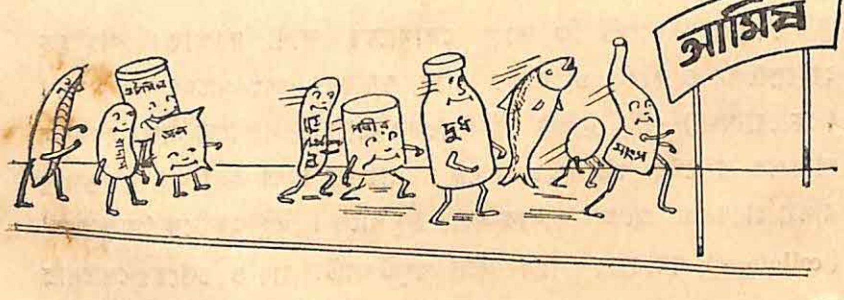
'সেলুলোজ' বস্তুটি কি তাহা তোমাদের জানা দরকার। বায়ুস্থিত হাইড্রোজেন ও কার্বন ডায়ক্সাইড গ্যাস, সূর্যকিরণ এবং গাছের রঞ্জন-পদার্থ (ক্লোরোফিল)—এই চারিটি জিনিসের সংমিশ্রণে ও সাহায্যে গাছে একরকম দানাদার পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকেই **শ্বেতসার** বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক দানার একটি ত্বক্ থাকে। এই ত্বক্‌টিকে 'সেলুলোজ' (cellulose) বলা হয়। গরম জলে ত্বক্‌টি ফাটিয়া যায় ও ভিতরের শ্বেতসার সহজে সিদ্ধ হয়। দেহে তাপসঞ্চার করিতে বা কর্মশক্তি বাড়াইতে সেলুলোজ তেমন সহায়তা করে না, কিন্তু উহাতে লবণ আছে বলিয়া উহা সহজে কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে দেয় না।

শ্বেতসারের প্রয়োজনীয়তা :—

শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের কর্মশক্তি বৃদ্ধি করা ও দেহে তাপ সঞ্চার করা ছাড়াও আরও একটি কাজ আছে। রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখিবার জন্যও শ্বেতসারের প্রয়োজন। মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্য অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে সাধারণত অম্ল হইয়া থাকে। এই অম্ল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহা নষ্ট করিবার জন্যই শ্বেতসার-খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই জাতীয় খাদ্য তাই এত উপকারী। যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার খাইলে অপেক্ষাকৃত কম প্রোটিন খাইয়াও মানুষ সুস্থ শরীরে অধিক দিন বাঁচিতে পারে। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যকে এই কারণেই '**প্রোটিন-বাঁচোয়া**' খাদ্য বলা হয়। পাকস্থলীর মধ্যে যে পরিপাক-ক্রিয়া হয় উহার ফলে শ্বেতসার-খাদ্য শর্করায় (glucose) রূপান্তরিত হয়। এই শর্করাই পরে রক্তের সহিত মিশিয়া কিছুটা মাংসপেশীতে ও কিছুটা যকৃতে জমা হয়। পরিশ্রমের সময় আমরা আমাদের এই জমানো শর্করাই খরচ করি। এই কারণেই তোমরা দেখিতে পাও, শ্রমশীল ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

প্রোটিন বা আমিষ-জাতীয় খাদ্য

সাধারণত দুধ, ছানা, পনীর, মাছ, মাংস, ডিম, ওটমিল, ডাল,



প্রোটিন প্রতিযোগিতা

মটরশুঁটি ইত্যাদিকে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই

জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ যথেষ্ট, এই কারণে ইহাকে 'নাইট্রোজেন-বহুল' খাদ্যও বলা হয়। উপরে যে কয়টি খাদ্যের নাম করা হইল, তাহাদের কোন্‌টির মধ্যে কি পরিমাণ 'প্রোটিন' আছে তাহা এখানে দেওয়া হইল।

খাদ্য	প্রোটিনের ভাগ (শতকরা)
পনীর	২৫
রান্না করা মাংস	২০-৩০
„ „ মাছ	১১-২৫
ডিম	১২
দুধ	৩
বাদাম	৯-২৮
রান্না করা ডাল বা মটরশুঁটি	৬-৮

খাদ্য-বিশেষে প্রোটিনের প্রকারভেদ আছে। প্রোটিন-পদার্থ মাত্রেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান দেখা যায়। ঐগুলিকে **'অ্যামিনো অ্যাসিড'** (amino acid) বলা হয়। লাইসিন (lysine), গ্লাইসিন (glycine) প্রভৃতি প্রায় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিষয় জানা গিয়াছে। যে সমস্ত প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের প্রোটিনে এই ২০টির প্রায় সব-কয়টি অ্যামিনো অ্যাসিডই পাওয়া যায় সেই সকল প্রোটিনকে সু-সম্পূর্ণ অথবা **সুষম** কিংবা **উচ্চাঙ্গের** (superior) প্রোটিন বলা হয়। জীবদেহ হইতে উদ্ভূত খাদ্যের প্রোটিন, যেমন, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনীর প্রভৃতি **উচ্চাঙ্গশ্রেণীর**। অপর পক্ষে উদ্ভিদ্ হইতে উদ্ভূত প্রোটিন, যেমন—ডাল, শিম, মটরশুঁটি ইত্যাদি **নিম্নশ্রেণীর**।

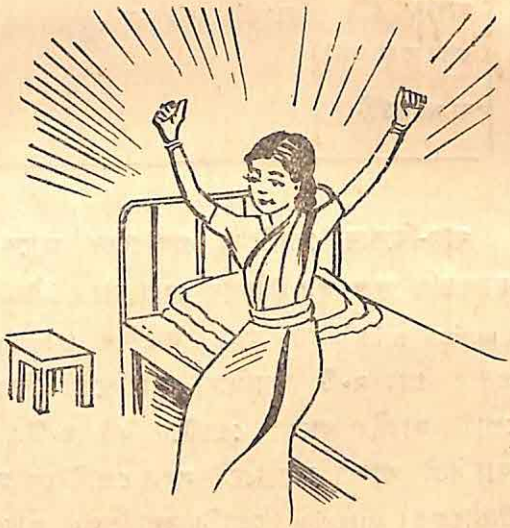
তোমরা শুনিয়া আসিতেছ প্রোটিন **শ্রেষ্ঠ** বা **প্রধান খাদ্য**। কিন্তু উহাকে শ্রেষ্ঠ খাদ্য কেন বলা হয় কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? পূর্বেই পড়িয়াছ,

প্রত্যেক প্রোটিন খাদ্যের প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড নামে কতকগুলি উপাদান আছে।

এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি দেহের গঠন, পুষ্টি ও বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক। রোগ ও পরিশ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় পূরণেও এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির প্রয়োজন অত্যধিক। কাজেই দেখিতেছ—প্রোটিন উহার অ্যামিনো অ্যাসিডের সাহায্যে দেহের যথাযথ গঠন, পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া দেহকে পরিপোষণ করে ও



প্রোটিন দৈহিক ক্ষয় পূরণ করে



প্রোটিন রোগ প্রতিরোধ করে

কর্মশক্তি বাড়ায়। প্রোটিনই আবার দৈহিক ক্ষয় ইত্যাদি পরিপূরণ করিয়া রোগ প্রতিরোধ করে। এই সকল কারণেই খাদ্যোপকরণের প্রথমেই প্রোটিন স্থান পাইয়াছে। 'প্রোটিন' কথাটির বাংলা অর্থ **প্রথম** বা **প্রধান**।

বিভিন্ন বয়সে প্রোটিনের প্রয়োজনীয় মাত্রা :—বিভিন্ন বয়সের লোকের জন্য বিভিন্নমাত্রার প্রোটিন-খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আগেই বলা হইয়াছে

যে, প্রোটিন-বহুল খাদ্যের প্রোটিনের উপরেই আমাদের দেহের পরিপুষ্টি ও পরিপোষণ নির্ভর করে। এই কারণেই প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পর্যন্ত, বর্ধিষ্ণু ছেলে-মেয়ের খাদ্যে **মাছ, মাংস, ডিম, দুধ** প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় **প্রোটিন** যথেষ্ট পরিমাণে থাকা আবশ্যক। একজন পরিশ্রমী প্রাপ্ত-বয়স্কের প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৭০ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। সেইরূপ একজন পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের ৬০ গ্রাম প্রোটিন আবশ্যক। দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণের যদি ক্রমাগতই অভাব হইতে থাকে, তাহা হইলে দেহ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও নানাবিধ রোগাক্রমণের লক্ষণ দেখা দেয়। ২৫ বৎসরের পর হইতে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয় ও সেই অনুসারে শ্বেতসার ও ফল ইত্যাদির পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে দুধ ও মাছ ব্যতীত অন্য প্রোটিনের তেমন প্রয়োজন হয় না।

বিভিন্ন বয়সে প্রতিদিন কি পরিমাণ প্রোটিন প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

বয়স		প্রোটিন, (গ্রাম হিসাবে)
১—৩ বছর	...	৪০
৪—৬ „	...	৫০
৭—৯ „	...	৬০
১০—১২ „	...	৭০
মেয়ে ১৩—১৫ „	...	৮০
„ ১৬—২০ „	...	৭৫
ছেলে ১৩—১৫ „	...	৮৫
„ ১৬—২০ „	...	১০০

নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য :—আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে দুধ, ডিম, মাংস, মাছ, বাদাম ও ডাল প্রধান। এই খাদ্যগুলির মধ্যে কোন্‌টির কি গুণ বা কি দোষ এবং

কোন্‌টিতে কি কি উপাদান আছে, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। খাদ্যের গুণাগুণ জানা থাকিলে খাদ্য-নির্বাচনে সুবিধা হয়। প্রথমে আমরা দুধের কথা আলোচনা করিব, কারণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় দুধের স্থান সকলের আগে।

দুধ ঃ—ইহা একটি প্রোটিন-বহুল খাদ্য। দুধের মত উপকারী এবং পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই। দুধের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর পদার্থের সংমিশ্রণ দেখা যায়। শিশুর শরীর বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত শুধু দুধের দ্বারাই পরিপুষ্ট, বর্ধিত ও সুগঠিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেহ-গঠন, পরিপোষণ ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার সবগুলিই প্রায় আমরা দুধের মধ্যে পাই। দুধ তাই একটি **পূর্ণাঙ্গ খাদ্য**।

দুধের মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান কি পরিমাণে আছে, তাহা চিন্তা করিলেই খাদ্য হিসাবে ইহার মূল্য কতখানি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। নীচে দুধের উপাদানগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল। এখানে দুধ বলিতে গরুর দুধই বুঝিতে হইবে ঃ—

দুধের উপাদান			পরিমাণ (শতকরা)
প্রোটিন	...	...	৩·৩
চর্বি	...	...	৪·০
শ্বেতসার	...	...	৫·০
জল	...	...	৮৭·৭
ধাতব পদার্থ	...	...	১·০
খাদ্যপ্রাণ			এ, বি (১) রিবোফ্লেভিন ও ডি

দুধ অনেক প্রকারের হইয়া থাকে, যেমন গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, মহিষের দুধ ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন দুধের উপাদানও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে।

মহিষের দুধে চর্বি, গরুর দুধের প্রায় ৪ গুণ। এই কারণেই উহা সহজে হজম হয় না। কিন্তু হজম করিতে পারিলে উহা গরুর দুধ অপেক্ষা অনেক বেশী পুষ্টিকর জানিবে। ছাগলের দুধ ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতেও চর্বির ভাগ যদিও গরুর দুধ অপেক্ষা কিছু বেশী, কিন্তু প্রোটিনের মাত্রা অনেক কম। মায়ের দুধে শর্করা-জাতীয় পদার্থ অন্যান্য দুধ অপেক্ষা বেশী। দুধের মধ্যে যে প্রোটিন আছে উহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং মাছ-মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা ঐ প্রোটিন অনেক সহজে ও কম সময়ে হজম হয়। ইহা ছাড়া খাদ্যের ক্যালসিয়াম প্রধানত দুধের উপরেই নির্ভর করে। এই কারণেই আহার্যের মধ্যে ফলমূল ইত্যাদি যতই খাও না কেন, কিন্তু কোনও খাদ্যেই দুধের অভাব মেটানো সম্ভব নয়। দুধে প্রায় সকল রকম ধাতব লবণেরই উপস্থিতি দেখা যায়। দুধে ভাইটামিন এ, বি ও রিবোফ্লেভিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কাজেই দেখিতেছ আমাদের দেহের পুষ্টি, গঠন, যথাযথ পোষণ ও সংরক্ষণ দুধের উপরেই অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এবং অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দুধের অভাব পরিপূরণ করা সম্ভব নয়। শিশুদের পক্ষে দুধ সব সময়েই একটি **পূর্ণ ও আদর্শ খাদ্য**। এখানে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। শিশুকে গরুর বা ছাগলের দুধ খাওয়াইবার সময় উহাতে উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ ফুটন্ত জল মিশাইয়া লইবে নতুবা শিশুর পক্ষে উহা হজম করা কঠিন হইবে। একই দুধ, মাঠাতোলা দুধ, ঘন দুধ, টিনের দুধ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে গৃহস্থের সংসারে প্রতিদিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রাদির সাহায্যে দুধ হইতে মাখন উঠাইয়া লইলে যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে উহাই **মাঠাতোলা দুধ**। মাখন তুলিয়া লওয়ার দরুন এই দুধে চর্বির পরিমাণ আর কিছুই থাকে না বলিয়া ইহা শিশুদের পুষ্টি ও গঠনে বিশেষ সহায়তা করে না। দুধ অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিলে উহার জলীয় অংশ উড়িয়া যায় ও দুধ ঘন হয়। **ঘন দুধ** যদিও খাইতে সুস্বাদু হয়, কিন্তু উহা হজম করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে এবং অল্প আঁচে অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিবার ফলে ইহার ভাইটামিনগুলিও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। **টিনের দুধের** আজকাল যথেষ্ট চল। টিনের দুধে, দুধের প্রায় সমস্ত উপাদানগুলিই থাকে—একমাত্র জল ছাড়া। জল মিশাইয়া লইলেই উহা দুধের সমান হয়। কিন্তু টাটকা দুধ পাওয়া গেলে টিনের দুধ ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত।

এতদ্ব্যতীত **দই, ঘোল, ছানা** প্রভৃতি সমস্তই দুধ হইতেই তৈয়ারী। দুধ ভাল করিয়া জাল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে আগের জমানো সামান্য দই ফেলিয়া দিলেই উহা জমিয়া দইএ পরিণত হয়। দুধ অপেক্ষা দই অধিকতর সহজপাচ্য। দই হইতে মাখনটুকু তুলিয়া লইলে উহা **ঘোলে** পরিণত হইল। দই অপেক্ষা ঘোল সহজপাচ্য এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ইহা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ফুটানো দুধে লেবুর রস বা পূর্বের তৈয়ারী কিছু ছানার জল দিলে দুধ কাটিয়া যায়, এবং দুধের প্রোটিন, উহার ক্যালসিয়াম ও কিছু পরিমাণ স্নেহ-পদার্থ **ছানার** আকারে নীচে পড়িয়া থাকে—জলের অংশ আলাদা হইয়া যায়। এই ছানার মধ্যে দুধের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ থাকে এবং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর।

ইহা ছাড়া **সর, মাখন, ঘি** ইত্যাদিও আমরা দুধ হইতেই পাইয়া থাকি। মাখন জাল দিলে **ঘি** তৈয়ারী হয়। ঘি অত্যন্ত বলকারক।

একটি কথা মনে রাখিবে। দুধ জাল না দিয়া কাঁচা অবস্থায় কখনই গ্রহণ করিবে না, কারণ দোহন হইতে আরম্ভ করিয়া দুধ-পান পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে দুধ বহুভাবেই দূষিত হইতে পারে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণত গোয়ালঘরগুলি অত্যন্ত আবর্জনাযুক্ত ও নোংরা থাকে। এই সকল জায়গার নানা রকম দূষিত পদার্থ দুধকে দূষিত করিতে পারে। পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতার অভাবে অনেক সময় গরুর বাঁটেও ঘা হইতে দেখা যায়। তাছাড়া অজ্ঞতা ও অশিক্ষার দরুন গোয়ালাদের ময়লা অপরিষ্কার হাত ইত্যাদি দুধে ডোবানো ও যে-কোনও স্থান হইতে জল মিশাইয়া দুধ বিক্রি করার অভ্যাস তো আছেই। দুধ যাহাতে আনা-নেওয়ার সময় চল্‌কাইয়া না পড়ে সেজন্য গোয়ালারা অনেক সময় দুধের মধ্যে নানা রকম পাতা ইত্যাদিও ডুবাইয়া দিয়া থাকে। ইহাতেও দুধে নানারকম দূষিত পদার্থ ইত্যাদি প্রবেশ করিতে পারে।

ডিম ঃ—ডিম একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গৃহস্থের সংসারে দৈনিক খাদ্য-তালিকায় **দুধের পরেই ডিমের স্থান**। ডিমে প্রোটিন ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। একটি ডিম হাতে লইয়া দেখিবে, উহার বাহিরে একটি শক্ত সাদা আবরণ, ইহাকে আমরা ডিমের খোসা বলি। এই আবরণের ভিতরে দুইটি অংশ, একটি সাদা, অপরটি হলুদ রঙের। হলুদ রঙের অংশটিকে

ঘিরিয়াই থাকে ঐ সাদা অংশটি। হলুদ রঙের অংশটিকে সাধারণত **ডিমের কুসুম** বলা হয়, এবং কুসুমের চারিপাশের শ্বেতাংশটিকে বলা হয় **অ্যালবুমিন** বা ডিমের লালা। একটি ডিমের ওজনের প্রায় শতকরা ৫৮ ভাগ শ্বেতাংশ ও ৩০ ভাগ কুসুম। বাকী ১২ ভাগ ওজন থাকে ডিমের খোলায়। শ্বেতাংশের উপাদান প্রোটিন; ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ-জাতীয় উপাদান, লৌহ, ফস্‌ফরাসজাত লবণ, ভিটেলাইন (vitellin = phospo protein) ও লেসিথিন (lecithin) থাকে। স্নায়ুর ক্ষয়-পূরণে ও গঠনে ফস্‌ফরাস ও লেসিথিন দুয়েরই অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কারণেই, তোমরা হয়তো জান, চিকিৎসকেরা সাধারণত পরীক্ষার্থীদের 'ফস্‌ফোলেসিথিন' খাইবার নির্দেশ দেন। এতদ্‌ব্যতীত ডিমে ভাইটামিন এ, বি (১), বি (২) ও ডি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধনে ও পরিপোষণে ডিমও একটি মূল্যবান খাদ্য। ডিমের আর একটি সুবিধা আছে। ইহার উপরে একটি কঠিন আবরণ থাকায় ডিমের ভিতরের খাদ্যাংশ সব সময়েই সুরক্ষিত ও নির্দোষ থাকে। ডিমে লৌহ-লবণ আছে বলিয়া রক্তশূন্যতা বা রক্তাল্পতায় ইহা বিশেষ উপকারী। ডিম ও দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্যে এত সহজে গ্রহণীয় ক্যালসিয়াম লবণ পাওয়া যায় না।

ডিম হজম হওয়া না হওয়া সাধারণত ডিমের রন্ধন-প্রণালীর উপরেই নির্ভর করে। **কাঁচা, অল্পসিদ্ধ** বা **অর্ধ-সিদ্ধ ডিম** সহজে হজম হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা ডিম বা ভাজা ডিম ইত্যাদি হজম করা সময়-সাপেক্ষ ও কঠিন।

পচা ডিম বাছিবার উপায় :—ডিমটিকে আলোর সামনে তুলিয়া ধরিলে উহার মধ্যভাগটি যদি **স্বচ্ছ দেখা যায়,** তাহা হইলে জানিবে ডিমটি পচা নয়। মধ্যভাগটি যদি ঘোলা হয় ও দুইটি প্রান্ত যদি স্বচ্ছ হয়, তাহা হইলে জানিবে, ডিমটি পচিয়া গিয়াছে। লবণ-জল করিয়া উহার মধ্যে ডিমটিকে ফেলিয়াও পরীক্ষা করিতে পার। যদি দেখ ডিমটি ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে জানিবে, উহা পচা। পচা ডিম অপেক্ষাকৃত হালকা হইয়া থাকে।

মাংস :—মাংস একটি প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রোটিন যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহা যেমন বলকারক তেমনি পুষ্টিকর। এই উৎকৃষ্ট-জাতীয় প্রোটিন 'মায়োসিন', অ্যালবুমিন' ও 'হেমোগ্লোবিন'-এর আকারে আছে।

'জিলেটিন' নামক নিকৃষ্ট জাতীয় প্রোটিনও মাংসের মধ্যে পাওয়া যায়। মাংস রাঁধিবার সময় মাংস-কোষের মধ্যে যে সংযোজক তন্তু থাকে, উহার কোলোজেন গলিয়া যায় এবং এই গলানো কোলোজেন হইতেই জিলেটিনের সৃষ্টি হয়। এই সংযোজক তন্তুগুলির মধ্যে চর্বিও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। বিভিন্ন জন্তুর মাংস-বিশেষে এই চর্বির পরিমাণেরও তারতম্য হয়। রাঁধিবার সময় মাংস হইতে একপ্রকার সুগন্ধি নির্যাস নির্গত হয়. ইহাই মাংসকে সুগন্ধ ও সুস্বাদু করে। ইহাই প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ। লৌহ, ফস্‌ফেট, পটাসিয়াম প্রভৃতি লবণও মাংসের মধ্যে পাওয়া যায়। টাটকা মাংসে ভাইটামিন এ, ডি, ও ই থাকে। এই সকল বিভিন্ন উপাদানের জন্যই মাংস এত পুষ্টিকর ও বলকারক।

ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর মাংসের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত ছাগমাংসই বেশী প্রচলিত। ইহা সহজে হজম হয়, খাইতে সুস্বাদু ও নরম। ভেড়ার মাংস প্রায় ছাগমাংসেরই সমান ; তবে ইহাতে চর্বির পরিমাণ বেশী থাকায় সহজে হজম হয় না। কাজেই রোগী ও শিশুদের পক্ষে ইহা অনুপযোগী।

পাখীর মাংসে চর্বি কম থাকে ও ইহা সহজে হজম হয়। সাধারণত মুরগী, পায়রা, তিতির প্রভৃতি পাখীর মাংস সুপাচ্য ও পুষ্টিকর। হাঁস, সারস প্রভৃতি পাখীর মাংসও সুখাদ্য, কিন্তু উহাতে চর্বির ভাগ একটু বেশী থাকায় উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

টাটকা মাংস চিনিবার উপায় :—শরীরের পক্ষে অধিকাংশ মাংসই পুষ্টিকর। কিন্তু মাংস টাটকা রান্না করা ও খাওয়া দরকার। বাসী মাংস সর্বদাই বর্জন করিবে। টাটকা মাংস চিনিবার কতকগুলি উপায় আছে। টাট্‌কা মাংস দেখিতে জমাট, কঠিন ও স্বাভাবিক স্বচ্ছ লাল আভাযুক্ত হইবে। যদিও দেখিতে উহা কঠিন মনে হয়, কিন্তু টানিয়া ছিঁড়িতে গেলে মনে হয় উহা যথেষ্ট নমনীয়। বাসী বা পচা মাংসে এই কঠিন ও স্বচ্ছভাব থাকে না এবং উহা দেখিতে যেন অপরিষ্কার, ভিজা ও ফ্যাকাসে মনে হয়। বাসী মাংসের চর্বিগুলি যেন জেলির মত হইয়া বিন্দু বিন্দু উহার গায়ে লাগিয়া থাকে। টাটকা মাংসের উপরের অংশ দেখিতে

সম্পূর্ণ জলশূন্য মনে হয়। বাসী মাংস টানিলে সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। আর, একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবে। বাসী ও পচা মাংসে অনেক সময় একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়; এইরূপ মাংস খাইলে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

মাছঃ—আমাদের গৃহস্থের সংসারে আমিষ খাদ্যের মধ্যে **মাছই প্রধান** এবং খাদ্য হিসাবেও ইহা একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, ইহার পরিপোষণ-ক্ষমতাও অনেক। মাছে চর্বির অংশ কম থাকে বলিয়া ইহা মাংস অপেক্ষা সহজে হজম করা যায়। একমাত্র সি-ভাইটামিন ছাড়া মাছে আর সকল ভাইটামিনেরই উপস্থিতি দেখা যায়। মাছে আয়োডিনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের মাছগুলিতে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ও দুর্বল—সকল লোকদের পক্ষেই মাছ বিশেষ উপকারী খাদ্য। চক্ষু ও মস্তিষ্কের পুষ্টির পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

মাছ দুই রকমের হইয়া থাকে। যে সমস্ত মাছে শতকরা দুই ভাগের কম চর্বি থাকে সেই সমস্ত মাছকে **স্বল্পমেদযুক্ত মাছ** (lean fish) বলা হয়। কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ এই পর্যায়ে পড়ে। যে সমস্ত মাছে শতকরা দু'ভাগের বেশী চর্বি আছে সে সমস্ত মাছকে **মেদযুক্ত মাছ** (fat fish) বলা হয়। রুই, কাতলা, চিতল প্রভৃতি মাছ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর মাছ যদিও হজম করা কিছু কঠিন, কিন্তু জীবনীশক্তিবর্ধক বলিয়া ইহা প্রায় অনেক ক্ষেত্রে মাংসের সমান। ইলিশ মাছে তেলের ভাগ বেশী থাকায় ইহা কিছু গুরুপাক। যে সব মাছে মেদ বা চর্বি কম, সেগুলি সহজে হজম হয় ও রোগীদিগের উপযুক্ত খাদ্য।

চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি যদিও দেখিতে অন্যজাতীয়, কিন্তু উহা অনেক সময়ে মাছের পর্যায়েই পড়ে। বাহিরে একটি কঠিন আবরণ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে 'শেল ফিশ' বলা হয়। খাদ্য হিসাবে এইগুলিও অত্যন্ত পুষ্টিকর, যদিও হজম করা কিছু কঠিন।

টাটকা মাছ চিনিবার উপায়ঃ—মাংসের ন্যায় মাছও টাটকা ব্যবহার করাই উচিত। বাসী বা পচা মাছ কখনও খাইবে না; কারণ উহাতে কলেরা, উদরাময় ও অন্যান্য পেটের পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে। টাটকা মাছ চিনিবারও কতকগুলি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। টাটকা মাছের চোখ দুটি উজ্জ্বল

ও পরিষ্কার থাকে ; কানকোগুলিও লালচে ও রক্তের স্বাভাবিক রংবিশিষ্ট হয়। উহার আঁইশগুলিও বেশ চকচকে ও চামড়ার সহিত শক্তভাবে সন্নিবদ্ধ থাকে। একটি টাটকা মাছ যদি সোজা করিয়া হাতের উপর রাখ, দেখিবে উহার লেজ কখনও ঝুলিয়া পড়িবে না। টাটকা মাছে টিপ দিলে উহার দেহে কখনও টোল খায় না কিন্তু কাটিবার সময় কাঁটা হইতে মাংসও সরিয়া যায় না। পচা মাছের চোখ ঘোলাটে, কানকোগুলি ফ্যাকাসে ও উহার আঁইশ টানিবামাত্র উঠিয়া আসে।

বাদাম :—বাদাম, চীনাবাদাম, আখরোট, ক্যস্থবাদাম প্রভৃতিকে **কঠিন ফল** বলা হইয়া থাকে। সাধারণ ফল অপেক্ষা এই কঠিন ফলগুলি অধিকতর পুষ্টিকর এবং ইহাতে দেহ পরিপোষণের ক্ষমতাও বেশী। খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বাদামের পুষ্টিবর্ধন ও দেহ-পরিপোষণ-ক্ষমতা প্রায় মাংসের সমান। বাদামে প্রোটিন ও স্নেহ-জাতীয় উপাদানের পরিমাণ প্রচুর।

ডাল :—আমাদের দেশে প্রায় গৃহস্থের বাড়ীতেই দৈনিক খাদ্যতালিকায় ডালের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রায় প্রতি গৃহেই ভাতের সহিত ডাল খাইবার নিয়ম। সাধারণত মুগ, মসুর, অড়হর, মাষকলাই, ছোলা প্রভৃতি ডালই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য **ডালের সঙ্গে ঘি মিশাইয়া খাওয়া উচিত** ; ইহাতে প্রোটিন হজমের সুবিধা হয়। ডালে উদ্ভিদজাত, অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের পরিমাণ বেশী। সুতরাং গরীবের ঘরে, যাহাদের প্রত্যহ মাছ-মাংস খাইবার মতন অর্থ সংস্থান নাই—তাহাদের নিকট ডাল মাংসের সমান। ডালে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ নামমাত্রই থাকে। ডালে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, পটাস, লৌহ, লবণ প্রভৃতিও থাকে। ডালের উপরের অংশে অর্থাৎ খোসায়, সঞ্চিত এ ও বি ভাইটামিনের পরিমাণও কম নয়। ডালকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—শিম (bean), মসুর (lentil) ও মটরশুঁটি (peas)। বিভিন্ন প্রকার ডালে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

আমরা প্রত্যহ যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, সেইগুলির মধ্যে অধিকাংশ খাদ্যই রন্ধন করিয়া লইতে হয়। রন্ধনের পূর্বে তরিতরকারি, মাছ-মাংস ইত্যাদি কাটিয়া কুটিয়া বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কাঁচা তরকারি, আ-ধোওয়া ডাল, ফল ইত্যাদিতে নানান রকম রোগ জীবাণু ও

দূষিত পদার্থ ইত্যাদি থাকিতে পারে, সেইজন্যই এইগুলি সর্বদাই পরিষ্কার করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্য সম্বন্ধে পড়িলে। প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহ-পদার্থ প্রভৃতি খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, ও কোন্ উপাদান কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণে আছে ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়াছ। খাদ্য তৈয়ারী করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কি কি গুণ আছে ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন তোমাদের কর্তব্য সংসারের বিভিন্ন ব্যক্তি, উহাদের বয়স ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাদ্যবস্তুগুলির যথাযথ নির্ধারণ ও রচনা করিয়া উহাকে সুষম ও পুষ্টিকর করিয়া তোলা। সংসারকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে তোমাদের উপরেই, খাদ্যরচনাকারী হইবে তোমরাই। সুতরাং কোন্ খাদ্যের কি কাজ, দেহের পুষ্টি ও পরিপোষণে উহার প্রয়োজনীয়তাই বা কতখানি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই তোমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। খাদ্য রচনা করিবার পূর্বে ও পরে সমালোচকের কঠিন দৃষ্টি লইয়া নিজের রচিত আহার্যের সূক্ষ্ম বিচার করিবে—ভাবিয়া দেখিবে তোমার রচিত আহার্য দিয়া সংসারের বিভিন্ন মানুষের রুচি, পরিশ্রম ও দেহের চাহিদা অনুয়ায়ী খাদ্যের প্রয়োজন তুমি কতখানি মিটাইতে পারিয়াছ।

খাদ্য-রচনা ও উহার যথাযথ ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তি-বিশেষের স্বাস্থ্য ও জীবন এবং তোমরা জান ব্যক্তির সমষ্টিতেই হয় সমাজ। সুতরাং জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া—সমাজকে সুদৃঢ় ও সু-সম্পূর্ণ করিয়া তোলার দায়িত্ব তোমাদের। **স্বাস্থ্য অর্জনের উপরেই নির্ভর করে জীবনের সার্থকতা ও সৌন্দর্য।** স্বাস্থ্য অর্জন করা অসম্ভব কিছু নহে। শ্রম ও বিশ্রাম প্রভৃতি জীবনের প্রাত্যহিক কাজগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পানীয় ও আহার্যের যথাযথ ব্যবস্থা করা ও উহা গ্রহণ করার নীতি মানিয়া চলিলে দেখিবে আপনা হইতেই দেহ সুন্দর, সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়া উঠিতেছে। স্বাস্থ্যের দীপ্তিই মানুষের আসল সৌন্দর্য। সুতরাং তোমার সংসারকে তুমি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোল। নূতন মানুষ ও নূতন সমাজ গড়িতে হইলে প্রয়োজন নূতন মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর। নূতন মন লইয়া তুমি অগ্রসর হও। বহুদিনের সঞ্চিত সংস্কারকে মন হইতে দূর করিয়া খাদ্য-ব্যবস্থায় ও রচনায় তুমি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন আনিবার

প্রয়াসী হও। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে—পশ্চিমের দেশগুলির মানুষ অধিকতর সুস্থ এবং উহাদের জীবনের মেয়াদও দীর্ঘতর। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়। ব্যক্তিপিছু বিভিন্ন আহার্য ও আহার্যের বিভিন্ন উপাদানের মান উন্নত করিবার জন্য উহারা অবিরাম পরিশ্রম করিতেছে। খাদ্য ব্যবস্থায় ও রচনায় উহারা লইয়া আসিয়াছে একটি **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী**। এইভাবে খাদ্য-পরিকল্পনায় ও রচনায় আমূল পরিবর্তন আনিয়া উহারা রোগকে প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ করিতেছে ও অস্বাস্থ্যকে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। তোমরাও তোমাদের খাদ্য-রচনার কৌশলকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কর—সুস্বাদুতা অপেক্ষাও উহার সুষমতা ও পুষ্টির প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ কর। খাদ্য-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিয়া তোমরা দেশের মানুষের জীবনকেও দীর্ঘতর ও সুন্দরতর করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াসী হও। সেই জীবনই সার্থক ও সফল জানিবে—যে জীবন সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকিয়া সমাজের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারে। সুতরাং তোমরা প্রতি ঘরে প্রতি মানুষের স্বাস্থ্যকে ফুটাইয়া তোল। দীর্ঘজীবন লাভের প্রয়োজনই বা কি, যদি না সুস্থ থাকিয়া সেই জীবনকে **সমাজের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিতে পারিলে।**

শ্রেণীর কাজ

১। পুষ্প ও পুষ্পের যথাযথ আধার নির্বাচন করিয়া তোমাদের শ্রেণী-কক্ষের বিভিন্ন স্থলে পুষ্প-বিন্যাস কর।

২। তোমাদের আসবাবপত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া উহাতে পলিশ লাগাও।

৩। তোমাদের সূতা ও রেশমের বিভিন্ন পরিচ্ছদাদি যথাযথ ধৌত করিয়া সুবিন্যস্ত কর।

৪। তোমাদের শ্রেণীকক্ষের বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী আলপনা অঙ্কিত করিয়া উহাকে সজ্জিত কর।

৫। লুচি, গাজরের হালুয়া, পটেটো চিপ্‌স্, ফিশ ফ্রাই, ডিমের দম ইত্যাদি প্রস্তুত কর।

৬। লঙ্কা, কুল ইত্যাদির চাটনি তৈয়ারী কর।

অনুশীলনী

গৃহ

১। গুহাবাসী মানুষ ধীরে ধীরে কেমন করিয়া গৃহবাসী মানুষে পরিণত হইল উহা বর্ণনা কর।

২। 'বিভিন্ন অংশের সমষ্টি লইয়াই একটি বাসগৃহ'—ইহার অর্থ কি? গৃহের বিভিন্ন অংশগুলির নাম কর।

৩। গৃহ-উদ্যান ও গৃহ-প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয়তা কি?

৪। গৃহ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি? গৃহ-পরিকল্পনা করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ও কেন, উহা উল্লেখ কর।

৫। 'বায়ু-সঞ্চালন' কাহাকে বলে? নৈসর্গিক ও কৃত্রিম উপায়ে বায়ু সঞ্চালন করাইবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা কর।

৬। আমাদের জীবনধারণে জলের প্রয়োজন কতখানি লিখ। জল দূষিত হইবার প্রধান কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

গৃহ-সজ্জা

১। ঘরের মেঝে সাজাইবার বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা কর। মেঝের আচ্ছাদন কত রকমের হইতে পারে সংক্ষেপে লিখ।

২। গৃহ-সজ্জায় কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা কতখানি বুঝাইয়া দাও।

৩। পর্দার প্রয়োজনীয়তা ও উহার বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। গৃহে পুষ্প-বিন্যাস করিবার জন্য পুষ্প ও আধার নির্বাচনের প্রধান নিয়মগুলি কি? পুষ্পবিন্যাস করিতে গেলে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে?

৫। বাংলাদেশের আলপনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। গৃহ-সজ্জায় আলপনার স্থান নির্ণয় কর।

গৃহ-পরিচালনা

১। গৃহ-পরিচালনার উদ্দেশ্য কি? গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। সুগৃহিণীর লক্ষণ কি? কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে সুগৃহিণী হওয়া যায়, সংক্ষেপে লিখ।

৩। দাসদাসী ও পরিজনবর্গের প্রতি গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 'মনের বিনিময়েই মন পাওয়া যায়', ইহার অর্থ কি ?

৪। অতিথি কত রকমের হইতে পারে ? অতিথির প্রতি গৃহকর্ত্রীর কি কি কর্তব্য উহা সংক্ষেপে লিখ। 'অতিথি-সেবা সমাজ-সেবারই নামান্তর', ইহার অর্থ কি ?

৫। গৃহে যথাযথ নিয়মে কাপড়-চোপড় কাচিতে হইলে তোমার কি কি সাজসরঞ্জামাদির প্রয়োজন হইবে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৬। 'কঠিন' ও 'নরম' জল কাহাকে বলে ? কাপড় কাচার জন্য কোন জল প্রশস্ত ও কেন লিখ।

৭। রেশমের কাপড় ধৌত করিবার প্রণালীটি বর্ণনা কর। রেশমের বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার নিয়ম কি ?

খাদ্য

১। আমাদের খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের প্রয়োজনীয়তা কতখানি ও কেন—এই সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। স্নেহ-প্রধান কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

২। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের বিভিন্ন কাজগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। আমাদের খাদ্যে 'প্রোটিন' প্রধান স্থান গ্রহণ করে কেন ? তোমাদের বয়সের একটি বালক বা বালিকার আহার্যে দৈনিক প্রোটিনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত ও কেন, উহা সংক্ষেপে লিখ।

৪। নিম্নলিখিত খাদ্যগুলির উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—

(১) মাংস, (২) মাছ, (৩) ডিম।

৫। দুধকে 'পূর্ণাঙ্গ খাদ্য' কেন বলা হয় ? একটি শিশুর পক্ষে দুধ কেন এত প্রয়োজনীয় ?

———

গ্রহ-বিজ্ঞানের কথা

অষ্টম শ্রেণী

গৃহ

গৃহ নির্মাণ

মানুষের জীবনে গৃহের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা তোমরা জান। গৃহ পরিকল্পনা করিতে গেলে যে গৃহের অবস্থান ও গৃহাভ্যন্তরের কাজগুলির বিষয় চিন্তা করিতে হয় ইহাও তোমরা পড়িয়াছ। এক্ষণে গৃহ-নির্মাণের বিষয়ই আলোচনা করা যাইতেছে। গৃহ নির্মাণ করিবার সময়েও গৃহের জমি কিরূপ, উহা উঁচু কি নীচু, উহাতে আরও মাটি ঢালিয়া উঁচু করা প্রয়োজন কিনা, জমির



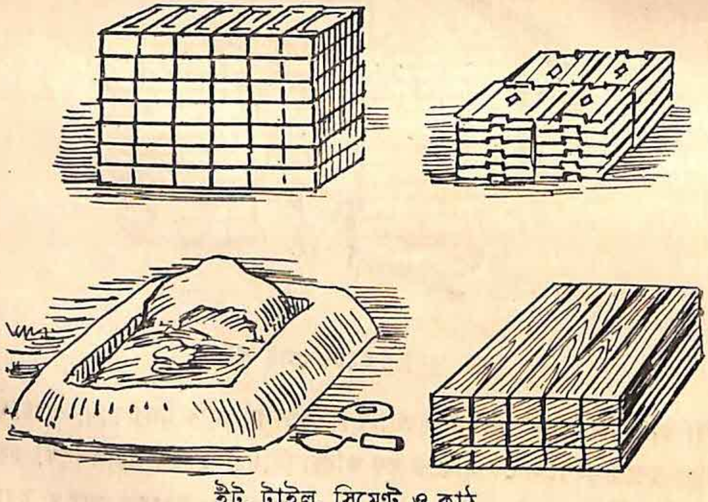
গৃহ-নির্মাণে ইটের চলই অধিক

মধ্যে ফাঁপা কি নিরেট গাঁথুনি ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জমির উপরে গৃহখানি কোন্‌দিকে মুখ করিয়া নির্মিত হইবে—দক্ষিণমুখী হইবে কিংবা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হইবে ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরেও গৃহের যথাযথ নির্মাণ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে, গৃহ-নির্মাণকারীর প্রথমেই সে জমির আয়তন, সে জমি কি প্রকারের, উহার অবস্থানই বা কিরূপ, উহাতে জল পাওয়ার ও উহা হইতে

জল নিকাশ করার ব্যবস্থা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

গৃহ-নির্মাণের বিভিন্ন উপাদান :

তৎপরই, কোন্ উপাদান দিয়া গৃহ নির্মিত হইবে—তাহার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। উপাদানের উপরেও গৃহের পরিকল্পনা অনেকাংশে নির্ভর করে। গৃহ-নির্মাণের পূর্বেই স্থির করিয়া লইবে, তুমি তোমার গৃহের জন্য কি প্রকার উপাদান ব্যবহার করিবে। **মাটি, টিন, বাঁশের বেড়া** ইত্যাদি দিয়া যে সাধারণতঃ গ্রামদেশে গৃহ নির্মাণ করা হয়, তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। শহরে অনেকে আজকাল কাঠ দিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকেন। কাঠের তৈয়ারী গৃহের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য, কি ধরণের কাঠ ও উহা কি ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার উপরেই নির্ভর করে। যে সকল দেশে বা অঞ্চলে কাঠ অধিক পাওয়া যায়, সে সকল দেশে বেশীর ভাগ



ইঁট, টাইল, সিমেন্ট ও কাঠ

গৃহই দেখিবে কাঠের তৈয়ারী। শহরে গৃহ-নির্মাণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই **ইঁট** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শহরাদিতে গৃহ-নির্মাণে ইঁটের চলই সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঁটের বাড়ীর গাঁথনির মধ্যে যেন একটি আলাদা গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য ফুটিয়া

উঠে ; ইঁটের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও অনেক বেশী। অনেক সময় ইঁটের গাঁথনিতে অযথা অত্যধিক কারুকার্য করা হইয়া থাকে। ইহাতে গৃহের আসল সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। ইঁটের গাঁথনি যতই সহজ, সাদাসিধা ও আড়ম্বরহীন হইবে, গৃহের সৌন্দর্য ততই পরিস্ফুট হইবে। টাইলের (tile) তৈয়ারী গৃহও তোমরা নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবে। টাইল ও ইঁট যদিও প্রায় একই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু টাইল ইঁটের মতন মজবুত নহে। এই জন্য অনেক সময় টাইল দিয়া গৃহ নির্মাণ করা স্থির করিলেও গৃহস্বামী উহাকে ইস্পাত বা অন্যান্য কোনও উপাদানের ফ্রেম বা কাঠামো দিয়া কিভাবে জোরাল ও মজবুত করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া থাকেন।

গৃহ-নির্মাণে **কংক্রীট**-এরও ব্যবহার দেখা যায়। কংক্রীটের বাড়ী ইঁটের বাড়ী অপেক্ষাও অধিকতর স্থায়ী ও মজবুত হয় এবং আগুনও সহজে ইহার কিছু করিতে পারে না। কংক্রীট অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত বলিয়া সাধারণতঃ উহা বাড়ীর এক তলার দেওয়াল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কংক্রীটের খরচ অত্যন্ত বেশী, এই কারণে এখনও উহার তত চল হয় নাই। গৃহ-নির্মাণে **ইস্পাতও** যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। শহরে অনেক বড় বড় বাড়ীতে তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে গৃহগুলি ইস্পাতের কাঠামোর উপর তৈয়ারী করা হইয়াছে। ঘরের জানালা প্রভৃতিতেও আজকাল অনেক সময় ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত গৃহ-নির্মাণে আজকাল **স্টুকো** (সিমেণ্ট ও প্লাস্টার-মিশ্রিত একরূপ পদার্থ), **এলয়** (alloy—ধাতু-সংমিশ্রিত পদার্থ) প্রভৃতিরও ব্যবহার দেখা যায়।



ইস্পাতের কাঠামো

ঘরের ছাদ প্রভৃতি কোন্ উপাদানে তৈয়ারী করিবে, গৃহ নির্মাণ করিতে গেলে উহাও চিন্তা করিতে হয়।

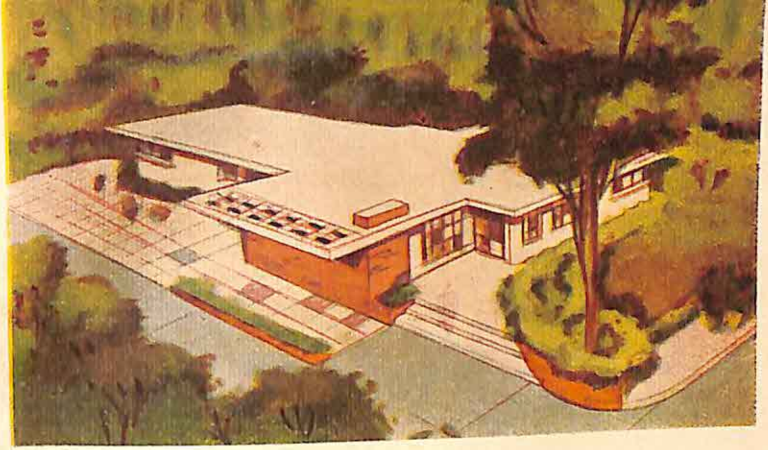
বিদেশে বহু জায়গায় তোমরা কাঠের টালির ছাদ দেখিতে পাইবে। এই-গুলি মেশিনেই তৈয়ারী হইয়া থাকে। অনেক জায়গায় আবার **অ্যাজ্‌বেস্টস্** (asbestos)-এর ছাদও দেখা যায়। রং-চং লাগাইয়া দিলে অ্যাজ্‌বেস্টস্ ও কাঠের টাইল দুইই প্রায় মোটামুটি একই রকম দেখিতে হয়। তোমরা পড়িয়াছ

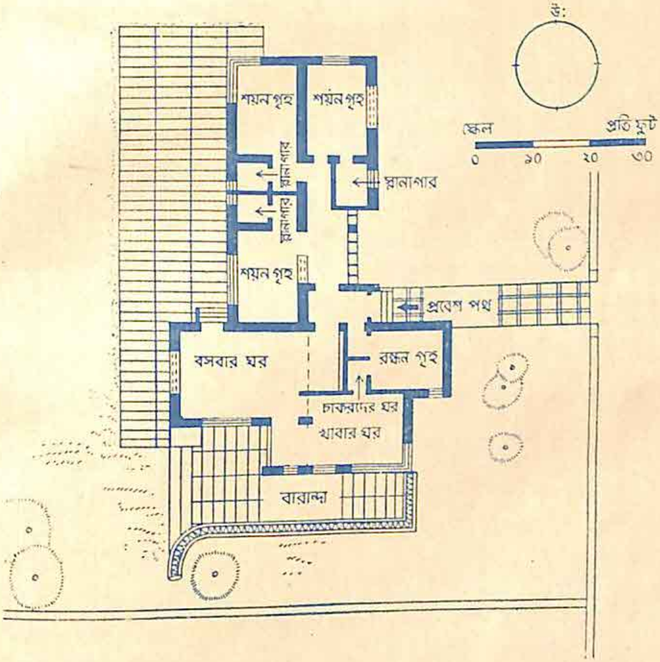
অ্যাস্‌ফেল্টের লেপ দিয়া মেঝে তৈয়ারী হয়—তেমনি ছাদেও অনেক সময়. বিশেষ করিয়া বাহিরের দেশগুলিতে, অ্যাস্‌ফেল্টের ব্যবহার দেখা যায়। শ্লেট (slate)-এর ছাদও তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে। এদেশেও কখনও কখনও কোনও গৃহে শ্লেটের ছাদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেট বেশ মজবুত ও উহা অনেক দিন থাকে।

গৃহের নক্‌শা :—

গৃহ-নির্মাণের উপাদান বা মাল-মসলা ঠিক হইবার পরেই আসে গৃহের নক্‌শা তৈয়ারীর কথা। বাড়ীর প্ল্যান বা নক্‌শা আর কিছুই নয়—রচনীয় গৃহ সম্বন্ধে গৃহস্থের চিন্তাধারাটিকে ছবির সাহায্যে রূপায়িত করা মাত্র। ছবির মধ্যে চিন্তাধারার একটি ছাপ পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং চিন্তায় কোথাও কিছু অস্বচ্ছ থাকিলে পুনরায় আলোচনার দ্বারা উহাকে স্বচ্ছরূপ দিবার সুযোগ মেলে। নক্‌শা তৈয়ারী করিবার **চারিটি ধাপ** আছে। প্রথমে পেন্সিলের একটি **স্কেচ্ ড্রইং** করিয়া লওয়া হয়—উহা হইতেই পরে নির্মাণকার্যে সহায়তা করিবে এরূপ যথাযথ মাপ-জোখ ইত্যাদি দিয়া আরও একখানি নক্‌শা (working drawing) প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণ লোক কিন্তু এই ড্রইং হইতে বাড়ীটি কিরূপ দেখিতে হইবে তাহা ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং প্রস্তুত বাড়ীখানির ছবি তুলিলে উহা দেখিতে যেরূপ হইবে হুবহু সেইরূপ আর একখানি ছবি তৈয়ারী হয়। ইহাই হইল আসল ছবি (perspective drawing), তার পরে উহার চারিধারে গাছপালা, বাড়ীর গায়ে আলো-ছায়ার খেলা ইত্যাদি দেখাইয়া বাড়ীখানি তৈয়ারী হইলে উহা দেখিতে কিরূপ মনোরম হইবে শিল্পী তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না পর পর এই ছবিগুলি তৈয়ারী হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জানিতে পারিতেছ না তোমার গৃহখানি কিরূপ হইবে। সুতরাং নক্‌শা ব্যতীত গৃহ-নির্মাণের কাজ সম্ভব নয়।

সম্পূর্ণ গৃহখানির নক্‌শা তৈয়ারী হইয়া গেলেই তুমি গৃহের প্রতিটি অংশের বিষয় চিন্তা করিবে। শয়নঘর, বৈঠকখানা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, স্নানের ঘর, খাওয়ার ঘর, সিঁড়ি, ছাদের প্রবেশপথ, সিঁড়ির রেলিং প্রভৃতি প্রতিটি অংশের





এই নক্‌শা অনুযায়ী নির্মাণ করিলে তোমার গৃহখানি হইবে উপরের ছবির ন্যায়। গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে তুলির রং-এ গৃহের ছবিখানি একবার দেখিয়া লইবে। গৃহ-নির্মাণে নক্‌শা ও ছবি দু'য়েরই প্রয়োজন।

সুবিধা-অসুবিধা, সৌন্দর্য-নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ ইত্যাদির সাহায্যে তোমার চিন্তাধারাকে যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ ও নির্ভুল করিয়া তুলিবে। সর্বদাই মনে রাখিবে, কোনও অংশ একবার নির্মাণ করা হইয়া গেলে পরে কোথাও কোনও পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। গৃহের বিভিন্ন কক্ষ সম্বন্ধে যখন বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে—তখন সেই সেই কক্ষের দেওয়াল, মেঝে, জল, আলো প্রভৃতি বিশেষ ব্যবস্থাগুলির



শিশু-ঘরে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন

বিষয় তুমি প্রথম হইতেই চিন্তা করিবে। যেমন, তোমার গৃহে যদি শিশুদের জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘর রচনা করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে সেই ঘরের মেঝে, দরজা, জানালা, পায়খানা ইত্যাদি যাহাতে শিশুদের বয়স অনুযায়ী উহাদের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিতে পার, তাহার জন্য প্রথম হইতেই পরিকল্পনা করিয়া লইবে। শিশুদের কল, জল, পায়খানা ইত্যাদির কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। সেইগুলিকে রূপ দিতে হইলে শিশু-ঘরখানিকে

সম্পূর্ণ গৃহখানির সঙ্গে একযোগেই চিন্তা করিতে হয়। কোন্ জিনিসের ড্রেন বা পাইপ কোন্‌দিকে গেলে তোমার গৃহের কোনওরূপ সৌন্দর্যহানি হইবে না ও অসুবিধা ঘটিবে না, সেই সম্বন্ধে তোমাকেই সজাগ হইতে হইবে। তোমার রান্নাঘর, কাপড়-কাচার ঘর বা স্নানের ঘরে তুমি যদি কোনও বিশেষ ব্যবস্থা বা কোনও বিশেষ যন্ত্রপাতি আনিতে চাও—যেগুলি স্থায়িভাবে বসানো আবশ্যক, তাহা হইলে গৃহ-নির্মাণের পূর্ব হইতেই উহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা প্রয়োজন। এই সকল বিষয় স্থির করিবার সময়ে সর্বদাই তোমার **গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও সুবিধা**—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

গৃহ-নির্মাণের আরও একটি বিশেষ দিক আছে। তোমার গৃহখানি বাহির হইতে দেখিতে কিরূপ হইবে—বাহির হইতে গৃহের যে অংশটি দেখা যাইবে



গৃহের সম্পূর্ণ রূপটি উপলব্ধি কর

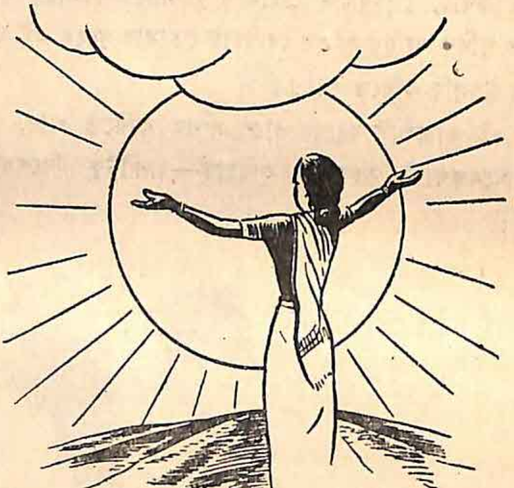
উহা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে কিনা—সেই কথাটি তোমার চিন্তা করিতে হইবে। গৃহের বাহিরের অংশটিকে অবহেলা করা কখনই সঙ্গত হইবে না,

উহাকেও যথেষ্ট প্রাধান্য দিবে। কারণ গৃহের পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই গৃহস্বামীর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। মনে রাখিবে, গৃহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে **সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সঙ্গতির** উপরেই গৃহের বাহিরের রূপ নির্ভর করে। সুতরাং, তুমি তোমার গৃহের প্রবেশপথ, সিঁড়ি, আঙিনা, উঠোন প্রভৃতি প্রত্যেকটির পৃথক ভাবে সৌন্দর্য নির্ণয় করিতে যত চিন্তা ও সময়ই দাও না কেন—তুমি যদি উহাদের প্রত্যেকটিকে প্রত্যেকটির সঙ্গে সুসংযোগ করিয়া গৃহের সম্পূর্ণ রূপটি উপলব্ধি করিতে না পার, কিম্বা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও অপারগ হও তাহা হইলে তোমার গৃহ-রচনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তোমাকে দেখিতে হইবে, তোমার গৃহের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে **সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি** রহিয়াছে কিনা—বিভিন্ন অংশগুলি মিলিয়া একই সুর ও ছন্দের সৃষ্টি করিতেছে কিনা। এক কথায়, তোমাকে তোমার গৃহখানি এমনভাবে নির্মাণ করাইতে হইবে যাহাতে পথিক বাহির হইতে দেখিয়াই তোমার গৃহের এই ছন্দ ও সুরটি অবলীলাক্রমে উপলব্ধি করিতে পারে।

তুমি যদি এই কাজগুলি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে পার, মনে করিবে গৃহ-নির্মাণে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছ—বাকীটুকু বিশেষজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দিবে।

বায়ু ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয় পরিমাণ

তোমরা সকলেই জানো, আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু বলিতে যথার্থ কি বুঝায় ও উহা কেনই বা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ কি? খাদ্য গ্রহণ না করিয়া মানুষ হয়ত সপ্তাহ-কয়েক বাঁচিতে পারে, জল ছাড়াও কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকা হয়ত অসম্ভব নয়—কিন্তু বায়ুর অভাবে মানুষ কয়েক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে কিনা সন্দেহ। প্রতি মিনিটে মানুষ প্রায় ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে ও ছাড়িয়া দেয়।



বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন

নিঃশ্বাস ছাড়িবার সময় মানুষ দেহ হইতে **কার্বন ডায়োক্সাইড** বাহির করিয়া দেয় ও প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় বায়ু হইতে **অক্সিজেন** টানিয়া লয়। পরিষ্কার মুক্ত বায়ু সেবন করিলে মানুষের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, মন সজীব হয় ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়া যায়। আবার অপর পক্ষে, কোনও স্থানের বায়ু যদি দূষিত হয় এবং অনবরত যদি ঐ দূষিত আবহাওয়ায় বসবাস করিতে হয়, তাহা হইলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত ঐ দূষিত হাওয়া হইতে রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করে এবং

মানুষকে নিমেষে অসুস্থ করিয়া তোলে। ঘনবসতি, মানুষের নিঃশ্বাস-নির্গত কার্বন ডায়োক্সাইড, কল-কারখানার ধোঁয়া, নানান রোগ ও আবর্জনা, হাঁচি-কাশি ইত্যাদি হাওয়াকে দূষিত করিয়া তোলে। এই সকল কারণেই কলিকাতার মত বড় বড় শহরে বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া কঠিন এবং ঐ সকল স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হেতু রোগের প্রকোপও পল্লী-অঞ্চল প্রভৃতি হইতে অনেক বেশী।

বায়ুর উপাদান :—

বায়ু কি—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে জাগিবে। বায়ু আর কিছুই নয়, কতকগুলি গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। ইহা তোমরা পূর্বেও মোটামুটি পড়িয়াছ। বায়ুর মধ্যে নীচের জিনিসগুলিই প্রধানতঃ দেখা যায় :—

অক্সিজেন বা অম্লজান গ্যাস—শতকরা ২১ ভাগ
নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান গ্যাস—শতকরা ৭৮ ভাগ
কার্বন ডায়োক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল—শতকরা ·০৪ ভাগ

উপরি-বর্ণিত এই গ্যাসগুলি ছাড়া বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প, ওজোন, হিলিয়াম, আর্গন, ক্রুপ্টন, জেনন, হাইড্রোজেন (উদজান গ্যাস), নীয়ন ও মার্শ প্রভৃতি গ্যাসও অল্পাধিক পরিমাণে থাকে।

অক্সিজেন—অক্সিজেনের কোনও রকম স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নাই। কিন্তু অক্সিজেন আমাদের জীবনধারণে অপরিহার্য। অক্সিজেনের দহনশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন কখনও অবিমিশ্র ভাবে থাকে না। অক্সিজেনের সহিত সর্বদাই নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। অক্সিজেনের সহিত যদিও নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে, কিন্তু আমাদের ফুসফুস অক্সিজেনই গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন যেমন প্রশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে যায়, তেমনি আবার অপরিবর্তিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অক্সিজেনই আমাদের রক্ত-কণিকা-গুলিকে জীবিত রাখে ও রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশে চলাচল করে। এই গ্যাসের সাহায্যেই শরীরের মধ্যে দহনক্রিয়া চলিতে থাকে এবং এই দহনক্রিয়ার ফলেই দেহের সমস্ত দূষিত পদার্থ কার্বন ডায়োক্সাইড রূপে বাহির হইয়া আসে। এই দহনকার্য হইতেই উদ্ভূত হয় দেহের তাপ। কাজেই বুঝিতে পারিলে, মৃতের শরীর শীতল হয় কেন। অক্সিজেনের অভাবে দেহের দহনক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মৃতদেহে তাপ নাই।

নাইট্রোজেন—নাইট্রোজেন গ্যাসও স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন। পূর্বেই বলিয়াছি অক্সিজেনের দহন-শক্তির প্রখরতা কমাইবার জন্য উহার সহিত সর্বদাই নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। কাজেই আমাদের জীবনের পক্ষে এই গ্যাসও পরোক্ষ ভাবে প্রয়োজন ইহা বলা যাইতে পারে।

কার্বন ডায়োক্সাইড—পূর্বেই বলিয়াছি, দেহের মধ্যে দহনক্রিয়ার ফলে দেহের দূষিত পদার্থ কার্বন ডায়োক্সাইড রূপে বাহির হইয়া আসে। কার্বন ডায়োক্সাইড প্রাণিদেহের পক্ষে যদিও মারাত্মক, কিন্তু গাছপালার জীবনের পক্ষে উহা অপরিহার্য। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ গাছপালার সবুজ পাতায় ও ত্বকে যে রঞ্জন পদার্থ আছে উহার নাম ক্লোরোফিল (chlorophyll)। ঐ ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু হইতে প্রাণিদেহের পরিত্যক্ত কার্বন ডায়োক্সাইড টানিয়া লয় ও নিজদেহের অক্সিজেন বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। এই কারণেই বায়ুতে কার্বন ডায়োক্সাইডের মাত্রা সহজে বাড়িতে পারে না।

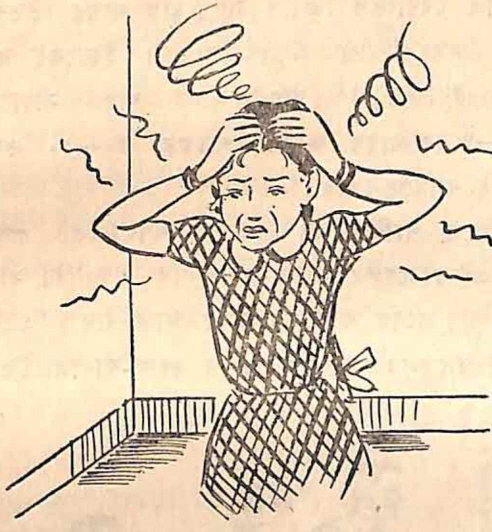
ব্যক্তিপিছু বিশুদ্ধ বায়ুর পরিমাণ :—

সুতরাং তোমরা দেখিলে অক্সিজেনই আমাদের প্রাণ। বায়ুতে অক্সিজেন না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। অক্সিজেনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধবায়ু-সেবন একান্ত প্রয়োজন। এই কারণেই চিকিৎসকেরা এক ঘরে একসঙ্গে বহু লোকের বাস অনুমোদন করেন না। একসঙ্গে বহু লোক এক ঘরে থাকিলে উহাদের দেহের উত্তাপে ঘরের ভিতরকার হাওয়া গরম হইয়া উঠে এবং ঘরের প্রয়োজনীয় আর্দ্রতাও কমিয়া যায়। তা ছাড়া, উহাদের নিঃশ্বাস, হাঁচি, কাশি ইত্যাদির দ্বারা ঘরে রোগ-জীবাণুও বাড়িতে থাকে এবং বায়ুর নিস্তব্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে একটি লোকের ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুর দরকার।

ঘরের স্নিগ্ধতা ও স্বাভাবিক উত্তাপ :—

এই সঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘরের মধ্যে কার্বন ডায়োক্সাইডের মাত্রা কখনও এত বাড়ে না বা অক্সিজেনের মাত্রাও এত কমে না যাহাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হইয়া মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে—যদিও সাধারণ ভাবে মানুষ এতদিন ইহাই বিশ্বাস করিয়া

আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে কার্বন ডায়োক্সাইডের মাত্রা যদি কখনও শতকরা ৩০ ভাগ হয়, তাহা হইলেই উহা আমাদের অপকার করিতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, কার্বন ডায়োক্সাইড ঘরের মধ্যে কখনও ০·৭%এর উপরে উঠিতে পারে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞানমতে কার্বন ডায়োক্সাইডের মাত্রা যদি শতকরা ৫ ভাগ হয় তাহা হইলেই বায়ুর ভৌতিক অবস্থার (physical



মাথা ধরে, হাই উঠে

properties) পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ুর হাল্‌কা ভাব ইত্যাদিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই কারণেই বদ্ধ, বায়ু-চলাচল-রহিত ঘরের মধ্যে আমাদের মাথা ধরে, হাই উঠে, আমরা ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করি, কখনও কখনও অজ্ঞান হইয়া যাই; কিন্তু ইহার কোনটাই ঘরের মধ্যে অত্যধিক কার্বন ডায়োক্সাইড অথবা অত্যল্প অক্সিজেনের দরুন নহে। ঘরের ভিতরকার বায়ুর অত্যধিক আর্দ্রতা, উষ্ণতা, কিংবা বিশুদ্ধ বায়ুচলাচলের একান্ত অভাব হেতুই ঘরের হাওয়া অত্যন্ত গুমোট ও দূষিত হয় এবং দেহযন্ত্রটির স্বাস্থ্যের পক্ষেও উহা অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া উঠে। এই জন্য আজকাল ঘরে মুখোমুখি বড় বড় দরজা-জানালা, ভেন্টিলেটার, চিমনি, মেঝেয় ও ছাদে নল

ইত্যাদি বসাইয়া নানারকম উপায়ে ঘরে যথাযথ বায়ু চলাচল ও সঞ্চালনের প্রতিই অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। অপর দিকে ঘরের হাওয়াকে বিশুদ্ধ করিবার জন্ত নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারও দেখা যায়। ঘরে বায়ু-সঞ্চালন করাইবার নৈসর্গিক ও কৃত্রিম উপায়গুলির কথা তোমরা পূর্বেই বিশদভাবে পড়িয়াছ। বায়ু সঞ্চালন করাইবার মূল উদ্দেশ্যই বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখা ও দেহ-তাপের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ঘরের ভিতরকার বায়ুকে স্নিগ্ধ ও শীতল রাখা। আজকাল বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সাহায্যেও ঘরের ভিতরকার বায়ুর আর্দ্রতা, শৈত্য, উষ্ণতা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহাকেই বলা হয় **বায়ু-নিয়মন** (air-conditioning)। বায়ু-নিয়মনের দ্বারা সাধারণত ইহাই বুঝাইয়া থাকে—ঘরের বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৪০—৫০ ভাগ ও উষ্ণতা ৬৮°—৭৯° ফা, হি. রাখিতে হইবে।

কাজেই বুঝিতে পারিলে বদ্ধ ঘরের অপকারিতা প্রধানত বায়ুর অবিশুদ্ধতায়। এই কারণেই খোলা দরজা-জানালা ইত্যাদির সাহায্যে ঘরে মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করানোর উপর স্বাস্থ্যবিদেরা এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সুতরাং ঘরের দরজা-জানালা ইত্যাদি খোলা



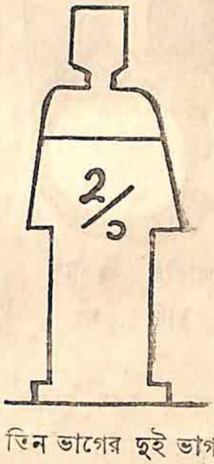
মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে

রাখিয়াই সর্বদা শয়ন করিবে। বিশুদ্ধ হাওয়া আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে ও কর্মক্ষমতা বাড়াইতে বিশেষ সহায়তা করে।

মনে রাখিও **বায়ুই আমাদের প্রাণ**। যে ভাবে যেমন করিয়া পার, পরিপূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা সর্বদাই খোলা মাঠ, নদীর তীর, ফুলের বাগান প্রভৃতি স্থান হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে।

জল পরিশুদ্ধি ও সংরক্ষণ

বায়ুর ন্যায় জলেরও আমাদের দেহে একান্ত প্রয়োজন। দেহের প্রতি কোষ ও অনুকোষে জলের ভাগ রহিয়াছে। দেহতন্তুগুলিতেও জলের একটি প্রধান অংশ দেখা যায় এবং আমাদের দৈহিক ওজনের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ ওজন দেহাস্থিত জলের জন্যই। জল ব্যতীত মানুষের জীবনযাত্রা চলিতে পারে না। স্নান ইত্যাদির দ্বারা যেমন দেহের বহির্ভাগ ধৌত হয়, তেমনি দেহের অন্তস্থিত অন্ত্রগুলিকে জলই পরিষ্কার করে। তোমরা পড়িয়াছ, মলমূত্র, ঘর্ম, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদির সাহায্যে দেহ হইতে সঞ্চিত জলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জল প্রতিনিয়তই নিঃসৃত হয় এবং ইহার পরিপূরণ আবশ্যক। এই পরিপূরণের জন্য আমাদের প্রত্যহই প্রায় ৪ পাইণ্ট জলের প্রয়োজন, অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেকদিন অন্তত ৪ পাইণ্ট জল পান করা আবশ্যক।



তিন ভাগের দুই ভাগ ওজন জলের জন্যই

জল কোথা হইতে আসে, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কি কি উপায়ে জল পাওয়া যায় ও মানুষের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অসাবধানতা ইত্যাদির দরুন জল কি ভাবে দূষিত হইয়া উঠে ও পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তোমাদের পূর্বেই বলা হইয়াছে। পান করিতে হইলে জল সর্বদাই পরিশুদ্ধ, অর্থাৎ জীবাণুমুক্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। নানা উপায়ে জল জীবাণুমুক্ত করা যায়। শহরের বা গ্রামের যেখানকারই বাসিন্দা হও না কেন, জল বিশোধন করিবার এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির বিষয় তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জল বিশোধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া :—

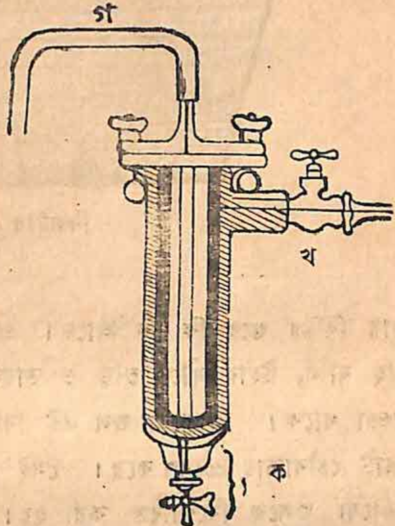
জল ছাঁকা (Filtration)—মানুষ অনেক সময়ে একখণ্ড কাপড় দিয়া পানীয় জলটুকু ছাঁকিয়া লয়। ইহাতে জলের উপরকার দৃশ্য ময়লাগুলি দূর হয় বটে, কিন্তু জল জীবাণুবর্জিত হয় না। এই কারণেই গ্রামদেশে বহুব্যবহৃত কলস-ফিলটারের জলকেও জীবাণুমুক্ত বলা যায় না এবং পানীয় হিসাবেও উহা নির্ভরযোগ্য নয়।



পানীয় জলটুকু ছাঁকিয়া লয়

কলস-ফিলটার—কলস-ফিলটারে একখানি কাঠের ফ্রেমে পর পর সচ্ছিদ্র তিনটি কলস বসানো থাকে। সকলের নীচে ঐ ফ্রেমের মধ্যেই একটি অচ্ছিদ্র কলসও বসানো হয়। এই কলসটিতে ছাঁকা জল সঞ্চিত হয়। সকলের উপরের কলসটিতে অপরিষ্কার জল (আ-ছাঁকা—unfiltered) থাকে ও ইহার মুখটি একটি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ময়লা কোনও জিনিস উড়িয়া আসিয়া ভিতরে না পড়িতে পারে। দ্বিতীয় কলসটির তলায় বেশ খানিক অংশ কাঠকয়লায় ভরা থাকে। উপরের কলস হইতে জল দ্বিতীয় কলসে আসিয়া ঐ কাঠকয়লার মধ্য দিয়া চোয়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তৃতীয় কলসটিতে গিয়া পড়ে। তৃতীয় কলসটির তলদেশে একটি কাঁকরের স্তর থাকে, তাহার উপরে আবার একটি বালির স্তর থাকে। এই দুইটি স্তর ভেদ করিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া জল চতুর্থ কলসটিতে গিয়া জড় হয়। জলের ময়লা ইত্যাদি প্রথমত কিছু কয়লার স্তরে, দ্বিতীয়ত বালির স্তরে, এবং তৃতীয়ত ঐ কাঁকরের স্তরে ঠেকিয়া যায়। কাজেই দেখিলে, কলস-ফিলটারের প্রক্রিয়া একরকম ছাঁকিয়া লওয়ারই নামান্তর। ইহাতে জলের দৃশ্য দোষগুলি দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু জলের অদৃশ্য দোষগুলি অর্থাৎ জীবাণুগুলি যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যায়। এই কারণেই এই প্রক্রিয়া আজকাল **অচল**।

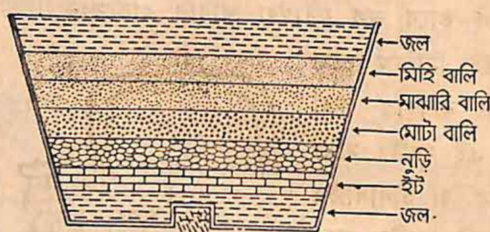
(১) **বার্কফেল্ড ফিল্‌টার** ঃ—জল ফুটাইয়া লইলে উহার অনেক জীবাণু মরিয়া যায় ও জল অনেক পরিমাণে বিশোধিত হয়। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে আজকাল ফুটন্ত জল 'বার্কফেল্ড ফিলটার বট্‌ল'-এর সাহায্যে ছাঁকিয়া লইতে দেখা যায়। এই ভাবে জল ফুটাইয়া আবার বার্কফেল্ড ফিলটারের মধ্যে ছাঁকিয়া লইলে উহা নিশ্চিন্ত চিত্তে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটির মধ্যে একটি পোরসিলেন বা চীনামাটির নল থাকে। এই চীনামাটির গায়ে অসংখ্য ছিদ্র সন্নিবেশিত থাকায় উহার মধ্য দিয়া জল অনায়াসে চলিয়া যায়, কিন্তু দূষিত পদার্থগুলি ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না বলিয়া আটকাইয়া থাকে। নলের ভিতর দিয়া পরিষ্কার জল নীচে গিয়া সঞ্চিত হয়।



বার্কফেল্ড ফিলটার বট্‌ল
ক—জল বাহির করিয়া দিবার কল
খ—জল ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ
গ—বিশুদ্ধ জল বাহিরে আনিবার নল

তোমরা জান কলিকাতার মত বড় বড় শহরে সাধারণত ফিলটার-করা জলই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কলিকাতায় জল কি ভাবে ফিলটার করা হয় তাহারই আলোচনা এখন করা যাইতেছে। তোমরা 'পলতা'র নাম শুনিয়া থাকিবে। এই পলতা স্টেশনেই জল ফিলটার করিবার সমস্ত ব্যবস্থা সংরক্ষিত আছে। যদি কখনও পলতায় যাও, দেখিবে, প্রথমেই নদী হইতে জলটি পাম্প করিয়া উঠানো হইতেছে। তারপরে এই জলটির মধ্যে **ফটকিরি** দিয়া উহাকে দুই-তিন দিন পর্যন্ত **থিতাইয়া** রাখা হয়, ইহাকে বলে **থিতানো** বা Sedimentation। ফটকিরি দেওয়ার দরুন জলের সমস্ত ময়লা নীচে

চলিয়া যায়। এই ভাবে থিতানো জলটি খুব সরু ধারায় ফিলটার বেডের উপর ফেলা হয়। নীচের ছবিখানিতে দেখ, ফিলটার বেড্ কি ভাবে তৈয়ারী হয় ও



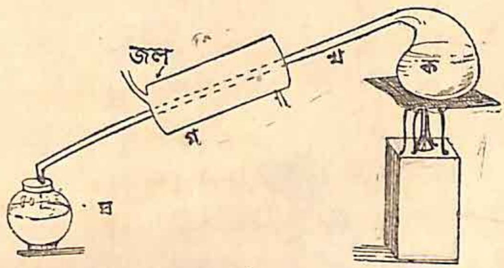
ফিলটার বেড্

উহার বিভিন্ন স্তরে কি কি আছে। প্রথম স্তরে মোটা বালি, তারপরে মিহি বালি, উহার নীচে নুড়ি ও তাহারও নীচে ফাঁক ফাঁক করিয়া ইট দেওয়া থাকে। থিতানো জল এই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া নীচে এক বিরাট চৌবাচ্চায় প্রবেশ করে। সেই চৌবাচ্চায় **রাসায়নিক প্রক্রিয়ার** সাহায্যে জলকে বিশোধিত করা হয়। সেইখান হইতেই বিভিন্ন নলের সাহায্যে জল শহরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা হয়।

এই সঙ্গে এই কথাটিও জানিয়া রাখিবে—জল যখন মিহিবালির উপর দিয়া যায়, তখন আপনা হইতেই সেখানে একটি মিহি পর্দার সৃষ্টি হয়। এই পর্দাখানিতেই জলের যত দূষিত পদার্থ ও জীবাণু আটকাইয়া থাকে। জলের তলায় উপযুক্ত খাদ্য ও অক্সিজেনের অভাবে জীবাণুগুলি সেইখানেই মরিয়া যায়। এই পাতলা পর্দাটি তৈয়ারী হইতে প্রায় ৪।৫ দিন সময় লাগে, কিন্তু একবার তৈয়ারী হইয়া গেলে উহা প্রায় সাত-আট সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে। এই পাতলা পর্দাটিকে **ফিলটার বেডের প্রাণ** বলিতে পার। জল থিতানো বলিয়া প্রথম বারেই অনেকটা পরিষ্কৃত হয়, পরে আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে, অর্থাৎ 'ক্লোরিন' ইত্যাদি দিয়া জলকে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

২) **চোলাই-করণ** (Distillation)—কোনও একটি পাত্রের জলকে ফুটাইয়া উহাকে বাষ্পাকারে পরিবর্তিত করিয়া পুনরায় উহাকে জলে রূপান্তরিত

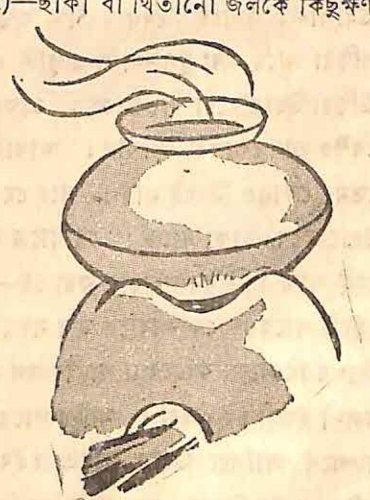
করিলে উহা জীবাণুশূন্য হয় এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় **চোলাই-করণ**। নীচের ছবিটিতে কি ভাবে জলকে বাষ্পে পরিবর্তিত করিয়া আবার জলে রূপান্তরিত করা হয় তাহাই দেখানো হইতেছে।



চোলাই-করণ

(ক) পাত্রের মধ্যে জল ফুটিতেছে
(খ) ফুটন্ত জলের বাষ্প নলের মধ্য দিয়া যাইতেছে
(গ) বাক্সটির মধ্যে ঠাণ্ডা জল ভরা থাকে
(ঘ) নলস্থিত বাষ্প শৈত্যের সংস্পর্শে আসিয়া জমিয়া যাইতেছে ও জল হইয়া পাত্রে পড়িতেছে।

(৩) **জীবাণুশূন্যকরণ** (Sterilization)—ছাঁকা বা থিতানো জলকে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া জীবাণুমুক্ত করিবার নামই **জীবাণুশূন্যকরণ** বা Sterilization. ফুটাইলেই জলের প্রায় সকল জীবাণু মরিয়া যায়।



(৪) **রাসায়নিক প্রক্রিয়া**—তোমরা জান পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট, আয়োডিন বা চূণ প্রভৃতি মিশাইলেও, জল-জীবাণুমুক্ত হয়, কিন্তু সে জলের স্বাদ ঐ সকল দ্রব্যগুণে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া যায় এবং পান করাও দুঃসাধ্য হয়।

কাজেই তোমরা দেখিলে—জল বিশোধনের যতগুলি উপায় আছে, জল ফুটাইলে জীবাণু মরিয়া যায়

তন্মধ্যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে জল ছাঁকিয়া ফুটাইয়া লওয়াই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক। ফুটানোর পর জলে সামান্য পরিমাণ কর্পূর ফেলিয়া দিও, দেখিবে পরদিন সে জল পান করিতে বড়ই সুস্বাদু ও সুগন্ধ হইয়াছে।

গৃহে জল-সঞ্চয়—

গৃহে রান্না, খাওয়া, তরিতরকারি ইত্যাদি ধোওয়া, ঘর মোছা—এইরূপ নানান কাজে যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। সাধারণত চৌবাচ্চা, লোহার ড্রাম, মাটির জালা, বড় বড় পিতলের কলসী ইত্যাদিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। এই সকল জলও যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গৃহকর্ত্রী বা গৃহস্থেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রায়ই দেখ যায় জলের পাত্রটি আ-ঢাকা অবস্থায় খোলা পড়িয়া আছে এবং ধূলা-বালি প্রভৃতি ঘরের নানান আবর্জনা ও কীট-পতঙ্গাদি উড়িয়া উহার মধ্যে পড়িতেছে। ঢাকা দিবার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকই উদাসীন। আবার অনেক গৃহে দেখা যায়, ঢাকা দিবার তেমন কোনও নিয়মই নাই। গৃহে যে জল সঞ্চয় করিবে, সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে উহাতে যেন ঢাকা থাকে। যে পাত্রে জল সঞ্চয় করিতেছ, দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে সেই পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়—অন্যথায় পাত্রের ময়লায় জলও অপরিষ্কৃত হইতে পারে। যে আধারে জল সঞ্চয় করিবে সেই আধারের নির্বাচন সম্বন্ধেও বিশেষ বিবেচনা করিবে। পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য সাধারণত মাটির কুঁজা বা কলসী ইত্যাদিই শ্রেয়ঃ। মাটির পাত্রে জল শীতল থাকে এবং ধাতু ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া উহার দূষিত হইবারও কোনও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মাটির পাত্রও কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করা আবশ্যক। যে পাত্রেই জল সঞ্চয় কর না কেন, বাসী জল ফেলিয়া প্রত্যহ পাত্রটি পরিষ্কার করিয়া উহাতে নূতন

জল ধরিবে। পানীয় জলের পাত্রের মুখ সর্বদাই ঢাকিয়া রাখিবে এবং উহাতে কখনই আ-ধোয়া হাত বা অপরিষ্কার বাসন-কোসনাদি ডুবাইবে না। এই



প্রত্যহ পাত্রটি পরিষ্কার করিবে

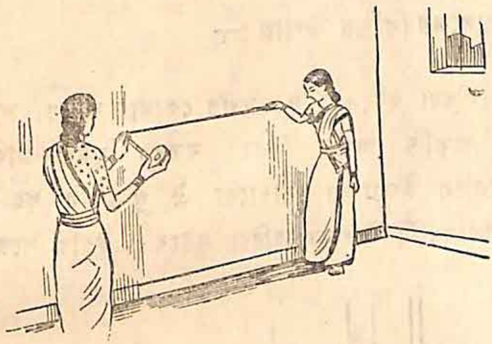
নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে দেখিবে তোমার গৃহ-সঞ্চিত জলের দূষিত হইবার আশঙ্কাও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

গৃহসজ্জা

মানুষের জীবনে গৃহ-প্রসাধনের প্রয়োজন কতখানি তোমরা পড়িয়াছ। সুরুচিপূর্ণ সুন্দর গৃহশ্রী মানুষের জীবনের রূপ আমূল বদলাইয়া দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়াছ নিশ্চয়ই; অপরিষ্কার অগোছালো ঘরের মধ্যে ইতস্তত-ছড়ানো আসবাবপত্রের প্রতি চাহিয়া নিমেষেই যেন মন বিরক্ত হইয়া উঠে। সুসজ্জিত গৃহ কেবল যে শারীরিক আরামের কারণ তাহা নহে, উহা মানুষের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গৃহসজ্জায় পর্দা-সন্নিবেশ, আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থান, কার্পেট, পুষ্পবিন্যাস প্রভৃতি প্রতিটি কাজে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির প্রয়োজন। **এই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি মানুষের স্বভাবকে সুশৃঙ্খল ও সুষম করিয়া তোলে।** এই কারণেই গৃহসজ্জায় এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কি ভাবে গৃহ রচনা করিবে, জানালার আকার ও পর্দার মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করিবে কি উপায়ে, কি উপায়েই বা ঘরের মেঝে, পর্দা ও পুষ্পবিন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়া একই সুর ফুটাইয়া তুলিবে—ইত্যাদি বিষয়গুলি তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। এক্ষণে ঘরের দেওয়াল ও দেওয়ালের সজ্জা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ঘরের দেওয়াল—দেওয়ালই ঘরের বিভিন্ন অংশগুলিকে ধরিয়া আছে। দেওয়াল ঘরের একটি প্রধান অংশ। দেওয়ালকে বাদ দিয়া ঘরের পরিকল্পনা করা যায় না। দেওয়ালকে যদি ঘরের প্রচ্ছদপট হিসাবে গ্রহণ করা হয়,—অর্থাৎ দেওয়ালকে পিছনে রাখিয়া দেওয়ালের বুকে যদি ঘরের আসবাবপত্র, পর্দা ইত্যাদির বিচিত্র ছবি ও খেলা কল্পনা করা যায় তবে দেওয়ালের প্রাধান্য অনেক কমিয়া যায় বটে, আবার একদিকে দেওয়ালই সর্বপ্রধান হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ দেওয়ালের যেমন রূপ ও রঙ্ হইবে, সেই অনুযায়ী ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলিরও রূপের ঔজ্জ্বল্য কমিবে বাড়িবে। সুতরাং দেখিতেছ দেওয়ালের রূপ ও রঙের পরিবর্তনের উপরেই ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলির ঔজ্জ্বল্য বা বিকাশ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং দেওয়াল প্রচ্ছদপট হইলেও উহাকে পিছনে ফেলিয়া রাখা যায় না বা উহার প্রতি ঔদাসীন্য

দেখানো চলে না। বরঞ্চ দেওয়ালকে সজ্জিত করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা আবশ্যক। ঘরের দেওয়ালের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। দেওয়াল প্রসাধনে ঐ বৈশিষ্ট্য তুমি কতখানি ফুটাইবে উহা নির্ভর করে ঘরের



আয়তনের উপর নির্ভর করে

আকার, আয়তন, উহার ব্যবহার ও সেই ঘরখানির রূপ কেমন হইবে সেই ছবিখানির উপর।

পূর্বেই পড়িয়াছ ইট, পাথর, প্লাস্টার, অ্যাসবেস্টস, লিনোলিয়াম, টালি, কাঠ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান দিয়াই দেওয়াল তৈয়ারী হইতে পারে। কোনও ঘরের দেওয়াল সাজাইতে হইলে প্রথমেই জানিয়া লইবে—ঘরগুলির আয়তন ছোট কি বড়, ঘরগুলিতে যথেষ্ট আলো আছে, কি উহা অন্ধকার। উহার মধ্যে ভাঙা-চোরা কিছু আছে কিনা যাহা তোমার সজ্জা দিয়াই ঢাকিয়া দিতে হইবে, ঘরখানির প্রয়োজনই বা কতটুকু, উহা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহৃত হইবে কিংবা অতিথি-অভ্যাগত আসিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যাইবার পরই উহার প্রয়োজন ফুরাইবে—ইত্যাদি বিষয়গুলি জানিয়া লইবে। এই তথ্যগুলির উপরই তোমার দেওয়ালের রঙ্, নক্‌শা ইত্যাদির নির্বাচন নির্ভর করিবে। যেমন, খাবার ঘর, প্রবেশপথ ইত্যাদি যে সকল ঘরে বা স্থানে তুমি অল্পক্ষণের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই সকল দেওয়ালের রঙে বা সজ্জায় যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য থাকিতে পারে। কিন্তু বৈঠকখানা, শয়নঘর প্রভৃতি যে সকল ঘরে তুমি অধিকক্ষণ থাকিবে, বা তোমার মন কিছুটা বিশ্রাম খুঁজিবে সেই সকল দেওয়ালের সজ্জায় তুমি ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তে শান্তি ও স্নিগ্ধতা ফুটাইবার চেষ্টা করিবে—যাহাতে

দেওয়ালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মানুষের কর্মক্লান্ত মন সহজেই শান্ত হইয়া আসে। কাজেই দেখিতেছ, যে-কক্ষের যে-প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য উহার দ্বারাই সেই কক্ষের দেওয়ালের সজ্জা নির্ণীত হয়।

দেওয়াল প্রসাধনের বিভিন্ন উপায় :—

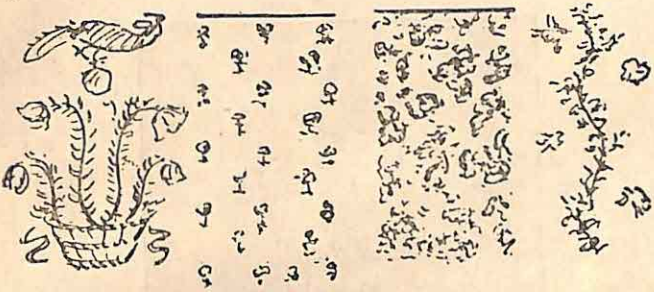
প্রথমেই দেখিয়া লইবে, দেওয়ালের কোথাও ফাটল, ভাঙা, ফাঁক বা তৈলাক্ত দাগ প্রভৃতি আছে কিনা। যতদূর সম্ভব—স্যাণ্ড-পেপার, চূর্ণ, প্লাস্টার, সাবানজল ইত্যাদির সাহায্যে ঐ খুঁতগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে ও দেওয়ালখানি পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে। ইহার পরেই দেওয়ালের



খুঁতগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে

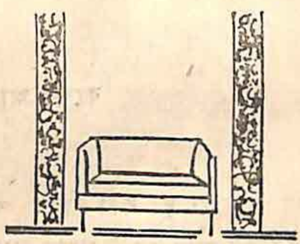
সজ্জায় মনোনিবেশ করিবে। দেওয়াল বহু উপায়েই সজ্জিত করা যায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে এবং আমাদের দেশেও কোনও কোনও শীতপ্রধান অঞ্চলে দেখিবে দেওয়ালের উপর নানান নক্শা-করা দেওয়াল-কাগজ

(wall-paper) আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই দেওয়াল-কাগজ বিভিন্ন রং ও নক্সার পাওয়া যায়—কোনওটিতে কেবল বিন্দু বিন্দু, কোনওটিতে ফুল, লতাপাতা আঁকা,



দেওয়াল কাগজের বিভিন্ন নক্শা

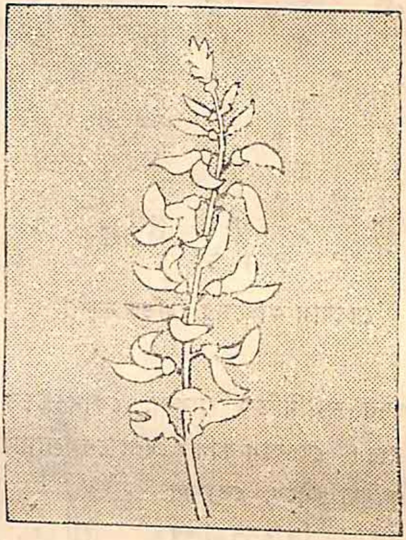
কোনওটিতে বা কেবল জ্যামিতিক নক্শা, কোনওটিতে আবার বিভিন্ন দৃশ্য ইত্যাদি দেখা যায়। দেওয়াল-কাগজ দেওয়ালে লাগাইবার পূর্বে আগে দেওয়ালে ফেলিয়া দেখিয়া লইবে, তোমার রুচি ও ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রাদির সহিত মিলিয়াছে কিনা। কেবল ধারগুলি সাজাইবার জন্য কিংবা কোনও জিনিসের বর্ডার দিবার জন্য দেওয়াল-কাগজের ছোট ছোট ফালিও কিনিতে পাওয়া যায়। উহা দ্বারা বর্ডার দিয়া মাঝখানে চেয়ার ইত্যাদি সাজাইতে পার।



দেওয়াল-কাগজের বর্ডার মাঝখানে সোফা

দেওয়ালে তেলের রঙের ছবি আঁকিয়াও অনেক গৃহস্থ তাঁহাদের ঘরগুলিকে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল দেওয়ালে আঁকা ছবির আমাদের দেশেই চল অধিক। ঘরের আয়তন, প্রয়োজন ও অন্যান্য সজ্জা প্রভৃতির সহিত সহজ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রাখিয়া দেওয়ালে ছবি আঁকিতে পারিলে কক্ষখানির আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম হইয়া উঠে নিঃসন্দেহ। দেওয়াল-সজ্জায় দেওয়ালের গায়ে একটি সহজ সরল রেখারও মূল্য অনেকখানি। ঠিকমত আঁকিতে পারিলে বা রং

ইত্যাদি ফুটাইতে পারিলে একমাত্র কয়েকটি রেখার সাহায্যেই ঘরের আয়তনকে ছোট বড় করিয়া দেখান যায় এবং খালি দেওয়ালের কাঠিন্যকেও



কক্ষের আবহাওয়া মনোরম হইয়া উঠে

কিছু পরিমাণে দূর করা যায়। খালি হাতে দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কন যেমন দেওয়াল-সজ্জায় একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে, তেমনি **চিত্রফলকের** (stencil) সাহায্যে দেওয়ালে চিত্রসন্নিবেশ করাকেও দেওয়াল-সজ্জা হইতে বাদ দেওয়া চলে না। এবং চিত্রাঙ্কনে হাত তত নিপুণ না হইলেও এই চিত্রফলকের সাহায্যেও অনেকে দেওয়ালে অপেক্ষাকৃত সহজে নক্শা ইত্যাদি আঁকিতে পারেন। দেওয়ালের গায়ে এই চিত্রাঙ্কনের রীতি আমাদের দেশে বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তখনকার দিনেও ধনী গৃহস্বামী দেওয়ালের গায়ে নানারকম ছবি আঁকাইয়া গৃহকে মনোরম করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন।

দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কনেও সামঞ্জস্য ও সহজ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদন নয়, বিভিন্ন ঘরের প্রয়োজনানুযায়ী **আবহাওয়ার সৃষ্টি করাই চিত্রগুলির**

প্রধানতম লক্ষ্য। কাজেই দেওয়ালের গায়ে তুমি খালি হাতে বা



আবহাওয়ার সৃষ্টি করাই
চিত্রের প্রধানতম লক্ষ্য



মনের উপর প্রভাব বিস্তারেই
চিত্রের সাফল্য নির্ণীত হয়

চিত্র-ফলকের সাহায্যে যে ভাবেই ছবি আঁক না কেন, মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তারেই তোমার চিত্রের সাফল্য নির্ণীত হইবে।

দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি **আলপনার** উল্লেখ উহাতে না থাকে। আলপনার সাহায্যে দেওয়াল সাজাইবার রীতিও বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যদি কখনও সাঁওতাল পরগনায় যাও, দেখিবে সেইখানকার অধিবাসীরা আজও আলপনা আঁকিয়া দেওয়াল সাজাইবার প্রয়াস পায়। এবং মাটির বুকে মাটির রঙে দেখিবে চালের গুঁড়োর সাদা আলপনা কতই মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনেক গৃহস্বামী দেওয়ালে বিভিন্ন বিষয়ের **ছবি ঝুলাইয়াও** দেওয়ালকে সজ্জিত করিয়া তোলেন। প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী দেওয়ালের গায়ে যথাযথ চিত্র সন্নিবেশ করাও গৃহসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ। চিত্র সন্নিবেশের বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

উপরে বর্ণিত দেওয়াল-সজ্জার যদি কোনও উপকরণই নিতান্ত সংগ্রহ করা না যায়, তাহা হইলে **লতাপাতা** ইত্যাদিও ঘরের দেওয়াল সাজাইবার **উপকরণ**



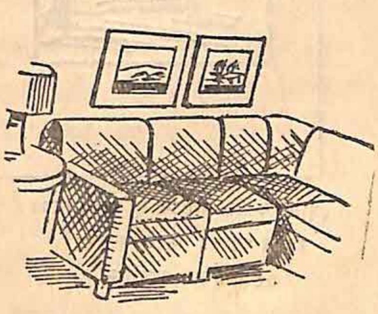
স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়

হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বহু লতা আছে, তোমরা দেখিয়াছ নিশ্চয়ই, যাহা কেবল জলের মধ্যেই বাড়িয়া থাকে। যে সকল ঘরের মধ্যে দেওয়ালে কার্ণিস আছে বা তাকের মতন ভেন্টিলেটারের মধ্যে খাঁজ কাটা আছে—অনেক গৃহস্বামীকে উহার উপর একটি পাত্রে সামান্য জলসহ ঐ লতা ঝুলাইয়া দিতে দেখা যায়। ঈষৎ ফিকে নীল রং অথবা সাদা দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়া পড়া সবুজ লতাটি ঘরের মধ্যে অনেকখানি স্নিগ্ধতা আনিয়া দেয়।

দেওয়ালের গায়ে চিত্র সন্নিবেশ ঃ—

অনেক স্থানেই দেখা যায় গৃহস্বামী বহুবিধ চিত্রে দেওয়াল সজ্জিত করিতেছেন। চিত্র সন্নিবেশেও রুচি ও মাত্রাজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। চিত্র নির্বাচনেও দেওয়ালের আকার ও আয়তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ছোট, বড়, লম্বা, চৌকো, নানান আকারের ও বিচিত্র রঙের বিভিন্ন ছবি দিয়া যদি দেওয়াল সজ্জিত কর, তাহা হইলে উহা দেখিতে রুচির দিক হইতে অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে। দেওয়ালের আকার ও রঙের সহিত চিত্রের আকার ও রঙের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। চিত্র সন্নিবেশ করিবার সময় চিত্রের সংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে চিত্রের বাহুল্য সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার পরিবর্তে সৌন্দর্যহানি না ঘটায়। চিত্র সন্নিবেশ করিবার সময় কোন্ কক্ষের কি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য উহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যেমন ছোটদের পাঠকক্ষের দেওয়ালে যদি চিত্র সন্নিবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণত বিখ্যাত আবিষ্কারক, যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত কবি বা দেশ-প্রেমিকদের ছবি থাকাই যুক্তিযুক্ত, যাহাতে ঐ সকল ছবি হইতে ছোটরা উহাদের জীবন গড়িয়া তুলিবার মতন প্রেরণা পায়।

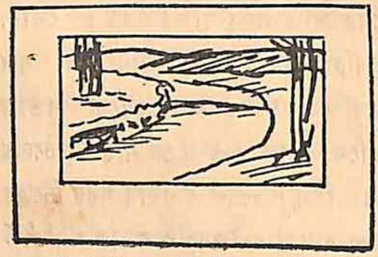
তোমার ঘরের দেওয়ালের ছবি কিনিবার সময় এমন ছবি কিনিবে—যাহার তোমার নিকট বিশেষ কোনও অর্থ আছে। কোন লোক ভাল বলিয়াছে অথচ তোমার কাছে উহার কোনও বিশেষ অর্থ নাই, এইরূপ ছবি বর্জন করিবে। **বিষয়ে, রঙে এবং আকারে এক**—এইরূপ ছোট ছোট ছবিগুলি একসঙ্গে 'করিয়া দেওয়ালের এক পাশে সন্নিবিষ্ট করিতে পার। তবে অবশ্য ছোট ছোট অনেকগুলি ছবি ব্যবহার করা অপেক্ষা একখানি বড় ছবির ব্যবহার অনেক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দেয়। প্রত্যেক দেওয়ালে দু'খানি ছোট ছবি অপেক্ষা একটি দেওয়ালে একখানি বড় ছবি ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়।


এক পাশে সন্নিবিষ্ট করিতে পার

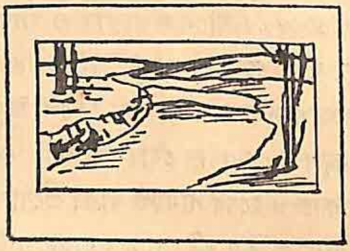
দৃশ্যাবলীর ছবিগুলি সাধারণত সকলেই পছন্দ করিয়া থাকে। বিভিন্ন মানুষের

ছবিতে অনেকের রুচি, অনেকের আবার ঐতিহাসিক চিত্রাবলীই পছন্দ, সুতরাং তুমি তোমার রুচি অনুযায়ী ছবি নির্বাচন করিবে।

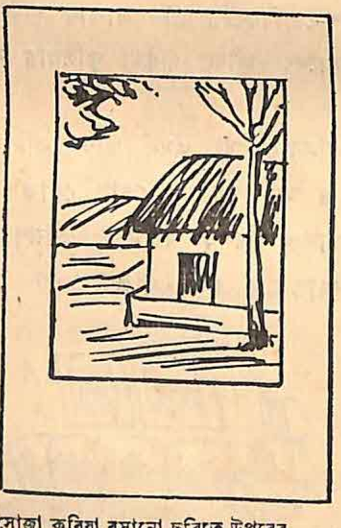
চিত্র নির্বাচনে ফ্রেমের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে—



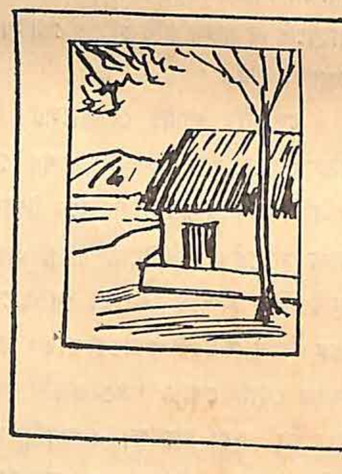
পাশাপাশি করিয়া বসানো ছবিতে পাশের বর্ডার উপরের বর্ডার হইতে চওড়া হওয়া প্রয়োজন। নীচের বর্ডার সর্বাপেক্ষা চওড়া হইবে।



যদিও পাশাপাশি করিয়া বসানো ছবি, কিন্তু উপরের বর্ডার পাশের বর্ডার অপেক্ষা চওড়া হইয়াছে, কাজেই মাত্রাজ্ঞানের অভাব সূচিত করে।



সোজা করিয়া বসানো ছবিতে উপরের বর্ডার পাশের বর্ডার অপেক্ষা চওড়া হওয়া প্রয়োজন।



উপরের বর্ডার পাশের বর্ডার অপেক্ষা সরু হইয়াছে, সুতরাং মাত্রাজ্ঞানের অভাব সূচিত করে।

অবাস্তব ছবিও যদি ক্রয় কর, তাহা হইলেও দেখিয়া লইবে—উহার মধ্যে তুমি কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাও কিনা—উহার ভঙ্গী ও লাইনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য তোমার মনকে অভিভূত করে কিনা,

দেওয়ালের যে জায়গায় ছবিখানি সন্নিবিষ্ট করিতেছ, ছবিখানির সৌন্দর্য সে জায়গাটিকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে কিনা। অবাস্তব ছবি বলিতে সেই ছবিগুলিই বুঝায় যাহার বাস্তবের সহিত মিল নাই। যে ছবিই ক্রয় কর না কেন, দেখিয়া লইবে, ছবিখানিতে আসল ছবির গুণগুলি রহিয়াছে কিনা। আসল ছবি ক্রয় করা বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ধাতুফলকে আসল ছবিগুলির যে ছাপ লওয়া হয়, সেইগুলিই দেওয়ালে সন্নিবেশ করিতে পার। **দেওয়ালসজ্জা ও চিত্র-সন্নিবেশের উদ্দেশ্যই রুচিকে উন্নততর করা**। কাজেই খারাপ ছবি ব্যবহার করা অপেক্ষা ছবি না থাকাই ভাল।

চিত্র সন্নিবেশ করিবার সময় চিত্রখানির ফ্রেমের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অনেক সময় দেখা যায় ফ্রেমের অসামঞ্জস্য ও অসমতার জন্যই ছবির সৌন্দর্যও অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই লক্ষ্য রাখিবে, ছবি ও ছবির ফ্রেম—এ দুয়ের মধ্যে যেন যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি থাকে। ছবির রং ও ছবির ফ্রেমের রং —এ দুয়ের মধ্যেও যথেষ্ট মিল থাকা প্রয়োজন।

কার্পেট ও উহার বিভিন্ন নক্‌শা

গৃহসজ্জায় কার্পেট বা গালিচা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। ধনী গৃহস্বামী কার্পেট দিয়া মেঝে আবৃত করেন এবং কার্পেটগুলিও উহাদের সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে ও বিচিত্র বর্ণসম্ভারে গৃহস্বামীর ঘরখানিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। কার্পেটের প্রয়োজনীয়তা কতখানি বা উহার ব্যবহারই বা কতরূপ হইতে পারে উহা তোমরা পড়িয়াছ। কার্পেট আমাদের প্রাচ্যেরই অতি প্রাচীন জিনিস। মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি অঞ্চলেই হয়ত উহার প্রথম সৃষ্টি। তখনকার দিনে, যখন কলের আমদানী হয় নাই, কার্পেট একটি দুষ্প্রাপ্য মহার্ঘ বস্তু হিসাবেই পরিগণিত হইত। তখনকার দিনের মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া নানান রঙের সহিত রং মিলাইয়া অসীম ধৈর্য সহকারে একটির পর একটি গেরো দিয়া হাতেই কার্পেট বুনিয়া যাইত। হাতে বোনা সেই সকল কার্পেট একদিকে যেমন মজবুত হইত—নানান বর্ণে ও নক্‌শায় অপরদিকে উহা আবার তেমনই বিচিত্র ও মনোরম হইয়া উঠিত।

র‍্যাগ ও কার্পেট :—

ক্রমে কলের আমদানী হয়। প্রাচ্যের এই কার্পেটগুলির অনুকরণে প্রতীচ্যের মানুষ উহাদের জীবনের দ্রুতগতির সহিত তাল রাখিয়া নূতন নূতন **কার্পেট বা র‍্যাগ** (rug) কলেই বুনিয়া লইতে আরম্ভ করে। র‍্যাগও মেঝেয় পাতিবার একপ্রকার পশমের আস্তরণ। কলে-বোনা র‍্যাগ বা কার্পেটের মধ্যে কেবলমাত্র আকার ও আয়তন ছাড়া আর বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। চারিধারে বোনা র‍্যাগ একটি পুরো সুসম্পূর্ণ জিনিস। নিতান্ত ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া র‍্যাগ পুরো ঘরের মাপেও পাওয়া যায়। কার্পেটের বোনা বা নক্‌শা অনেক ক্ষেত্রে র‍্যাগের অনুরূপও হইতে পারে, কিন্তু কার্পেট সাধারণত অনেক দীর্ঘ হয় ও চোঙ্গাকারে গুটানো থাকে। কাপড়ের মতন কাটিয়া কাটিয়াই উহা বিক্রয় করা হয়। কার্পেট ২২½ ইঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৩০ ফুট পর্যন্ত চওড়া দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান-বিশেষে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রস্থের কার্পেট ব্যবহৃত হয়। কার্পেট কাটিয়া লইয়া জুড়িয়া দিবার বিভিন্ন উপায় আছে এবং সেলাইয়ের ঐ জোড়ামুখ দেখা যায় না।

পশম, মেশানো পশম, পাট, সূতো প্রভৃতি বিভিন্ন জমিনেরই কার্পেট তৈয়ারী হইতে পারে। সূতোর কার্পেট যদিও ততটা মজবুত ও স্থায়ী হয় না কিন্তু উহা অনেক সস্তা। সাধারণ বহু কাজেই উহা ব্যবহৃত হয় এবং উহাকে সহজেই পরিষ্কার করা যায়। সূতোর কার্পেটের চল ক্রমেই বাড়িতেছে। আজকাল পাটেরও বহু সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট কার্পেট দেখা যায়। ইহার দামও পশমের কার্পেট অপেক্ষা অনেক কম। পশম ও পাট মিশাইয়া আজকাল যে একরকম কার্পেট বোনা হয় উহা স্থায়িত্ব, রঙের ঔজ্জ্বল্য ও পরিষ্কার করার দিক দিয়া প্রায় অন্যান্য সকল কার্পেট অপেক্ষাই উৎকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। পশমের কার্পেট মূল্যবান জিনিস এবং নক্‌শার চাকচিক্য ও রঙের ঔজ্জ্বল্যে উহা মনোরম নিঃসন্দেহ, কিন্তু পশম বলিয়াই উহা যত্ন সহকারে সন্তর্পণে ব্যবহার করিতে হয়।

বিভিন্ন রকমের কার্পেট :—

কলে কার্পেট বোনার রেওয়াজের পর হইতেই উইলটন (Wilton), এক্সমিনস্টার (Axminster), ভেলভেট (Velvet), ইনগ্রেন (Ingrain),

চেনিল (Chenille), লক উইভ (Lock weave) প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্পেটের চল বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের উইলটন শহরের নাম হইতেই উইলটন কার্পেটের নামকরণ হইয়াছে। উইলটন কার্পেট অত্যন্ত মজবুত। পশমের কিছুটা অংশ কার্পেটের পিছনের দিকেও লইয়া গিয়া বুনিয়া দিবার দরুন উহার প্রতিরোধ-ক্ষমতাও কিছু বেশী। এক্সমিনস্টার কার্পেটের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সাধারণত এই কার্পেটের বুননে অসংখ্য রং দেখা যায় এবং অসংখ্য রং আছে বলিয়াই ইহার বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতাও অদ্ভুত। ইনগ্রেন কার্পেটের সোজা ও উল্টো দিক্ বলিয়া কিছু নাই—ইহা দুই দিকেই ব্যবহার করা চলিতে পারে। এই কার্পেটের বুননের ও রং সাজাইবার এমনই বিশেষত্ব যে একদিককার রং কার্পেটের অন্য পিঠে বিভিন্ন মূর্তি বা ছবির রঙে রূপায়িত হয়। 'চেনিল' একটি ফরাসী শব্দ। চেনিলের অর্থ গুটিপোকা। এই কার্পেট দেখিলে মনে হইবে, V-এর আকারে ছোট ছোট কম্বলের টুকরা কাটিয়া লইয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার নক্শা হঠাৎ দেখিলে গুটিপোকার কথাই মনে করাইয়া দেয়। লক উইভ কার্পেটের বিশেষত্ব এই—উহা যেদিকেই কাট না কেন—উলের বোনার ন্যায় উহার খুলিয়া আসার সম্ভাবনা নাই।

প্রাচ্যের কার্পেট :—

প্রাচ্যের কার্পেটগুলিকে একটি সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহা প্রথমত হাতে বোনা। হাতে বোনা বলিয়াই ইহা যেমন নিখুঁত তেমনই মজবুত। স্থায়িত্বের দিক দিয়া উহা অন্যান্য সকল কার্পেটকেই ছাড়াইয়া যায়।

এই কার্পেটগুলির অফুরন্ত রং ও নক্শার দিকে যতই তাকানো যায়, ততই যেন ইহার গভীরতা ও বিচিত্রতায় মন মুগ্ধ হয়। গৃহসজ্জায় প্রাচ্যের এই কার্পেটগুলি প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উভয় দেশেই এখনও সমানভাবে আদৃত হয়। কলে-বোনা কোনও কার্পেটই ইহার স্থান পূরণ করিতে পারে না। প্রাচ্যের কার্পেট বা র‍্যাগ (rug) বলিতে আমরা অনেক সময় **নাম্‌দার** উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু নাম্‌দার মধ্যে প্রাচ্যের আসল কার্পেটের ন্যায় হাতে-দেওয়া অসংখ্য গেরোগুলি থাকে না। প্রাচ্যের কার্পেট বলিতে

প্রধানত **পার্শিয়ান** কার্পেটগুলিকেই বোঝায়। পার্শিয়ান কার্পেটগুলি উহাদের রং, নক্‌শা ও শিল্পনৈপুণ্যে অন্যান্য সকল কার্পেটকেই ছাড়াইয়া যায়। টার্কি (Turkey), ককেশাস (Caucassus), বেলুচিস্তান, চায়না প্রভৃতি দেশের কার্পেটও বিখ্যাত। আমাদের দেশের কার্পেটও মনোরম নিঃসন্দেহ। কিন্তু পার্শিয়ান কার্পেটের ঔজ্জ্বল্যের কাছে হয়ত অপর সবগুলিই ম্লান হইয়া যাইবে।

পার্শিয়ান কার্পেটের নক্‌শা :—

পার্শিয়ান আর্ট বা শিল্পকলার মধ্যে পার্শিয়ান কার্পেটগুলিও একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। পার্শিয়ান কার্পেটগুলির বিভিন্ন নক্‌শার মধ্যে প্রায়ই কোন-না-কোনও অর্থ নিহিত থাকে। যেমন, পার্শিয়ান কার্পেটে 'জীবন-তরুর' (Tree of life) ছবি। ইহা আর কিছুই নয়—ছোটখাটো ডাল-পালায় ভরা জীবনের প্রতীক একটি ছোট চারাগাছ মাত্র। এই চারাগাছের নক্‌শা আজ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়—কিন্তু ইহা প্রথম আসে সিরিয়া হইতেই। আবার অনেক কার্পেটে দেখিবে এক জোড়া পাখী দু'টি ডালে মুখোমুখি বসিয়া আছে। এই পাখীগুলি সর্বজ্ঞ জ্ঞানী পাখীরূপেই পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। পার্শিয়ান কার্পেটের এইরূপ প্রায় প্রতি চিত্রের পিছনেই কোনও-না-কোনও কাহিনী থাকে। প্রাচ্যের এই বিভিন্ন নক্‌শাযুক্ত কার্পেটের অনুকরণেই আজ প্রতীচ্যের লোকেরা কলে কার্পেট বুনিতেছে। এই সকল অর্থযুক্ত ছবি ছাড়াও আবার অনেক সময় কার্পেটে বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা ইতাদিও দেখা যায়।



জীবন-তরু

পর্দা সংযোজনা ও উহার রং

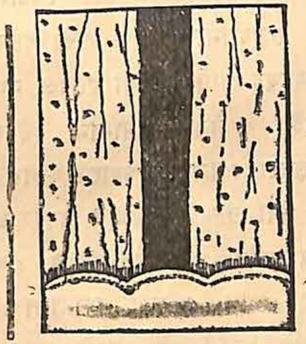
গৃহ-প্রসাধনে পর্দা একটি প্রধান উপকরণ। গৃহের সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তোমরা পড়িয়াছ। পর্দা সংযোজনা করিবার রীতিগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

পর্দা সংযোজনার নিয়ম :—

কোনও কক্ষে পর্দা সন্নিবেশ করিতে হইলে প্রথমেই জানিয়া লইবে সেই কক্ষটি কোন্ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইবে, উহার অন্যান্য জিনিসগুলি সাজাইবার পরিকল্পনা কি, গৃহস্বামীর রুচিই বা কিরূপ। কক্ষটির আয়তন, দেওয়ালের রং, দরজা-জানালাগুলির আকার-প্রকার কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত তথ্যগুলিই তোমাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। তারপরে ঘরের রং, আয়তন,



১ম



২য়

দরজা-জানালা প্রভৃতির মাপ—এই সমস্তগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তোমাকে পর্দা রচনা করিতে হইবে। সকল রকম জানালায় একই রকম পর্দা সংযোজনা করা যায় না, লম্বা, চৌকো, ছোট, বড় বিভিন্ন জানালায় বিভিন্ন আকার ও আয়তন অনুযায়ী পর্দার ব্যবস্থা করিতে হয়। পর্দা রচনা করিতে সর্বদাই মাত্রা ও সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। **মাত্রা ও সমন্বয়ের অভাবে পর্দা বেমানান হইয়া পড়ে।** ১ম চিত্রে লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, পর্দা বাঁকা ভাবে কাটা যদিও, কিন্তু জানালার আয়তন ও পর্দার আকার দুয়ের মধ্যে

একটি সহজ সমন্বয় রক্ষা করিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। ২য় চিত্রখানিতে দেখ—পর্দা সোজা করিয়া কাটা, তথাপি জানালার আয়তনের সহিত



৩য়



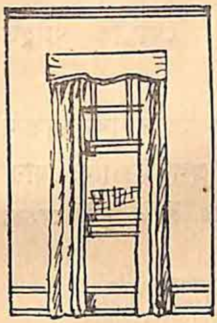
৪র্থ

সামঞ্জস্য থাকাতে উহা বেমানান হয় নাই। কিন্তু অপর পক্ষে ৩য় ও ৪র্থ চিত্রখানিতে দেখ—পর্দা রচনায় যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা সূচিত হইলেও এবং নূতনত্বের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও, সমন্বয় ও সহজ মাত্রাজ্ঞানের অভাবে দুইখানি পর্দাই অত্যন্ত বেমানান হইয়াছে। চতুর্থ পর্দাখানি অযথা অনাবশ্যক আড়ম্বরে বোঝাই হওয়াতে উহার সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে।

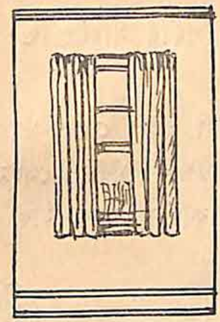
পর্দা রচনা করিবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে লক্ষ্য করিবে, তোমার রচনাভঙ্গীর জন্য জানালার সৌন্দর্য কোথাও ব্যাহত হইতেছে কিনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জানালাগুলি মোটামুটি লম্বা সমকোণ বিশিষ্ট, সেই কারণে পর্দাগুলিও প্রায়ই সোজা হয় যাহাতে লম্বা লম্বা ভাঁজ ফেলা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে পর্দা সোজা করিয়া কাটা ও সোজা বড় বড় ভাঁজ ফেলাই যেখানে উদ্দেশ্য—সেই সকল ক্ষেত্রে, হয় পর্দাগুলিকে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া দাও, যাহাতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত পৌছায়, কিংবা মেঝে হইতে এক ইঞ্চ বা আধ ইঞ্চি উপরে রাখ, কিংবা জানালার সহিত একেবারে সমান করিয়া দাও, কিন্তু উহার মাঝামাঝি করিও না। জানালার ঝুল হইতে যদি পর্দাখানির মাপ ছোট কর, কিংবা মেঝে পর্যন্ত না পৌছাইয়া যদি পর্দাখানিকে ঘরের মাঝামাঝি আনিয়া ছাড়িয়া দাও—তাহা হইলে দেখিবে উহা অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

নিম্নে ১নং চিত্রখানিতে দেখ, পর্দাটিকে লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া মাটির সহিত ঠেকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও অসঙ্গতি নাই, তাকাইতেও মনোরম বোধ হইতেছে।

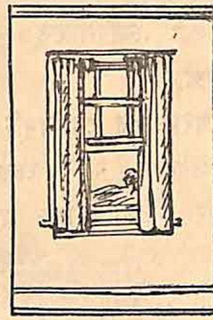
২নং চিত্রে দেখ, পর্দায় জানালার ফ্রেমও ঢাকিয়া গিয়াছে—এবং জানালার



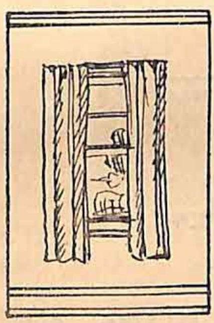
১নং



২নং



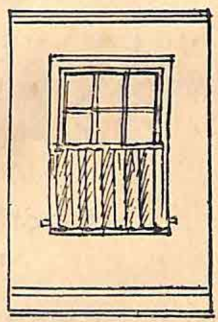
৩নং



৪নং



৫নং



৬নং

সমান করিয়াই পর্দাখানি কাটা হইয়াছে। এই পর্দাটিতেও কোথাও মাত্রা-জ্ঞানের অভাব দেখা যায় না, এই কারণে ইহাও বেমানান নয়।

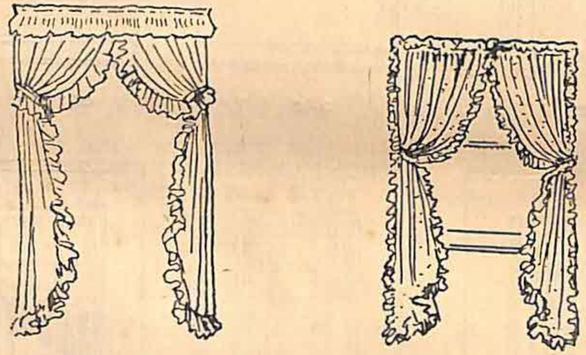
৩নং চিত্রে—জানালার ফ্রেমটিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে কিন্তু পর্দা জানালার সমান করিয়াই কাটা। পর্দার সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য এই ক্ষেত্রে কাঠের কাঠামোটিকে বাহিরে রাখা হইয়াছে। এই পর্দাখানিতেও কোথাও সুর ও সঙ্গতি নষ্ট হয় নাই এবং উহা দেখিতেও মনোরম হইয়াছে।

৪নং চিত্রে দেখ—পর্দাখানির ঝুল জানালার ঝুল হইতে দীর্ঘ এবং দেওয়ালের অর্ধেক আসিয়াই যেন থামিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সুর কাটিয়া যাওয়ায় পর্দাখানিকে বেমানান বোধ হইতেছে।

৫নং চিত্রের পর্দাখানির ঝুল জানালা হইতে ছোট, তাই বিসদৃশ মনে হইতেছে।

৬নং চিত্রখানিতেও—যেন পর্দার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় কোথাও ব্যাহত হইতেছে।

পর্দাগুলির মোটামুটি রচনা হইয়া গেলে তারপরে উহার কিনারাগুলি ও উপরের বা নীচের ধারগুলি কুঁচি, লেইস, ফ্রিল ইত্যাদির দ্বারা কেমন করিয়া আরও সুন্দর করিয়া তোলা যায়, উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া



কুঁচি, লেইস, ফ্রিল ইত্যাদির দ্বারা পর্দাগুলিকে
আরও সুন্দর করিয়া তোল

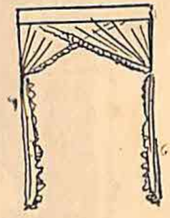
আবশ্যক। অনেক স্থলে আবার নানান রকম সিল্কের ফিতা দিয়া হালকা করিয়া



বাঁধিবার দরুন আরও রমণীয় হইয়া উঠে

পর্দাগুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, এই ভাবে বাঁধিয়া দেওয়ার দরুন পর্দার

গায়ে যে আবার কতকগুলি ভাঁজের সৃষ্টি হয়, সেই ভাঁজগুলি পর্দাকে আরও রমণীয় করিয়া তোলে। বাঁধিবার সময় আবার লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহা অত্যধিক আঁট না হয়। অত্যধিক আঁট হইলে উহা দ্বারা পর্দায় কমনীয়তার পরিবর্তে কাঠিন্যের সৃষ্টি হইবে। ফিতা দিয়া বাঁধিবার সময় সর্বদাই খেয়াল রাখিবে, যাহাতে কোথাও কোনক্রমেই মাত্রাজ্ঞানের বিচ্যুতি না ঘটে। পর্দাগুলিকে যদি তুমি অত্যধিক আঁট করিয়া ঠিক মাঝামাঝি বাঁধ, তাহা হইলে উহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে ও উহা অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে।



অত্যধিক আঁট না হয়

পর্দার রং—ঘরের রং বা বাহিরের আলো দুয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পর্দার রং নির্বাচন করা কঠিন সন্দেহ নাই। **কিন্তু পর্দার রংই আসল।** পূর্বেই বলিয়াছি—উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল করিয়া বাহিরের আলোকের পরিবর্তন করা পর্দার একটি প্রধান কাজ। পর্দা তৈয়ারী করিবার পূর্বেই দেখিয়া লইবে, ঘরে আলোর গতি কিরূপ। কোন্ দিক হইতে কতখানি আলো ঘরে



পর্দার রংই আসল

আসিতেছে, উহার ঔজ্জ্বল্য কতখানি কমাইবে বা বাড়াইবে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পর্দার ব্যবস্থা করিবে। নিপুণ পর্দা রচনাকারীরা, অনেক সময় দেখিবে, আলোর বুকে পর্দার কাপড়খানিকে মেলিয়া ধরিয়া দেখিতেছেন—কোন্

আলোয় কিরূপ রঙের পর্দা কোন্ ঘরে অধিকতর মানাইবে। ঘরের আয়তন অনুযায়ীও পর্দার রঙের তারতম্য হইতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখিবে, পর্দার বিভিন্ন রং ও সংযোজনার নৈপুণ্যের জন্যই কক্ষের আয়তন ছোট বড় প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন, ঘরখানি যদি ছোট হয় এবং তুমি যদি উহাকে পর্দার সাহায্যে বড় প্রতীয়মান করিতে চাও তাহা হইলে তুমি পর্দাকে **পটভূমি**



মেলিয়া ধরিয়া দেখিতেছেন

হিসাবেই ব্যবহার কর। অর্থাৎ পর্দার রং নির্বাচন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহা দেওয়ালের রঙের সহিত মিশিয়া যায়। যদি গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবেই বহু কারুকার্যখচিত উজ্জ্বল ও বিচিত্র রঙের পর্দা ব্যবহার কর, দেখিবে ঘরের আয়তন ছোট মনে হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে দেওয়ালের রং ও ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রাদির মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া দিবার পর্দাই একমাত্র যোগসূত্র। সুতরাং পর্দা সন্নিবেশ করিবার সময় ঘরের দেওয়াল ও মেঝের রং, আসবাবপত্রাদির সংস্থান ও উহাদের রং বা বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কারণ উহাদের সহিত **সামঞ্জস্য সৃষ্টিতেই পর্দার সার্থকতা**। তুমি কক্ষের মধ্যে যেরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক তাহার উপরেই পর্দার রং-নির্বাচন নির্ভর করিবে।



গৃহসজ্জায় পর্দা একটি প্রধান উপকরণ। সুনিপুণ
পর্দা-সংযোজনায় গৃহের আবহাওয়া মনোরম
ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। কক্ষের পরিবেশ
ও পর্দার সংযোজনা দু'য়ের মধ্যে
সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।

কক্ষের অন্যান্য জিনিসপত্রাদির কথা বিবেচনা করিয়া তোমাকেই স্থির করিয়া লইতে হইবে, তুমি তোমার জানালা ও জানালার পর্দাটিকেই প্রাধান্য দিবে, কি পর্দাটিকে গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলির একটি সুন্দর পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করিবে। এই বিবেচনার দ্বারাই পর্দার রং নির্বাচিত হইবে। সাধারণত ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল রং ও কারুকার্য-খচিত গৃহসজ্জায় নানান উপকরণ ও জিনিসপত্রাদির সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহা হইলে পর্দাকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। সেই ক্ষেত্রে পর্দার জন্য এমন একটি রং বাছিয়া লও যাহা সহজেই দেওয়ালের রঙের সহিত মিশিয়া যাইবে। তাহা হইলেই দেখিবে, কক্ষমধ্যস্থিত জিনিসগুলির সৌন্দর্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিংবা, পর্দা পটভূমির কাজ করিলেও তুমি যদি চাও উহা সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, তাহা হইলে উহার রংও সেইভাবে নির্বাচিত করিবে। যেমন, দেওয়ালের রং যদি বালির রং হয়, তাহা হইলে পর্দার জন্য সোনালী বা মরিচা রং-এর মত রং নির্বাচন করিবে। ঘরের মধ্যে যদি গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলির সংখ্যা কম হয়, তাহা হইলে উজ্জ্বল রং ও নক্‌শা-বিশিষ্ট পর্দা সংযোজনা করিবে, যাহাতে পর্দা, উহার বর্ণ ও চিত্র দিয়া আসবাবপত্রাদির অভাব ঢাকিয়া দিতে পারে। যে ভাবে যে রংই নির্বাচন কর না কেন, সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র ও সাধারণ আবহাওয়ার সহিত **সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের কখনও অভাব না হয়।** ইহা ছাড়াও সংসারে গৃহসজ্জার ছোটখাট আরও অনেক জিনিস থাকে, যেমন— দেওয়ালের ছবি, বহু কারুকার্য-খচিত একখানি জয়পুরী প্লেট বা একটি ফুলদানি— কাশ্মীরী কাজকরা ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স, কিংবা হাতীর দাঁতের একটি বাতিদান ইত্যাদি। এই জিনিসগুলির ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর পরিবর্তে **ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করাই প্রধান কাজ।** তবে ইহাদের প্রয়োজন নাই একথা বলাও চলে না, কারণ ইহাদের সুকুমার শিল্পে অনেক সময় ঘরের বড় বড় আসবাবগুলির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। তাছাড়া, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ছোটখাট অনেকগুলি কাজেই ইহারা সহায়তা করে।

আসবাবপত্র

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন আসবাব :—

গৃহরচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইলে কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয়। আসবাবপত্রের যথাযথ নির্বাচন ও সংস্থানের উপরেই গৃহের ভিতরকার সৌন্দর্য, শান্তি ও আরাম অনেকাংশে নির্ভর করে। গৃহের আসবাব বলিতে সাধারণত



আসবাবপত্রের সংস্থানের উপরে গৃহের সৌন্দর্য নির্ভর করে

খাওয়া-দাওয়া, স্নান, নিদ্রা, পাঠাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদাদি গ্রহণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি সংসারের বিভিন্ন কাজগুলির সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে যাবতীয় যা কিছু সরঞ্জামাদির প্রয়োজন হয় মোটামুটি সে সমস্তকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং চেয়ার, টেবিল, খাট, আয়না, আলমারি, বইয়ের শেল্‌ফ, কাপড়-চোপড় রাখিবার র‍্যাক, আলনা, কার্পেট, পর্দা, ফুলদানি ইত্যাদি সমস্তই আসবাবপত্রের পর্যায়েই পড়ে।

ছোট বা বড় যে-কোনও রকম আসবাবই হোক না কেন উহাদের নির্বাচন ও সন্নিবেশে যথেষ্ট রুচি ও মাত্রাজ্ঞানের আবশ্যক। স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর রুচি-সঙ্গত একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবখানি ক্রয় করিয়া, উহার যথাযথ সংস্থান দ্বারা কি ভাবে গৃহের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবেন ও অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইবেন, উহার উপরেই নির্ভর করে গৃহস্বামীর গৃহ-রচনার কলা-কৌশল। আসবাব-পত্রের যথাযথ নির্বাচন ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের যথাযথ সংস্থান একান্ত কঠিন কাজ বলিয়াই জানিবে—যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উহা অত্যন্ত সহজ।

আসবাবপত্রাদির সংস্থান ঃ—

আসবাবপত্রাদির যথাযথ সংস্থান সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপরেই নির্ভর করে। পরিকল্পনা ব্যতীত আসবাব ক্রয় করিলে উহা পরে সন্নিবেশ করাই কঠিন হইয়া উঠে। পরিকল্পনা করিবার সময় সর্বদাই খেয়াল রাখিবে, বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন আয়তন ও পরিসর অনুযায়ী আসবাবপত্রাদির কি ভাবে সংস্থান করিলে



ঘরের আয়তন অনুযায়ী
আসবাব নির্বাচন কর



পরে সন্নিবেশ করাই
কঠিন হইয়া উঠে

সৌন্দর্যের দিক হইতে তোমার গৃহখানি কিছুটা **বৈশিষ্ট্য** অর্জন করিবে। তোমার রুচি অনুযায়ীই তুমি আসবাবগুলি সন্নিবিষ্ট করিবে, সুতরাং তোমার রুচিকে আশ্রয় করিয়া কক্ষ-বিন্যাসের মধ্য দিয়াই যেন তোমার নিজের ব্যক্তিগত

বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়া উঠে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবে। কেবলমাত্র সজ্জার দিকে তাকাইলেই চলিবে না—কোন্ জিনিসটি কি ভাবে রাখিলে কতখানি আরামদায়ক হইবে, উহা সেই কক্ষের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে কিনা তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে।

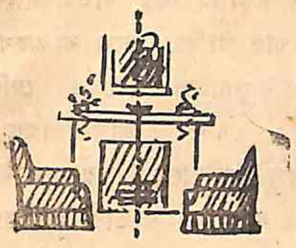
আসবাবপত্রাদির পরিকল্পনায় কেবলমাত্র সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্যই যে প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা নহে, দেখিতে হইবে তোমার পরিকল্পনা কতখানি কার্যকরী হইবে। অর্থাৎ জিনিসটি উহার প্রয়োজন মিটাইবে কিনা উহাই হইবে আসল বিবেচনার বিষয়।

আসবাবপত্রগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—যেগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যেমন, খাট বা চৌকি, লেখাপড়ার চেয়ার, টেবিল, ডেস্ক, শেল্‌ফ ইত্যাদি, আর যেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় নয় অথচ গৃহসজ্জায় বিশেষ স্থান অধিকার করে, যেমন একখানি বিশেষ কার্পেট, দেওয়ালের ছবি, একটি বিশেষ ধরণের তৈয়ারী টিপয় বা বুক কেস ইত্যাদি! যে-কোনও আসবাব তুমি যে ভাবেই সন্নিবেশ কর না কেন, তোমার বিশেষ বিবেচনা হইবে, সেই আসবাব **উহার বিশেষ প্রয়োজনটুকু মিটাইতেছে কিনা**। আসবাবপত্রের সংস্থানে সর্বপ্রথমেই তোমার গৃহের বাসিন্দাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিবে। জীবনযাত্রায় **স্বাচ্ছন্দ্য আনাই আসবাবপত্র-সংস্থানের প্রধান উদ্দেশ্য।**

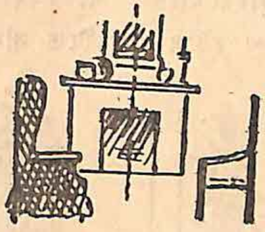
এইভাবে মোটামুটি একখানি পরিকল্পনা করিয়া তুমি আসবাবগুলির যথাযথ সংস্থানের কাজে প্রবৃত্ত হইবে। পূর্বে পরিকল্পনা না করিলে পরে জিনিসপত্র সন্নিবেশ করাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমেই স্থির করিবে, তোমার কক্ষের কোন্ অংশটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, কোন্ অংশটির সৌন্দর্য তুমি আরও ভালো করিয়া ফুটাইতে চাও। ঐ জানালাটি কি? যে জানালা দিয়া বাহিরের বহুবিস্তৃত প্রান্তর ও আকাশ দেখা যায়? কিংবা বারান্দার ঐ দেওয়ালটি—যে দেওয়াল অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, যাহার গায়ে তুমি সোফাগুলি সাজাইতে পার? তেমন কিছু বিশেষ যদি না থাকে তাহা হইলে যে-কোনও একটি জায়গাকে প্রধান মনে করিয়া সাজাইতে আরম্ভ কর। **যে-কোনও একটি ক্ষেত্র ঠিক করিয়া ঐখান হইতে সুরু করাই সাজাইবার মূলনীতি।**

যে জিনিসগুলি দেখিতে একই রকম, সাধারণত আমরা সেই জিনিসগুলিকে

হয় সামনা-সামনি, নয় পাশাপাশি, নয় কোণাকুণি সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করি যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে। অনুরূপ জিনিসের সংস্থান অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু



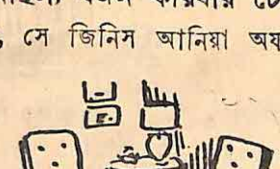
অনুরূপ চেয়ারের সন্নিবেশ



অসমান চেয়ারের সন্নিবেশ

অসমান বা অসমমাত্রিক জিনিসকেও রুচিসঙ্গত উপায়ে সন্নিবেশ করা যায়। তোমার ঘরে দুইখানি চেয়ার রহিয়াছে—একখানি গদি-আঁটা, ঝালর-দেওয়া ও সামান্য বড়; অপরখানি অপেক্ষাকৃত ছোট, অত্যন্ত সাদাসিধা ও সম্পূর্ণরূপে বাহুল্য-বর্জিত। তোমার কক্ষে দুইখানি চেয়ারেরই প্রয়োজন ও উহাদের যথাযথ সংস্থান আবশ্যক। যে জায়গায় এই দুইখানি চেয়ার সন্নিবেশ করিতে চাও, সেই জায়গাটি সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া ছোট চেয়ারখানিকে দাগ লাইন হইতে আরও পিছনের দিকে হটাইয়া দাও। দেখিবে দুইখানি চেয়ারই বেশ সামঞ্জস্য সহকারে সংন্যস্ত হইয়াছে। এইভাবে ঘরের অসমান আসবাবপত্র-গুলিকেও পরিসর কমাইয়া বাড়াইয়া তুমি সমান ও সুন্দরভাবে সংন্যস্ত করিতে পার।

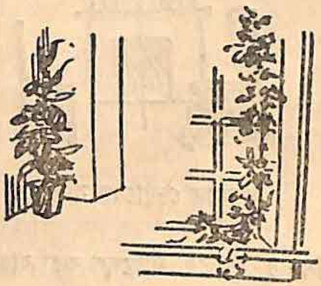
আসবাবপত্র ইত্যাদির সংস্থানে সর্বদাই **বাহুল্য বর্জন করিবার চেষ্টা করিবে**। যে জিনিসে তোমার প্রয়োজন নাই, সে জিনিস আনিয়া অযথা ঘরের আবহাওয়াকে ভারাক্রান্ত করিবে না। **আসবাব-বাহুল্য ঘরের বায়ু-চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে**। আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়া ঘর সাজাইবার সময় ঘরের **কোণ-গুলির** কথা সর্বদাই স্মরণ রাখিবে। ঘরের কোণগুলি যে, কোনও



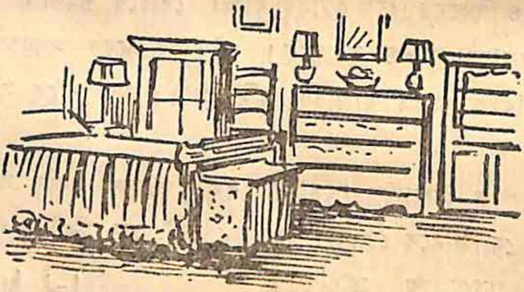
কোণগুলিও বহু প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে

প্রয়োজনে আসে না ইহা মনে করিও না, ঠিক মতন সাজাইতে পারিলে

কোণগুলিও ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে ও বৈঠকখানা প্রভৃতি ঘরে নিরালায় পড়া, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনও মিটাইয়া থাকে। ঘরের কোণগুলির জন্য যদি নিতান্তই কিছু পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কোণটিতে সামান্য একখানি গাছ রাখিয়া দিলে বা একখানি লতা ঝুলাইয়া দিলেও দেখিবে ঘরের সৌন্দর্য আরও স্নিগ্ধ ও পরিস্ফুট হইয়াছে। ঘর সাজাইবার সময় সমস্ত বড় ও ভারী জিনিসগুলি যাহাতে দেওয়ালের একদিকে না পড়ে, সেইদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, কারণ উহাতে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের একান্ত অভাব ঘটিবে। বড় এবং ছোট, উঁচু এবং নীচু, সমস্ত আসবাবগুলিই এমনভাবে সাজাইবে যাহাতে একটি সহজ সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়।



সৌন্দর্য আরও স্নিগ্ধ ও পরিস্ফুট হইয়াছে

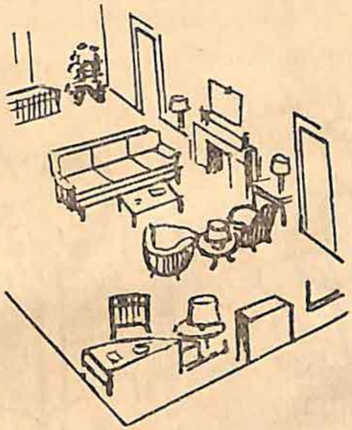


সমস্ত বড় জিনিস একদিকে রাখিবে না

আসবাবপত্র সন্নিবেশে সর্বদা মনে রাখিবে—

(১) ঘরের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া কখনও কোনও জিনিস সন্নিবেশ করিবে না।

(২) আসবাবপত্রের সংস্থান এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিতে বা খুলিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।



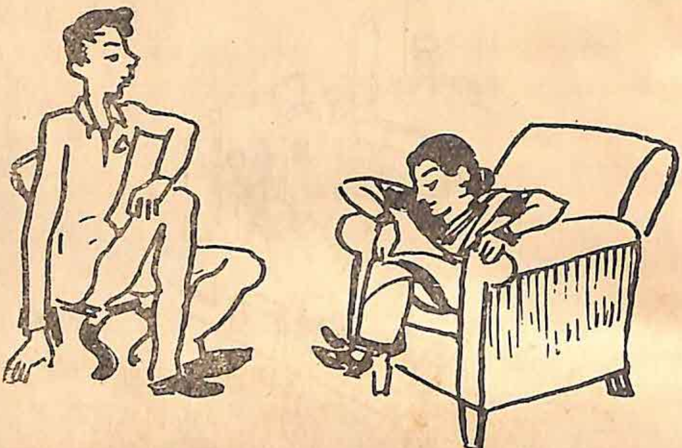
কেহ কাহারও কাজে ব্যাঘাতের সৃষ্টি না করে

(৩) একই ঘরে যদি পড়া-শুনা বা গল্পগুজব ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে আসবাবপত্রাদির এমন ভাবে সংস্থান করিবে যাহাতে কেহ কাহারও কাজে ব্যাঘাতের সৃষ্টি না করে।

আসবাবপত্রাদির নির্বাচন :—

কোনও কক্ষের আসবাব নির্বাচন বা ক্রয় করিতে হইলে প্রথমেই সেই কক্ষের আয়তন ও পরিসরের কথা চিন্তা করিবে। আয়তন অনুযায়ী আসবাব নির্বাচন করা প্রয়োজন, কারণ তোমরা জান, বড় ঘরে অত্যধিক ছোট আসবাব যেমন বিসদৃশ বোধ হয়, ছোট ঘরে বড় আসবাব ঠিক তেমনই বেমানান ও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠে। আসবাব-নির্বাচনের সময় ইহাও লক্ষ্য রাখিবে উহার উচ্চতা, প্রস্থ ইত্যাদি তোমার দৈহিক গঠনের অনুরূপ হইয়াছে কিনা। কারণ, তোমরা জান,

যথাযথ শয়ন, উপবেশন ইত্যাদির উপরেই সুষ্ঠু দেহভঙ্গী নির্ভর করে। কিন্তু চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তোমার উপবেশন ও অন্যান্য কাজকর্মের বস্তুগুলি যদি অসমান বা তোমার অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে তোমার



দৈহিক গঠনের অনুরূপ হইয়াছে কিনা

দেহের যথাযথ গঠন ব্যাহত হইবে নিঃসন্দেহ। সুষ্ঠু ভঙ্গীর পরিবর্তে তুমি দেখিতে দেখিতে দুষ্ট ভঙ্গীই আয়ত্ত করিবে।

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, মানুষের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যই আসবাব-রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আসবাব নির্বাচনের সময় ইহাও লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে উহা যথেষ্ট আরামদায়ক হয়। আরাম—আসবাবের আকার বা আয়তনের উপর নির্ভর করে না, আরাম নির্ভর করে বস্তু-বিশেষের গঠন-প্রণালীর উপর। সুতরাং আসবাব-নির্বাচনের সময় উহার **গঠন-প্রণালীর** প্রতিও দৃষ্টি দিবে। অর্থানুকূল্য না থাকিলে অধিকসংখ্যক আসবাবের প্রতি লক্ষ্য না দিয়া, যে দু'একখানি ক্রয় করিবে উহা স্থায়ী, মজবুত ও রুচিসঙ্গত হইল কিনা দেখিয়া লইবে। সৌন্দর্যের মান না নামাইয়া অল্প ব্যয়ে সর্বদা উৎকৃষ্ট জিনিস কিনিবার প্রতিই দৃষ্টি রাখিবে। **আধুনিক সজ্জার বৈশিষ্ট্যই বাহুল্য-বর্জন**। সুতরাং আসবাব নির্বাচন করিবার সময়েও সাদাসিধা, সহজ, বাহুল্য-বর্জিত আসবাব নির্বাচিত করিবে। যে সকল আসবাবপত্রের কারুকার্য যতই সহজ ও সরল, সেইসকল আসবাবপত্রে ধূলাবালি ইত্যাদি জমিবার আশঙ্কাও ততই কম জানিবে। কিন্তু সাদাসিধা হইলেও দেখিবে

আসবাবগুলির আকার ও উহার বিভিন্ন নক্‌শাগুলির মধ্যে **সামঞ্জস্য** ও **সমন্বয়** রহিয়াছে কিনা ও আসবাবটি দেখিতে **মনোরম** কিনা। আসবাব নির্বাচন করিতে হইলে তুমি প্রথমেই দেখিয়া লইবে, যে উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনের জন্য তুমি আসবাবটি ক্রয় করিতেছ ঐ আসবাবটিতে তোমার সে উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা ও তোমার সে প্রয়োজনটি মিটিবে কিনা। যেমন—সেলাই করা, আরাম করা, পড়াশুনা করা, খাবার গ্রহণ করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন চেয়ার রহিয়াছে। প্রত্যেকটি চেয়ারের কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তুমি দেখিয়া লইবে তোমার নির্বাচিত চেয়ারখানি তোমার প্রয়োজনের উপযোগী কিনা। আসবাব নির্বাচনে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাহাতে কেহ অসাবধানতাবশত হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে আসবাবপত্র হইতে যেন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত না হন। এইজন্যই আজকাল অনেক আসবাবেরই কোণগুলি গোল করিয়া দেওয়া হয়। ইহা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য শিশুদের আসবাবের পক্ষে।

বিভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্র অনুযায়ী পুষ্প-রচনা

বিভিন্ন স্থানের পুষ্প-রচনা :—

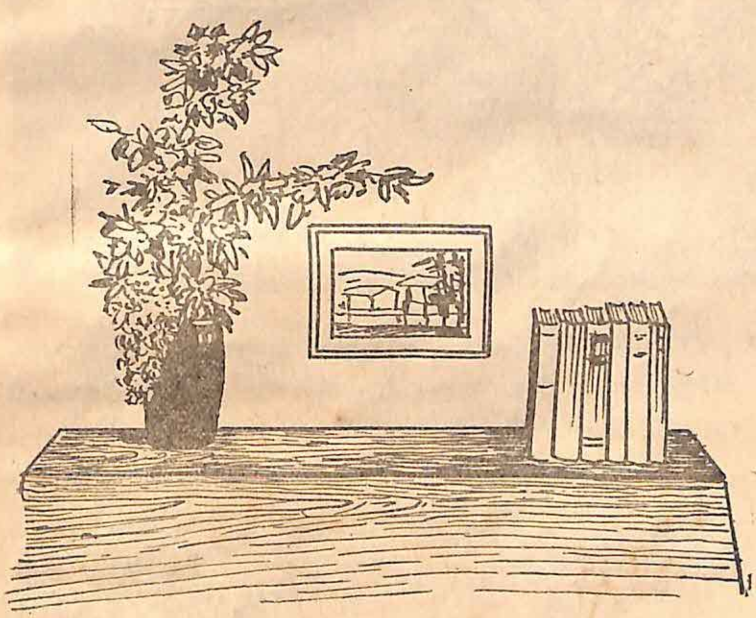
গৃহ-উদ্যানে ফুল ফুটিয়া থাকে, ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে গৃহখানিও মনোরম হইয়া উঠে। সুতরাং উদ্যান হইতে ফুলগুলিকে ছিঁড়িয়া গৃহে আনিয়া লাভ কি—যদি তুমি উহাদের স্থান ও ক্ষেত্র অনুযায়ী সাজাইয়া উহাদের রূপ ও রংকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে না পার? গৃহের বিভিন্ন **স্থান** ও **ক্ষেত্র** অনুযায়ী ফুল সাজানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু উহাতে যথেষ্ট **চিন্তা** ও **যত্নের** আবশ্যক। কারণ ফুলগুলির রূপ যদি ভাল করিয়া দেখাইতে হয় ও যথাযথ সন্নিবেশ করিয়া উহাদের সৌন্দর্যকে যদি ভাল করিয়া ফুটাইতে হয় তাহা হইলে একটি আধারের মধ্যে যেমন তেমন করিয়া ফুলগুলিকে গুঁজিয়া দেওয়া চলে না। ইহাতেও **সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি, মাত্রাজ্ঞান, সমন্বয়** ও **সামঞ্জস্য** প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। তোমরা ফুল সাজাইবার নিয়মগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি পড়িয়াছ। এখন দেখা যাক, বিভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্র অনুযায়ী কি ভাবে পুষ্প-বিন্যাসেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ—জন্মতিথি, বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি আনন্দ-অনুষ্ঠান ও মৃত্যুবার্ষিকী, শ্রাদ্ধবাসর প্রভৃতি শোকসভাগুলির কর্মসূচী এক প্রকার হয় না। একটির আবহাওয়া আনন্দমুখর—হাসি, গান, আলো ও রঙের খেলায় ঝলমল ; অপরটির আবহাওয়া স্তব্ধ, বিষণ্ণ—গভীর বেদনা যেন সব কিছুর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এই দুইটি ভিন্ন ক্ষেত্রে পুষ্প-রচনাও যে ভিন্নতর হইবে ইহা আর বিচিত্র কি! তুমি তোমার গৃহসজ্জার নৈপুণ্য দিয়াই আবহাওয়াকে বদলাইয়া দিতে পার যেমন ঠিক, তেমনি তোমার নিপুণ পুষ্প-নির্বাচন ও বিন্যাসের দ্বারাও তুমি গৃহের বিভিন্ন অংশকে উহার প্রয়োজন অনুযায়ী সজ্জায় সজ্জিত করিতে পার। পুষ্প নির্বাচন করিবার নিয়মগুলি সম্বন্ধে তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ—বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী পুষ্প নির্বাচন করিতে হয়। ঠিক তেমনি বিভিন্ন স্থান অনুযায়ী তোমার রচনাভঙ্গীরও যথেষ্ট তারতম্য হইবে। কাজেই পুষ্প রচনা করিবার সময় প্রথমেই তুমি তোমার গৃহের কোন্ অংশের জন্য কি প্রয়োজনে পুষ্প রচনা করিতেছ সেই তথ্যটি সঠিক নির্ণয় করিয়া লইবে। তুমি কি তোমার গৃহের প্রবেশপথটির জন্য পুষ্প রচনা করিবে, কিংবা তোমার খাবার টেবিলটিকে সাজাইবে, নাকি তোমার বইয়ের শেল্‌ফটির উপর একগুচ্ছ পুষ্প রাখিবে—কোন্ স্থানটি তোমার লক্ষ্য, সেইটি আগে স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ তুমি খাবার টেবিলে যে ভাবে পুষ্প রচনা করিবে, বইয়ের শেল্‌ফের উপর ছবির কিনারে হয়ত সে ভাবে করিবে না। ফুলের সৌন্দর্যকে **যদি ফুটাইতে চাও তাহা হইলে প্রতিটি জায়গার জন্য তোমার বিশেষ বিশেষ রচনাভঙ্গীর প্রয়োজন।**

খাবার টেবিলের জন্য যদি পুষ্প রচনা কর তাহা হইলে উহা এমন ভাবে করিবে যাহাতে দৃষ্টির সহিত সমান্তরাল হয়। অত্যধিক উঁচু পুষ্পদান বা পুষ্পস্তবক দৃষ্টির সহজ গতিকে ব্যাহত করিবে। ফুলের আধারটি এমন ভাবে নির্বাচিত করিবে ও ফুলগুলিকে এমন ভাবে সাজাইবে যাহাতে আসনে উপবিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতের স্বাভাবিক দৃষ্টির সহজ গতিপথে পুষ্প-রচনার সম্পূর্ণ ছবিটি ধরা পড়িয়া যায়। অত্যধিক উঁচু বা দীর্ঘ পুষ্পস্তবক অতিথিদের পরস্পরের দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করিয়া আলাপ-আলোচনা ব্যাহত করে। খাবার টেবিলে একটি চ্যাটালো পাত্রে লিলি-জাতীয় ফুল জলে ভাসাইয়াও রাখিতে পার—

ইহাতে ফুলগুলিকে স্বাভাবিক মনে হইবে ও টেবিলের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলির সঙ্গে একটি সহজ সঙ্গতির সৃষ্টি করিবে।

শোবার ঘরে বা পড়ার ঘরে বইয়ের ডেস্কের উপর দেওয়ালে ছবিখানিকে কেন্দ্র করিয়া যদি ফুল সাজাইতে চাও তাহা হইলে ফুলের ডালগুলিকে ততখানি উঁচু কর—যাহাতে দু' একটি ডাল বা পাতা ছবিখানির পিছনে দেওয়ালের উপর গিয়া পড়িতে পারে। উহাতে ছবি, ফুল ও বইয়ের শেল্‌ফ, প্রত্যেকটিকে রমণীয় মনে হইবে। যে-কোনও ঘরে বা যে-কোনও স্থানে ফুল সাজাও না কেন, সেই স্থানের অন্যান্য জিনিসগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই



ফুল ও বইয়ের শেল্‌ফ, প্রত্যেকটিকেই রমণীয় মনে হইবে

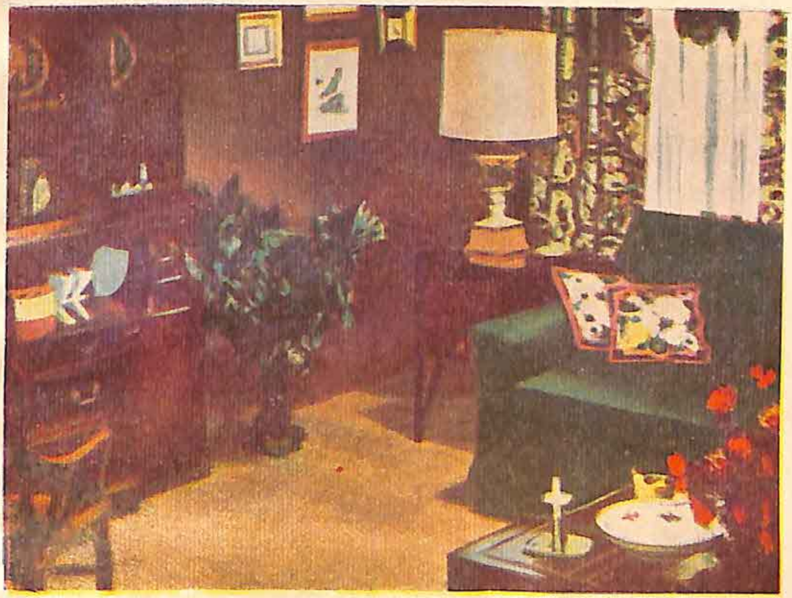
সাজাইবার চেষ্টা করিবে। কারণ তোমার সজ্জা যতই মনোরম হোক না কেন, সেই স্থানের অন্যান্য জিনিসগুলির সহিত যদি উহার কোনও সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি না থাকে তাহা হইলে তোমার পুষ্প-রচনাটিও বিসদৃশ ও বেমানান বোধ হইবে। এই কারণেই স্থান ও সেই স্থানের যে জিনিসগুলির সহিত মিল রাখিয়া তুমি ফুল সাজাইবে সেই জিনিসগুলিও বাছিয়া লইতে হয়।



যাতায়াতের পথে পুষ্প-রচনা করিতে হইলে এমন একটি স্থান বাছিয়া লও যাহা সহজেই চোখে পড়িবে।

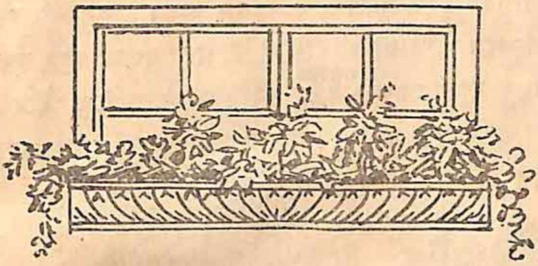


এমন একটি স্তবক রচনা কর যাহার সাহায্যে সেই স্থানটিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলা যাইবে।



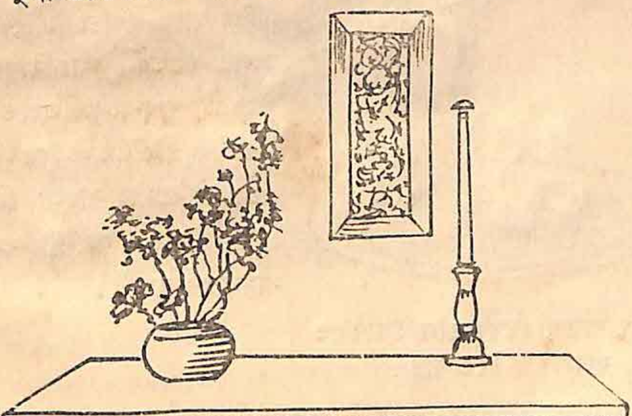
পুষ্প-বিন্যাসে যে কেবলমাত্র পুষ্পই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পুষ্পিত ডাল-পালা, পাতা-বাহার প্রভৃতি দিয়াও গৃহসজ্জা রচিত হইতে পারে। সজ্জিত কক্ষের মধ্যে কিছুটা সবুজ পাতা পরিবেশের মধ্যে যেন অনেকখানি সজীবতা আনিয়া দিয়াছে।

যদি যাতায়াতের পথে কোনও একটি স্থানের জন্য তুমি একটি পুষ্প-স্তবক রচনা করিতে চাও, তাহা হইলে এমন একটি স্থান বাছিয়া লও, যে স্থানটি সকলেরই চোখে পড়িবে। সেই স্থানে ফুলের বিভিন্ন রং ও বৃন্তের সহিত



জানালার কার্নিসে লতা

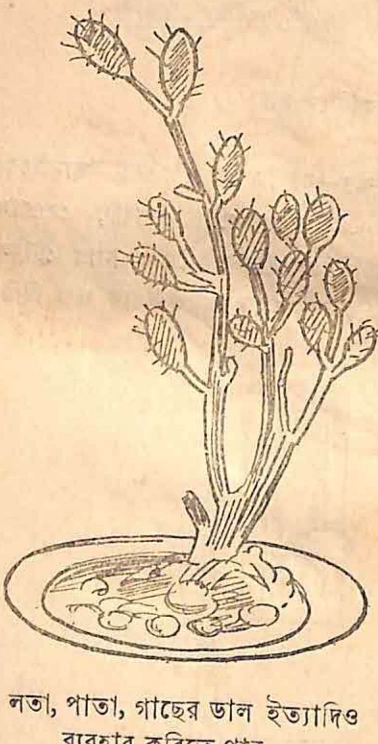
সঙ্গতি রাখিয়া এমন একটি স্তবক রচনা কর—যাহার সাহায্যে সেই স্থানটিকেই উজ্জ্বলতর করিয়া তোলা যাইবে। এই ভাবে ঘরের কোণটি, দেওয়াল, ঝোলানো ঘড়ির নীচেকার জায়গাটি, ছবির নীচটা, বৈঠকখানার টেবিল, শোবার ঘরের জানালার কার্নিস প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গীতে পুষ্পবিন্যাস করিতে পারা যায়।



বৈঠকখানার টেবিলে ফুল

এই সঙ্গে এই কথাটি মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক, তুমি যে সর্বদাই

তোমার চাহিদা অনুযায়ী পুষ্প সংগ্রহ করিতে পারিবে এমন নহে। বেশীর ভাগ স্থলে আমরা ফুল উপহার হিসাবেই পাইয়া থাকি। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ফুলগুলি মাটিতে ফেলিয়া নিরীক্ষণ কর, ঐ ফুলগুলি কোন্ স্থানে মানাইবে— সেই অনুযায়ী ফুলগুলিকে সাজাও ও সংন্যস্ত কর। ফুলগুলিকে ফুলদানিতে সাজাইয়া তারপরে খালি জায়গা বাছিয়া উহাদের সংন্যস্ত করা ফুল সাজানোর রীতি নহে। তা ছাড়া কেবলমাত্র যে ফুল দিয়াই সাজাইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। **তুমি লতা, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি গৃহসজ্জায় ব্যবহার করিতে পার।**



লতা, পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদিও ব্যবহার করিতে পার

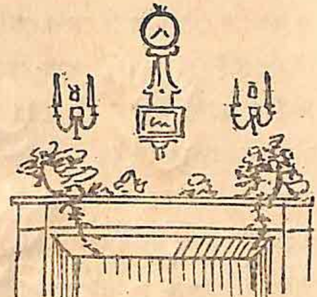
যদিও বিভিন্ন স্থানে পুষ্প-রচনার কতকগুলি ছবি দেওয়া গেল, কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখিবে—ফুল সাজাইবার কোন বিশেষ ভঙ্গী বা নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেওয়া চলে না। তোমার **নিজের রুচি ও মাত্রাজ্ঞান সহকারে তুমি ফুল সাজাইবে।** বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণ অনুযায়ী পুষ্প-রচনার ভঙ্গীও প্রতি-নিয়ত পরিবর্তিত হইবে। তবে প্রত্যেক রচনার সাফল্য নিরূপিত হইবে উহার সঙ্গতি, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের দ্বারাই।

পুষ্প-রচনায় রঙের মিল :—পুষ্প-রচনায় রঙের মিল একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃতির বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। বিভিন্ন ফুলের রঙের সহিত মিল ও সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ ঘটাইয়া গৃহের রূপ ফুটাইয়া তোলা আমাদের কাজ। আধারের রঙের সহিত



অনাড়ম্বর পর্দার গায়ে সংন্যস্ত সবুজ পাতাগুলি নিজেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।
পর্দায় সোনালী রং ও পাতায় সবুজ, দু'য়ের সংস্পর্শে
কক্ষের রূপও আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে।

ফুলের রং মিলানো, সংগৃহীত ফুলগুলির বিভিন্ন বর্ণের সহিত বিভিন্ন বর্ণের সামঞ্জস্য ঘটানো, আবার পর্দা, আসবাবপত্র ও দেওলালের রং ইত্যাদি মিলিয়া ঘরের মধ্যে যে রঙের সৃষ্টি হইয়াছে সেই রঙের সহিত পুষ্প-রচনার রঙের সঙ্গতি স্থাপন করা—**'পুষ্প-রচনায় রঙের মিল'** বলিতে এই সবগুলিকেই বুঝায়।



ঘড়ির নীচে ফুল

কোনও বিশেষ স্থানের জন্য পুষ্প-রচনা করিতে হইলে তুমি প্রথমেই দেখিবে আধারের রঙের সঙ্গে ফুলের রং মিলিয়াছে কিনা। এই কারণেই সহজ, সাদাসিধা, সাধারণত একরঙা আধারগুলিই নির্বাচন করিবার নিয়ম—যাহাতে ফুলের রঙের সহিত আধারের রঙের সহজে অমিল হইতে না পারে। একই পুষ্প-স্তবকে তুমি যদি বিভিন্ন ফুল ব্যবহার কর তাহা হইলে ফুলগুলিকে পর পর মাটিতে ফেলিয়া দেখিয়া লও, উহাদের পরস্পরের মধ্যে রঙের মিল রহিয়াছে কিনা। পাতাগুলির রঙের সহিতও ফুলের রঙের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।



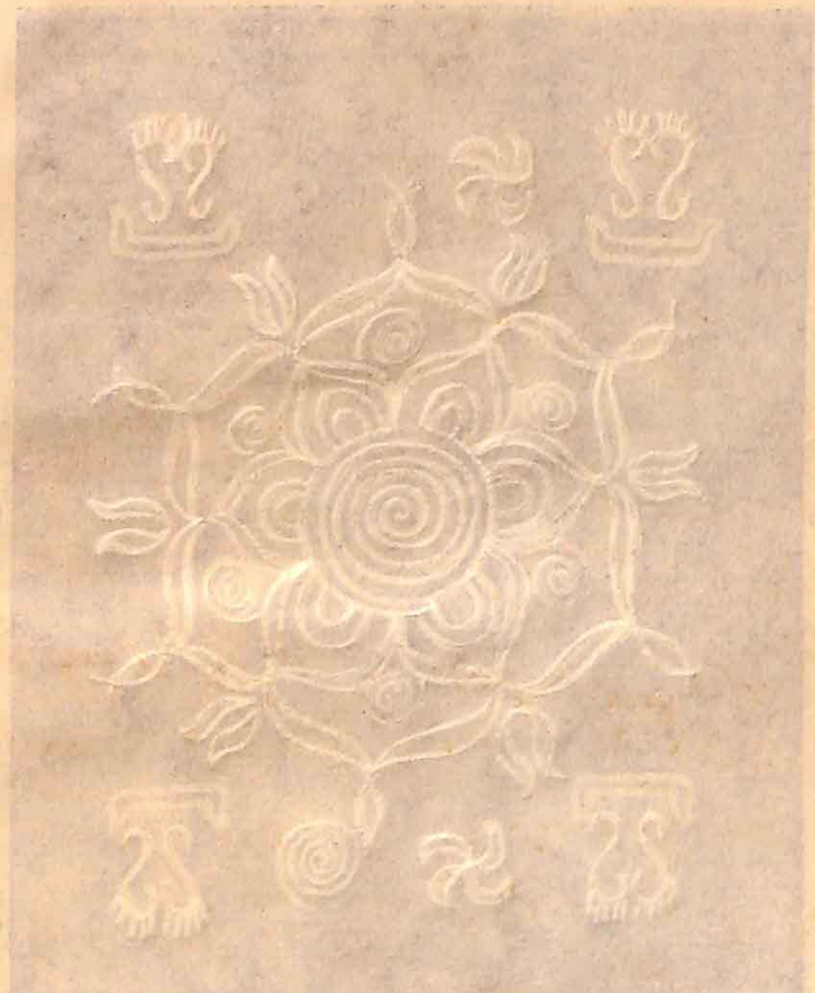
কোন্ সবুজের বুকে পুষ্প-রচনা আরও
পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে

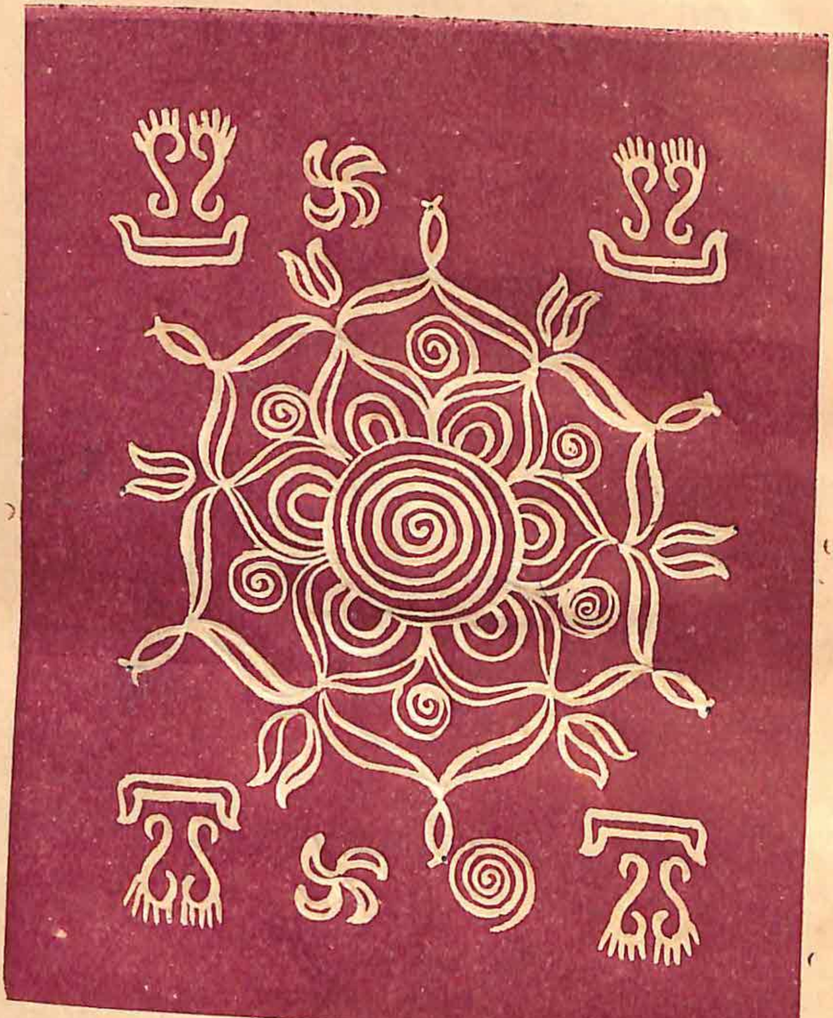
সমস্ত পাতার সবুজ আবার সব সময়ে এক রকম হয় না। কতক সবুজে হলুদ মিশানো থাকে, কতক সবুজে বা নীলের ভাগ বেশী, আবার কতক সবুজ বা

ঘোলাটে সাদা রঙের হইয়া থাকে। সুতরাং বাছিয়া লও, কোন্ সবুজের বুকে তোমার পুষ্প-রচনাটি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। পুষ্প-রচনায় **রঙের মিল ও সঙ্গতি তোমার নিজের চোখ দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে।**

পূর্বেই বলিয়াছি, পুষ্প-রচনা করিতে হইলে দেওয়ালের রং ও অন্যান্য জিনিসপত্রাদি মিলিয়া যে রঙের সৃষ্টি করিয়াছে তোমাকে সেই রঙের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে স্থানের জন্য পুষ্প-রচনা, সেই আবহাওয়ার সহিতই যদি মিল না রহিল, তাহা হইলে সেই রচনা সার্থক হয় কিরূপে? মিলের অর্থ এইখানে একই রকম হওয়া নয়। মিলের অর্থ, ঘরের বা স্থানের আবহাওয়া অনুযায়ী রচনার রঙের পরিবর্তন করিয়া **আবহাওয়াকে প্রভাবিত করা।** যেমন, কোনও কক্ষ যদি নিরানন্দ মনে হয় বা কোনও কক্ষের কোনও অংশ যদি ভারী ও বিষণ্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি ঐ স্থানে একগুচ্ছ হলুদ রঙের ফুল সাজাও। হলুদ রঙের সঙ্গে সোনালী সূর্যকিরণের সাদৃশ্য আছে এবং ঐ পুষ্পগুচ্ছ যথাযথ বিন্যস্ত করিতে পারিলে উহা নিমেষেই ঐ অংশের বিষণ্ণ ভাব দূর করিয়া উহাকে উজ্জল ও মনোরম করিয়া তুলিবে। অপরপক্ষে ঐ কক্ষেই যদি তুমি সুবিন্যস্ত একগুচ্ছ লাল ফুল রাখিয়া দাও তাহা হইলে দেখিবে ঐ আবছা ম্লান আলোর লাল পুষ্পগুচ্ছটির সকল সৌন্দর্যই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ লাল ফুলই যদি সামান্য আলোর বুকে সংন্যস্ত কর, তাহা হইলে দেখিবে ঐ ফুলই উহার প্রখর ঐশ্বর্যে ঝলমল করিতেছে। মিল বলিতে বস্তুত এই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যই বুঝায়। কাজেই দেখিতেছ, কোনও বিশেষ স্থানের জন্য পুষ্প রচনা করিতে সেই স্থানের রং ও আবহাওয়ার বিষয়ও চিন্তা করিতে হয়।







লক্ষ্মীপূজার আলপনা

লক্ষ্য করিলেই দেখিবে মাঝখানের বৃত্তটির কেন্দ্র হইতেই অঙ্কন শুরু হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে পুরো নক্‌শাটি যেন মেঝের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আলপনা

আলপনাও গৃহরঞ্জনের একটি প্রধান উপকরণ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঘরের মেঝে, দেওয়াল, ছাদের খিলান প্রভৃতি ঘরের বিভিন্ন অংশ আলপনার সাহায্যে সজ্জিত করা যায়। আলপনা একটি বিশেষ কারুকলা এবং রূপসজ্জাই ইহার প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ পূজামণ্ডপ, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশপথ প্রভৃতি যে-কোনও জায়গাই হোক্ না কেন, গৃহরঞ্জনের অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ প্রভৃতির অভাবেও কেবলমাত্র আলপনা আঁকিয়াই আলপনার সৌন্দর্যেই উহাকে সুন্দর করিয়া তোলা যায়। তবে অবশ্য আলপনার ইতিহাস দেখিলে দেখা যায় ঠিক গৃহ-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আলপনার সৃষ্টি নয়। তখনকার দিনে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানেই আলপনার একমাত্র চল ছিল। বিভিন্ন পূজাপার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েরা মাঙ্গলিক হিসাবেই পূজার বেদী, গৃহাঙ্গন, গৃহের প্রবেশপথ প্রভৃতি আলপনা দিয়া চিত্রিত করিত। প্রথম প্রথম উহারা শুকনো চালের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াই বিভিন্ন লতাপাতা, নক্‌শা ইত্যাদি আঁকিত। তারপরে ধীরে ধীরে দেওয়ালে ও থামের গায়ে আলপনা দিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত চাউলের গুঁড়ার সহিত জল মিশাইয়া লইবার পদ্ধতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের আলপনায় প্রথম হইতেই বরাবর সাদা রংটারই অধিক চল ছিল, যদিও আজকাল শান্তিনিকেতনে ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন রং মিশাইয়া আলপনা দিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

কাজেই দেখিতেছ, তখনকার দিনে আলপনার ব্যবহার কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে ও বিশেষ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল যেমন গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে যেখানে-সেখানে আলপনার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, তখনকার দিনে আলপনার সেইরূপ চল ছিল না। বস্তুত অজন্তা ও ইলোরার গিরিগুহার দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন রং বিশিষ্ট যে সমস্ত নিখুঁত চিত্রাবলী দেখা যায়, আলপনার ইতিহাসে কোথাও সেইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ প্রায় স্মরণাতীত কাল হইতেই বাংলাদেশের মেয়েরা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন নক্‌শার আলপনা আঁকিয়া আসিতেছেন। দেখিতে গেলে, আলপনা খানিকটা গতানুগতিকভাবে লোকপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। এই কারণেই

একদিকে যেমন উহার মধ্যে মৌলিকতা বা নূতনত্বের অভাব দেখা যায়, অপর-দিকে আবার তেমনি একই লতা বা একই নক্শা পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ করিবার নৈপুণ্যে উহাকে সমৃদ্ধ মনে হয়। বিশেষ করিয়া কোনও রকম মাপ-জোখ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র অঙ্গুলী চালনা ও অঙ্গুলীর সাবলীল ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কয়েকটি মাত্র রেখার সাহায্যে বিচিত্রতর চিত্র ফুটাইয়া তোলা অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কাজ নিঃসন্দেহ। এবং তখনকার দিনে অধিকাংশ মেয়েদেরই শিশু বয়স হইতেই এই ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

বস্তুত এই **পুনরুক্তি** বা **পুনঃকরণ** ও নক্শাগুলির **সমভাবাপন্নতাই** আলপনার বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্মীপূজার আলপনাটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিবে মাঝখানের বৃত্তটির কেন্দ্র হইতেই আঁকা শুরু হইয়াছে—সেই বৃত্তাকার নক্শা বারে বারে সন্নিবেশ করিতে করিতেই যেন মেঝের উপর একখানি আলপনার আঁকা আস্তরণ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আলপনায় ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি অপেক্ষা বৃত্তাকার নক্শারই অধিক চল দেখা যায়। **বৃত্তাকার নক্শাকেই আলপনার প্রাণ** বলা যাইতে পারে। **মাঘমণ্ডল** বা **তারাব্রতের** আলপনাগুলিতেও দেখ—বৃত্তাকার নক্শাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, লোকাচার, মেয়েদের **ব্রতানুষ্ঠান** প্রভৃতি হইতেই আলপনার সৃষ্টি। বিভিন্ন ছড়া ও আলপনার মধ্য দিয়া কখনও কখনও মেয়েরা ব্রতানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুটিকে লিপিবদ্ধ করিত—কাজেই অনুষ্ঠানাদির আলপনার মধ্যে পদ্ম, লতামণ্ডন, ফুলপাতা, নদনদী, পল্লীজীবনের দৃশ্য, পশু, পক্ষী, মাছ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আলপনা দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ছবির মধ্যে বাস্তবিকতাকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা মণ্ডন করিবার প্রচেষ্টাই যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যেমন, নদীর ছবিতে নদীর আসল রূপ ফুটানো অপেক্ষাও নদীটকে একটি মণ্ডন হিসাবে ব্যবহার করিবার দিকেই চিত্রকারিণীর অধিক যত্ন দেখা যায়। এই কারণেই আলপনাকে একটি **মণ্ডনশিল্প** বলা হয়।

কিন্তু পাড় বা লতামণ্ডনের বেলায় এই ব্যবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। আলপনার সমস্ত লতামণ্ডনগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে উহা মেয়েরা নিজেদের মন হইতেই সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতির বিভিন্ন লতাপাতাকে ভিত্তি করিয়াই বাংলার মেয়েরা কলমিলতা, শঙ্খলতা, খুন্তিলতা প্রভৃতি রচনা করে। বাংলার



ভারা ব্রতের আলপনা

এই আলপনাটিতেও বৃত্তের প্রাধান্য লক্ষ্য করিবে।

বৃত্তই বাংলার আলপনার প্রাণ।

লতামণ্ডনে প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতা ও মেয়েদের মনের এই সহজ সাবলীল ভঙ্গী ফুটিয়া উঠে বলিয়াই উহা সূক্ষ্মতায় ও সৌন্দর্যে অন্যান্য সকল প্রদেশের



লতামণ্ডনের বেলায় ব্যতিক্রম দেখা যায়

লতামণ্ডনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের আলপনায় দড়ির ফাঁস, বিন্দু, জ্যামিতিক নক্‌শা প্রভৃতিরই অধিক চল দেখা যায় এবং ঐ সকল অঞ্চলে সাধারণত হলুদ, লাল প্রভৃতি শুক্‌নো গুঁড়োরই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এই কারণেই হয়ত আলপনাও ঐ সকল অঞ্চলে **রঙ্গোলী** নামেই অভিহিত হয়।

প্রাচীন বাংলার এই মণ্ডনশিল্প 'আলপনা' ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে কেমন করিয়া আজ আধুনিক বাংলার গৃহ-প্রসাধনের প্রধান উপকরণের পর্যায়ে



তোমাদের শিল্পী মনকে সুপ্ত হইতে দিও না

আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। আজ প্রতি প্রতিষ্ঠানেই

প্রায় মেয়েদের আলপনা শিখাইবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। মেয়েরা স্বভাবতই শিল্পী মন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিল্প সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা উহাদের অন্তর্নিহিত। এই কারণেই তখনকার দিনের মেয়েরা বিনা শিক্ষায় বিভিন্ন লতাপাতা, নক্‌শা, ফুল ইত্যাদি আলপনার মধ্যে অতি সহজেই ফুটাইয়া তুলিতে পারিত।

তোমরাও বাংলার মেয়ে, তোমাদেরও শিল্পী মন। গৃহ-রচনার ভার তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমাদের শিল্পী মনকে কখনও সুপ্ত হইতে দিও না। পরিচ্ছন্নতায় ও প্রসাধনে ছবির মতন করিয়াই তোমাদের গৃহখানিকে রচনা কর। ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালের গায়ে, ছাদের খিলানে বিভিন্ন ছাঁদের আলপনা আঁকিয়া গৃহখানিকে শ্রীমণ্ডিত কর। আলপনার প্রতি আঁকে অঙ্কিত কর নিজের **মনখানিকে**। প্রসাধনের প্রতি কাজে **নিজের মনকে প্রতিফলিত করাই** গৃহসজ্জার প্রথম সোপান জানিবে।



মাঘমণ্ডলের ব্রত আলপনা
বিভিন্ন জিনিসের ছবি দেওয়া হইয়াছে যদিও—
কিন্তু উহাদের স্বাভাবিকতা অপেক্ষা
মণ্ডনের প্রতিই যেন অধিকতর
লক্ষ্য। আলপনা একটি
মণ্ডন-শিল্প।

গৃহ-পরিচালনা

গৃহকর্মে শ্রমবিভাগ ও সময়-তালিকা

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ গৃহ সমাজের একটি অংশ। কতিপয় গৃহের সমষ্টি হইতেই সমাজের সৃষ্টি। সেই হিসাবে দেখিলে গৃহকেও একটি ছোট-খাট সমাজরূপে কল্পনা করা যায়। সমাজ বড়—বহু লোককে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। গৃহ ছোট, সেইজন্য গৃহের লোকসংখ্যা কম। তাঁতির তাঁত বোনা, চাষীর চাষ করা, ধোপার কাপড় কাচা প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি যেমন বিভিন্ন লোকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, ঠিক তেমনি গৃহেও বিভিন্ন কাজ ও কাজের বিভাগ রহিয়াছে। গৃহের সুষ্ঠু পরিচালনা করিতে হইলে বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তুমি এই বিভিন্ন কাজগুলি পরিবারের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবে। আদর্শ গৃহ তাহাকেই বলে যে গৃহে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, পরিজন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কর্মগুলি যথাসময়ে খুশী মনে করিয়া যায়। গৃহকর্মগুলি গৃহের লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করা ও উহাদের দিয়া খুশী অন্তঃকরণে তুমি কিভাবে ঐ কাজগুলি করাইয়া লইবে উহার দ্বারাই গৃহ-পরিচালনার কাজে তোমার নিজের নৈপুণ্য ও কৌশল নিরূপিত হইবে। বস্তুত গৃহকর্মগুলিকে গৃহের বিভিন্ন লোকের দায়িত্বে যথাযথ ভাগ করিয়া দিবার উপরেই গৃহের সুশৃঙ্খল পরিচালনা নির্ভর করে।

শ্রমবিভাগের উদ্দেশ্য

গৃহ-পরিচালনার ভার যদিও গৃহকর্ত্রীর উপরেই ন্যস্ত থাকে, কিন্তু গৃহের যাবতীয় কর্মই একলা তাঁহার পক্ষে সমাধা করা সম্ভব নহে। কাজেই তুমি যদি গৃহকর্ত্রী হও, সংসারের বিভিন্ন কাজগুলি বিভিন্ন বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও। দেখিবে, তোমার কর্মভার অনেকটা লাঘব হইয়াছে, এবং কর্মের অন্তরালে তোমার কিছুটা অবসরও মিলিয়াছে। **শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক লোকেরই শ্রমের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিশ্রামের।**

সংসারের বিভিন্ন কাজগুলি বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেককেই প্রত্যেকের কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করা—সংসারে যে প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে প্রত্যেককেই সজাগ ও সচেতন করিয়া দেওয়া। সংসারের সকলের সমবেত চেষ্টাতেই গৃহ গড়িয়া উঠে। গৃহকর্মগুলিকে বিভিন্ন কর্তব্যকর্মে ভাগ করিয়া সংসারে বিভিন্ন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে এই বোধকে আরও দৃঢ় করিয়া তোলা।

ইহা ছাড়াও তোমরা জান, গৃহের ধর্মই সংসারের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া সহানুভূতি ও সহযোগিতায় পরস্পরকে পরস্পরের কাছে টানিয়া আনা। সংসারের সমস্ত কাজগুলি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এক একটি যোগসূত্র বলিয়া জানিবে। এক একটি খেলায় যেমন বিভিন্ন লোক অংশ গ্রহণ করে, তেমনি জানিবে, সংসারের এক একটি কাজও বহুলোকের পরিশ্রমে সার্থক হইয়া উঠে। ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির পরস্পর সহযোগিতাতেই এক একটি কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া গৃহকর্মগুলি মানুষের মনের খোরাক যোগায়; কাজে লিপ্ত থাকিলে সংসারের অন্যান্য খুঁটিনাটিতে অযথা মন ক্ষতবিক্ষত ও বিচলিত হয় না। অলস কর্মবিমুখ মনেই যত অবাস্তব চিন্তা জাগিয়া উঠে এবং গৃহের সুখ ও শান্তি নষ্ট করে।

গৃহকর্ম শিশুদের শিক্ষার একটি প্রশস্ত পথ। সুতরাং উহাদের বয়স অনুযায়ী দেহ ও মনের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া গৃহকর্ত্রী উহাদের দ্বারা সম্ভব এইরূপ কাজগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব উহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিবেন। এইভাবে ধীরে ধীরে গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই উহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণগুলির উন্মেষ হইতে থাকিবে।

শ্রম-বিভাগ :—

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দাসদাসী-পরিবৃত বৃহৎ সংসার। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়, অনাত্মীয়, আশ্রিত প্রভৃতি বহুলোক অনেক সময় একসঙ্গে একই সংসারে বসবাস করিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সতর্কতা ও বিবেচনা সহকারে কাহার কি

কর্তব্য উহা নিরূপণ করিতে হয়। দাসদাসীর প্রাচুর্য আমাদের দেশেই দেখা যায়। কিন্তু দাসদাসী আছে বলিয়া সংসারের যাবতীয় কাজ উহাদের উপর চাপাইয়া নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া দিনাতিপাত করিব ইহা জীবনের লক্ষ্য নয়। উহারা প্রত্যেকেই মানুষ—তোমারই মতন সুখ-দুঃখ বোধ উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া নিজের কাজ যতদূর সম্ভব নিজেই সম্পন্ন করিবে। উহাদের দ্বারা, রান্না ইত্যাদি, যাহাকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই কাজগুলিই করাইয়া লইবে। পশ্চিমের দেশগুলিতে দাসদাসীর কাজের জন্য লোক একরকম দুষ্প্রাপ্য বলিলেও



প্রত্যেক কাজই সমান সম্মানজনক

চলে। সেই সমস্ত দেশে প্রত্যেক গৃহেই প্রত্যেকের কাজ নিজেকে করিয়া লইতে হয়,—উহা দাসদাসীর কাজ, ইহা আমার কাজ, এইরূপ কোনও পার্থক্য নাই। **প্রত্যেক কাজই সমান সম্মানজনক মনে করিবে**—সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে যে কাজই করা হোক না কেন, উহার মধ্যে অগৌরবের কিছু থাকিতে পারে না। গৃহ-প্রসাধন, গৃহের পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি গৃহকর্মের প্রধান বিভাগগুলিতে, যে সমস্ত কাজে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন সে কাজগুলি সাধারণত গৃহের পুরুষদেরই করণীয়। শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি বয়স্ক ব্যক্তিদের সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ হইতে বিরত রাখাই তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু মনকে

প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে ও সংসারে নিজেদের প্রয়োজন এই বোধ জাগাইবে অথচ পরিশ্রম হইবে না—এইরূপ কতকগুলি কর্ম তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিবে। প্রতি পদেই তাঁহাদের অনুভব করিতে দিবে যেন তাঁহাদের ছাড়া সংসার চলে না। আশ্রিত-পরিজনদের কাজগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিবে যাহাতে তাঁহারা মনে করিতে না পারেন—তোমার গৃহে আশ্রিত বলিয়াই তুমি তোমার সংসারের যাবতীয় কাজ তাঁহাদের দিয়াই করাইয়া লইতেছ। আবার, তুমি যদি কোনওরকম কর্তব্যকর্মই তাঁহাদের না দাও, তাহা হইলে তাঁহারা যে আশ্রিত এই বোধই সর্বদা তাঁহাদের মনে জাগরূক থাকিবে। গৃহ-প্রসাধন ইত্যাদি কাজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কর্তব্য অনেক। ঘর পরিষ্কার করা, গুছাইয়া রাখা, সাজানো, বিছানা করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজগুলি ছোটরাই করিতে পারে। রান্না করা, কাপড় কাচা, পরিবেশন ইত্যাদি কাজেও ছেলেমেয়েরাই মায়ের সাহায্য করিবে। বাগানের কাজেও ঘরের ছেলেমেয়েরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে গৃহকর্মগুলির বিভিন্ন বিভাগ করিয়া বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী গৃহের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারিলে দেখিবে, তোমার গৃহও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইবে এবং গৃহের অধিবাসীদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইবে না।

সময়-তালিকা:—সাধারণত বলা হইয়া থাকে—পুরুষ উদয়াস্ত, অর্থাৎ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, কিন্তু মেয়েদের কাজের যেন কোনও শেষ নাই—উহাদের সংসারের চাকা ঘুরিয়া ঘুরিয়াই চলে। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে যথার্থ সত্য নাই। মেয়েদের কাজও বিরামহীন নয়। কেবল যথাযথ পরিকল্পনা ও অবস্থার অভাবেই উহাদের কাজগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে একটানা একটার পর একটা চলিতে থাকে। গৃহকর্মগুলির সুশৃঙ্খল পরিচালনা করিতে হইলে, অর্থাৎ প্রত্যেকের শ্রম ও বিশ্রামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গৃহকর্মগুলির ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমেই প্রয়োজন একটি কাজের **সময়-তালিকা**। বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ঠিক সময়ে যথাযথ সমাধা হয় একমাত্র সময়-তালিকার সাহায্যেই। গৃহের সময়ও সীমাবদ্ধ, উহা অফুরন্ত নয়। কিন্তু গৃহের কার্যাবলীর সংখ্যা আরও অনেক অধিক এবং উহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। সুতরাং গৃহে গৃহকর্মের জন্য সময়-তালিকার প্রয়োজন হইবে ইহা আর বিচিত্র কি!

সময়-তালিকা তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমেই ভাবিয়া লইবে—কোন্ কোন্ কাজগুলি তোমার প্রত্যহই করিতে হয়। যেমন—রান্না করা, খাওয়া, বিছানা করা ইত্যাদি। সংসারের কাজগুলির মধ্যে প্রত্যহ করিতে হয় না, সপ্তাহে একবার করিলেও চলে, এইরূপও বহু কাজ থাকে; যেমন—সংসারের আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা, কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা ইত্যাদি। এইরূপ এক একটি কাজের জন্য সপ্তাহে এক একটি দিন ধার্য করা যায়; যেমন—রবিবারে কাপড় কাচা—সোমবারে ঘর সাফ করা ইত্যাদি। আরও কতকগুলি কাজ থাকে যেগুলি মাসে একবার করিলেও চলে; যেমন—তোলা বাসন-কোসনগুলি পরিষ্কার করা, গরম কাপড় রোদে দেওয়া ইত্যাদি। এইভাবে সংসারের বিভিন্ন কাজগুলির প্রথমে তালিকা তৈয়ারী করিয়া লও। প্রতিদিন যে কাজগুলি করিতে হয় এবং যেগুলির জন্য মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় আছে, যেমন—রান্না, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি, সেইগুলিকে সে সময়ে ফেলিয়া অন্য কাজগুলির জন্য তোমার সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করিয়া লও। সপ্তাহের বিশেষ কাজগুলির জন্য এক একটি বিশেষ দিন ধার্য করিয়া ফেল ও প্রতিদিনের কাজের তালিকার সহিত দিন ও সময় অনুযায়ী ঐ কাজগুলিকেও জুড়িয়া দাও। এইভাবেই গৃহকর্মের সময়-তালিকা তৈয়ার করিতে হয়। নীচে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাজগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

দৈনিক কাজ :—

১। শয়নঘর, বৈঠকখানা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহৃত ঘরগুলির পরিচ্ছন্নতা (ঝাড়ু দেওয়া, মোছা ইত্যাদি)

২। স্নানের ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদির যত্ন করা

৩। আহার্য তৈয়ার ও গ্রহণ করা

৪। বাসন-কোসন ধোওয়া

সাপ্তাহিক কাজ :—

১। উপরের তলা পরিষ্কার করা

২। নীচের তলা পরিষ্কার করা

৩। কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা

৪। জামা-কাপড় সেলাই করা

মাসিক কাজ :—

১। তোলা বাসন-কোষন পরিষ্কার করা

২। গরম কাপড়-চোপড় ইত্যাদির তদারক করা

৩। বই ইত্যাদি গোছানো

৪। জামা-কাপড় মেরামত করা

গৃহের কীট-পতঙ্গাদি ও উহাদের দূর করিবার উপায়

গৃহের প্রতিটি অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও আলোবাতাসযুক্ত রাখিবে ; খাদ্যদ্রব্যাদি কখনও আঢাকা বা অপরিষ্কার বাসন-কোসন ইত্যাদিতে রাখিবে না। ভুক্তাবশিষ্টগুলিও চারিদিকে ছড়াইবে না। কীটপতঙ্গাদি দূর করিবার এইগুলিই প্রধান নিয়ম জানিবে।



পোকা-মাকড় দুর করিতে ফ্লিট, ব্লিচিং পাউডার, ডি-ডি-টি, ফিনাইল ইত্যাদি ব্যবহার করিবে

পিপড়া, আরশুলা, গুবরে পোকা প্রভৃতি অত্যন্ত নোংরা জায়গায় থাকে ও সেখান হইতে নানান রকম আবর্জনা ও রোগজীবাণু প্রভৃতি গৃহে লইয়া আসে। আরশুলা প্রভৃতির উপদ্রবে গৃহের বাসিন্দাদের প্রায়ই অস্থির হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আজকাল বাজারে অনেক পোকা মারিবার পাউডার পাওয়া যায়, সেইগুলি আনিয়া ব্যবহার করিবে। ডি-ডি-টি পাউডার বা বোরাক্স-এর ব্যবহারে আরশুলা, পিঁপড়া, ঝিঁঝিঁপোকা, ইত্যাদি বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। ঝিঁঝিঁপোকা, পিঁপড়া ইত্যাদির উপদ্রব দূর করিবার জন্য অনেকে মেঝের ফাটল বা ফাঁক ইত্যাদির মধ্যে অ্যালাম-মিশ্রিত গরম জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেংটি ইঁদুর, ইঁদুর প্রভৃতিও বাহিরের ড্রেন, ডাস্টবিন, পায়খানা ইত্যাদি হইতে নানান দূষিত পদার্থ ও রোগজীবাণু গৃহে বহন করিয়া আনে ও গৃহের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। ইদুর মারিবার জন্য অনেকে **ইঁদুর-কল** ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে আবার খাদ্যদ্রব্যাদির সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়াও ইদুর মারিবার প্রয়াস পান। কিন্তু ইঁদুর যাহাতে গৃহে না আসে সর্বাগ্রে তাহার জন্যই সকলের সচেতন হওয়া আবশ্যক। ড্রেনের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দাও, ঘরের মধ্যে বাহির হইতে প্রবেশ করা যায় এইরূপ গর্ত ইত্যাদি থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া দাও। খাদ্যদ্রব্যাদি কখনও কোথাও ছড়াইয়া রাখিও না।

মাছি—মশা, মাছি ইত্যাদি পোকা-মাকড়গুলি গৃহের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতি রোগের জীবাণু মাছি দ্বারাই বাহিত হয় ও খাদ্য, পানীয় ইত্যাদিতে ছড়াইয়া পড়ে। র‍্যাট ফ্লি (Rat flea) মাছির ন্যায় একরকম বিশেষ ধরণের পোকা প্লেগের জীবাণু সংক্রামিত করে। তোমরা জান আবর্জনাযুক্ত জায়গাগুলিতে মাছি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ডিম উহারা একই সঙ্গে একই জায়গায় পাড়ে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকটি ডিম এক একটি মাছিতে পরিণত হয়। সুতরাং মাছি মারা অপেক্ষাও মাছি যাহাতে জন্মাইতে না পারে তৎপ্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কাজেই তোমার গৃহ ও গৃহ-পরিবেশকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখিবে। আবর্জনাগুলি কোনও একটি পাত্রে ফেলিয়া মুখে আঁট ঢাকনি দিয়া দিবে। গ্রামদেশে সাধারণত

ফ্লাশ পায়খানা থাকে না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তোলা পায়খানায় সর্বদাই মলের উপর ছাই বা বালি ফেলিয়া রাখা উচিত, যাহাতে মাছি বসিতে না পারে। গৃহের আশেপাশে বা গৃহের মধ্যে **ফিনাইল জল** ছড়াইতে পার, উহাও মাছির



ফিনাইল মাছির প্রতিরোধক

প্রতিরোধক। গৃহে মাছির উৎপাতে অনেকেই মাছি মারিবার জন্য একরকম **আঠাযুক্ত কাগজ** ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনেকে আবার দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সহিত **ফরম্যালিন-জাতীয় বিষ** ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেন।

মশা—মশার উৎপাতও প্রায় গৃহেই দেখা যায়। মশা দুই রকমের হইয়া থাকে, **অ্যানোফিলস ও কিউলেক্স**। অ্যানোফিলিস মশাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। মাছির ন্যায় এই মশাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইহারাও ১০০ হইতে ২৫০টি ডিম একসঙ্গে পাড়ে। সাধারণত জলা জায়গাতেই ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। সুতরাং মশা মারা অপেক্ষাও মশা যাহাতে জন্মাইতে না পারে তৎপ্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। গৃহের আশেপাশে কোথাও জলাভূমি রাখিতে নাই। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে ডোবাগুলি ভরাট করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত। খোলা ড্রেনের মধ্যে কেরোসিন ঢালিয়া দাও—

কেরোসিনের মধ্যে মশার ডিম বাড়িতে বা বাঁচিতে পারে না। গৃহে মশার প্রাদুর্ভাব হইলে মশারি খাটাইবে, কিন্তু মনে রাখিও মশা কালো রং ভালবাসে। সুতরাং কালো মশারি বা পর্দা ইত্যাদি কখনও ব্যবহার করিও না। **ফ্লিট** পাম্প করিয়া দিলে মশা-মাছি ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় ইত্যাদির উপদ্রব কমিয়া যায়। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া **ধূপধুনো, তামাক, মশক-নিবারণী ধুনো** ইত্যাদি জ্বালাইলে উহার ধোঁয়ায়ও মশা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।



ফ্লিট পাম্পে মশার উপদ্রব কমে

কুকুরের গায়ের পোকা, ছারপোকা প্রভৃতিও গৃহের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতায় ব্যাঘাত ঘটায়। দেওয়ালের ও মেঝের ফাটলগুলির মধ্যে **কেরোসিন তেলের দ্রাবক** তৈয়ারী করিয়া উহা ঢালিয়া দিতে পার। কেরোসিন তেলের দ্রাবক তৈয়ারী করা তেমন কঠিন নয়। সামান্য গরম সাবানজলের সহিত কেরোসিন তেল মিশাইয়া লও। এই মিশ্রিত পদার্থটি দু' চামচ লইয়া জলের সহিত মেঝেয় বা দেওয়ালের ফাটল ও ফাঁক ইত্যাদির মধ্যে ঢালিয়া দাও। দেখিবে ইহাতেই এই পোকাগুলি মরিয়া যাইবে।



গরম জলে ছারপোকা মরিয়া যায়

ছারপোকা—মশা-মাছির ন্যায় প্রায় প্রতি গৃহে ছারপোকার উৎপাত

কম নয়। ছারপোকা সাধারণত খাট, চৌকি, চেয়ার ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকেই জন্মাইয়া থাকে। খাটের ফাঁকে **গরম জল ঢালিয়া** ছারপোকা মারিবার বিষয়ে তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। মাছি, কুকুরের গায়ের পোকা ইত্যাদির ন্যায় ছারপোকারও জন্মস্থান অপরিচ্ছন্ন ময়লা বিছানাপত্র ইত্যাদি। সুতরাং ছারপোকা দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে শয্যাদ্রব্যগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা প্রয়োজন। ছারপোকা মারিতে অনেকে পূর্বের বর্ণিত উপায়ে তৈয়ারী **কেরোসিন তেলের দ্রাবকও** ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উকুন—আমরা কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুগুলির গায়ের পোকার কথাই আলোচনা করিলাম, কিন্তু মানুষের গায়েও অনুরূপ কোনও পোকা কখনও দেখ নাই কি? তোমরা নিশ্চয়ই উকুন দেখিয়াছ, উকুনই মানুষের গায়ের পোকা। উকুন সাধারণত মানুষের চুলের মধ্যেই হইয়া থাকে এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাথা ছাইয়া ফেলে। চুলেই উকুনের জন্ম ও বাসস্থান এবং চুলের মধ্যেই উহারা ডিম পাড়ে। মানুষের দেহে ও কাপড়-চোপড়ে অত্যধিক ময়লা জমিলে দেহেও উকুনেরই মতন এক রকম পোকা হয়। উকুন নানান রকম চর্মরোগ ও টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু বহন করে। উকুনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে প্রথমেই নিজের দেহ ও পরিচ্ছদাদির পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হইবে। মাথায় উকুন হইলে উকুনের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই চুল কাটিয়া ফেলেন। আবার অনেকে **লাইসল, ডেটল** প্রভৃতির জল দিয়া চুল ধুইয়া ফেলেন।

কাপড়-কাটা কীটাদি—কাপড়-কাটা পোকাগুলির কথা আলোচনা না করিলে গৃহের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গাদির আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে এই কাপড়-কাটা পোকাগুলি একরকম স্থায়ী উপদ্রব হিসাবেই দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে খয়েরী রঙের প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি পোকা আছে। দেখিতে গেলে মনে হয়, ইহারা যেন লাফাইয়া লাফাইয়াই চলে। আর কতকগুলি দেখিতে রূপোলী, চকচক করে ও মাছের মতন বাঁকানো। এই খয়েরী ও রূপোলী পোকা সব রকম কাপড়ই কাটিয়া ফেলে, কিন্তু সাধারণত খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পরিচ্ছদাদিতেই যেন উহাদের ঝোঁক কিছুটা বেশী। আর কতকগুলি পোকা আছে উহারা কেবল গরম কাপড়ই কাটে। এই পোকাগুলির হাত হইতে গরম জামা-কাপড়-

গুলিকে বাঁচাইতে হইলে, কাপড়গুলি হইতে প্রথমে **পেট্রলের সাহায্যে** তৈলাক্ত দাগ ইত্যাদি উঠাইয়া কাপড়গুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।



ন্যাপথালিন ইত্যাদি দিয়া রাখিয়া দিবে

তৈলাক্ত দাগযুক্ত অংশই এই পোকারা প্রথমে কাটিতে আরম্ভ করে। **নিমপাতা, কর্পূর, ন্যাপথালিন, তামাক-পাতা** প্রভৃতি কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিলে পোকা সহজে আসে না।

যেগুলি সর্বদা ব্যবহার কর না এইরূপ গরমকাপড়গুলি আঁট ঢাকনিযুক্ত টিনের ট্রাঙ্কের মধ্যে কর্পূর, ন্যাপথালিন ইত্যাদি দিয়া রাখিয়া দিবে। পোকায় যদি কাটিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত পোকা বাছিয়া কাপড়গুলি রৌদ্রে দিবে এবং ট্রাঙ্কটি ঝাড়িয়া উহার ভিতরটা কেরোসিন-মাখা ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া লইবে। তারপরে ট্রাঙ্ক রৌদ্রে দিয়া উহার মধ্যে **পাইরেথ্রাম** (Pyrethrum) **পাউডার** দিয়া কাপড়গুলি উঠাইয়া রাখিবে। কয়েক দিন অন্তর অন্তর এইরূপ করিলে সহজেই গরম কাপড় হইতে গরম কাপড় কাটার পোকাগুলি দূর করিতে পারিবে।

বিভিন্ন ধাতুর জিনিসপত্রাদি পরিষ্কার করিবার উপায়

প্রায় প্রতি গৃহেই কিছু-না-কিছু বিভিন্ন ধাতুনির্মিত জিনিসপত্রাদি দেখা যায়। যথাযথ উপায়ে ইহাদের যত্ন লওয়া ও পরিষ্কার করার উপরেই ইহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কোন্ কোন্ ধাতুনির্মিত বাসন কিভাবে পরিষ্কার করিতে হয় উহা তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যই জিনিসগুলির সমস্ত ময়লা দূর করিয়া জিনিসগুলিকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া উহাদের সৌন্দর্য বর্ধন করা।

বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। এখন দেখা যাক্, কোন্ ধাতু তোমরা কোন্ জিনিসের প্রয়োগে সহজে পরিষ্কার করিতে পারিবে। ধাতুদ্রব্যগুলিকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি—**নরম ধাতু নির্মিত দ্রব্য ও কঠিন ধাতু নির্মিত দ্রব্য।** নরম ধাতু বলিতে আমরা সেই ধাতুগুলিকেই বুঝাই যাহাতে সহজেই দাগ বা আঁচড় ইত্যাদি পড়ে, যেমন—তামা, এনামেল, রূপা, টিন ইত্যাদি। কঠিন ধাতু সেইগুলিই জানিবে, যেগুলিতে সহজে দাগ ইত্যাদি পড়ে না, যেমন—পিতল, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি।

এনামেল—আজকাল বেশীর ভাগ গৃহেই রন্ধন ও অন্যান্য কাজে এনামেল-পাত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এনামেলের পাত্রগুলির লেপ অত্যন্ত পাতলা ও হালকা হইয়া থাকে। এই কারণেই উহা সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। এনামেলের পাত্র খুব উত্তপ্ত হইলেও জায়গায় জায়গায় উহার লেপগুলি চটিয়া যাইতে পারে। বস্তুত এনামেলের পাত্র রন্ধন করিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত, তবে রন্ধন করা জিনিসগুলি উহাতে ঢালিয়া রাখিতে পার। এনামেল-পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে গরম জল ও সোডা দিয়া উহার ভিতরে-বাহিরে ধুইয়া ফেলিবে, পরে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া রাখিবে।

অ্যালুমিনিয়াম—অ্যালুমিনিয়ামের দাম অপেক্ষাকৃত কম। বাসনও হালকা। ইহা সহজে উত্তপ্ত হয় এবং তাপও অধিকক্ষণ সংরক্ষণ করে, এই সকল কারণে

অ্যালুমিনিয়ামের চলও অধিক। চায়ের কেটলি, ভাজিবার সস্প্যান প্রভৃতি অ্যালুমিনিয়ামেরই তৈয়ারী। অ্যালুমিনিয়ামের অসুবিধা এই যে, ক্ষার পদার্থের সংস্পর্শে আসিলেই উহার সহজে ক্ষয় হয়। এই কারণে অ্যালুমিনিয়ামের বাসন **কখনও সোডার জলে ধুইতে নাই।** সোডার সংস্পর্শে আসিলেই অ্যালুমিনিয়াম কালো হইয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম-পাত্র পরিষ্কার করিতে হইলে পাতলা সাদা ছাই, অথবা **মিহি খড়ির গুঁড়া** ব্যবহার করিবে। খড়ির গুঁড়া সামান্য ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশাইয়া পাত্রটির গায়ে লাগাইয়া রাখ। পরে শুকাইয়া গেলে একখানি শুকনো কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে আলগা হাতে ঘষিয়া পালিশ কর। পাতলা মিহি ছাই দিয়া মাজিয়াও অনুরূপ উপায়ে ঘষিয়া পালিশ করিতে পার।

তামা—তামার পাত্র বেশীর ভাগ পূজার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্যে তাম্রপাত্রটিকে ডুবাইয়া লও। পরে সামান্য জলের



খড়ির গুঁড়া পাত্রটির গায়ে মাখাইয়া দাও

মধ্যে খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া ঐ নরম পদার্থটিকে পাত্রের গায়ে মাখাইয়া দাও। পরে এক টুকরা কাপড় লইয়া পূর্বোক্ত উপায়ে হাল্‌কা হাতে আস্তে আস্তে পাত্রটি ঘষিয়া পরিষ্কার কর। তামার যে সকল বাসন-কোষনাদি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়, উহা **লেবু, তেঁতুলের জল** বা **ভিনেগার** ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কার করা যায়।

পিতল—প্রায় প্রতি গৃহেই পিতলের বাসনের চল দেখা যায়। পিতলের গায়ে অত্যন্ত গভীরভাবে কোনও দাগ লাগিলেও দেখিবে সামান্য **লেবুর রস,**

নুন কিংবা **তেঁতুল** মাখাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া ভাল করিয়া মাজিয়া ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলিলেই ঐ দাগ উঠিয়া যায়। লবণ ও ভিনেগার-সংযোগেও



ব্রাসো লাগাইয়া পালিশ কর

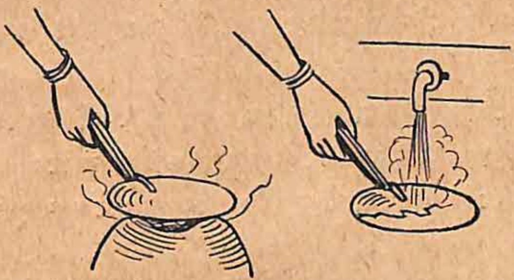
পিতলের পাত্র পরিষ্কার হইয়া যায়। পরে সামান্য ব্রাসো (brasso) বা খড়ির গুঁড়া ইত্যাদি লাগাইয়া পূর্বের বর্ণিত উপায়ে ধীরে ধীরে পালিশ করিবে।

কাঁসার পাত্র—৭ ভাগ তামা ও ১ ভাগ টিন মিশাইয়া কাঁসা তৈয়ারী হয়। ইহার সহিত দস্তাও কিছু পরিমাণে মিশান থাকে। কাঁসা পিতল অপেক্ষা দেখিতে উজ্জ্বল। অধিক উত্তপ্ত করিলে কাঁসার পাত্র ফাটিয়া যাইতে পারে। তামা বা পিতলের পাত্র যে যে ভাবে পরিষ্কার করিয়া থাক, কাঁসার পাত্র পরিষ্কার করিতে সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে।

ব্রঞ্জ (Bronze)—কলিকাতায় ময়দানে, ও অনেক রাস্তার চৌমাথায় অনেক বড় বড় লোকের মূর্তি আছে তোমরা জান। সেইগুলি কিসের তৈয়ারী ধরিয়া দেখিয়াছ কি? উহার বেশীর ভাগই ব্রঞ্জ-এর তৈয়ারী। কয়েকটি ধাতুর সংমিশ্রণেই ব্রঞ্জের সৃষ্টি। ব্রঞ্জের জিনিসও তোমরা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উহাতে খড়ির গুঁড়া মাখাইয়া এক টুকরা কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে পার।

লৌহ—লৌহপাত্র অত্যন্ত ভারী বলিয়া উহা আনা নেওয়া বা নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হয়। তথাপি রন্ধনগৃহে লৌহপাত্রের কিছু-না-কিছু ব্যবহার দেখা যায়। রান্নার কড়াই, রুটি সেঁকিবার তাওয়া ইত্যাদি সাধারণত লৌহেরই হইয়া থাকে। অত্যধিক উত্তপ্ত লৌহপাত্রে কখনও

ঠাণ্ডা জল দিবে না, উহাতে লৌহপাত্রটি ফাটিয়া যাইতে পারে। লোহার বাসন



লৌহপাত্রটি ফাটিয়া যাইতে পারে

ইত্যাদি ধুইবার পর পরিষ্কার ভাবে মুছিয়া রাখিবে, নতুবা উহাতে মরিচা ধরিতে পারে।

ইস্পাত—ছুরি ইত্যাদি ইস্পাতেরই তৈয়ারী। কিছু কাটিবার পরেই ছুরির ফলায় দাগ ধরিয়া যায়। সুতরাং ব্যবহারের পরেই ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি ধুইয়া ফেলিবে, কিন্তু উহাদের হাতলগুলি কখনও জলে ডুবাইবে না, কারণ উহাতে হাতলগুলির রং চটিয়া যাইবে—জায়গায় জায়গায় হাতলগুলি ফাটিয়াও যাইতে পারে এবং গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে ফলা হইতে উহাদের জায়গায় জায়গায় আলগা হইয়া খুলিয়া আসাও বিচিত্র নয়। সুতরাং ব্যবহার করিবার পরে ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি যখন জলে ডুবাইবে, খেয়াল রাখিবে হাতলগুলি যাহাতে জলের উপরে থাকে। ফলাগুলি যদি পরিষ্কার করিতে চাও, তাহা হইলে একটি আলু দু'টুকরা করিয়া কাটিয়া উহাতে সামান্য **বাথ ব্রিক** (bath brick)-এর পাউডার লাগাইয়া ফলাটিতে ঘষিয়া দাও, পরে পরিষ্কার করিয়া গরম জলে ধুইয়া মুছিয়া লও। শান-পাথরে সামান্য বাথ-ব্রিকের গুঁড়া দিয়া ছুরিখানি উহাতে শান দিয়া লইতে পার। বাথ-ব্রিক আর কিছুই নয়, ধাতু পরিষ্কার করিবার একরকম বিশেষ উপকরণ। শান দেওয়া প্রভৃতি কাজেও এই জিনিসটির যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। হাতলগুলি পরে একখানি ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া লইবে।

কাঁটা, চামচ ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার আরও একটি উপায় আছে। একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে গরম জলের মধ্যে কিছুটা নুন ও সোডা মিশাইয়া

উহার মধ্যে এই জিনিসগুলি দিয়া দু'এক মিনিট ফুটাইয়া লও। দেখিতে দেখিতে উহাদের পূর্বের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসিবে।

বিভিন্ন ধাতু পরিষ্কার করিতে নীচের নিয়মগুলি মোটামুটি মনে রাখিবে :—

(১) যে-কোন ধাতুর বাসনই পরিষ্কার কর না কেন, উহা প্রথমেই গরম জলে ডুবাইয়া উহা হইতে সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থগুলি দূর করিবে।

(২) পালিশের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে পাত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া লইবে।

(৩) ময়লা দূর করিবার জন্য বা বাসনগুলিকে পরিষ্কার করিবার জন্য যে-কোনও পদার্থই ব্যবহার কর না কেন, খেয়াল রাখিবে—উহা যেন সম্পূর্ণরূপে সেই পাত্রটি হইতে মুছিয়া লওয়া হয়।

(৪) পরিষ্কার করিবার জায়গার চারিধারে কাগজ বা কাপড় পাতিয়া লইবে যাহাতে পরিষ্কার করা জিনিসগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিতে না হয়।

মরিচা পড়া ও জলের দাগ

তোমরা প্রত্যেকেই দেখিয়াছ, কিছুদিন বাহিরে রাখিয়া দিলেই লোহায় মরিচা পড়ে। কিন্তু মরিচা কি এবং উহা কোথা হইতে আসে কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? মরিচা যে কেবলমাত্র লোহাতেই পড়ে তাহা নহে, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুগুলিতেও মরিচা পড়িতে দেখা যায়। মরিচা-পড়া জিনিস সামান্য ঘষিলেই দেখিতে পাইবে, একরকম লালচে চূর্ণ-জাতীয় পদার্থ উহা হইতে উঠিয়া আসিতেছে। ইহাকেই আমরা বলি **মরিচা**। লোহা যখন বায়ুর আর্দ্রতা ও বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে তখনই উহার গায়ে এই লাল চূর্ণগুলি জমিতে থাকে। লোহার পেরেক বা অন্য কোনও জিনিস যদি কয়েকদিন বাহিরে হাওয়ায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে উহার গায়ে এই মরিচার একটি পুরু আবরণ পড়িয়া যায়। কিন্তু পেরেকগুলি যদি কিছু কেরোসিন বা অন্য কোনও তেলের মধ্যে ডুবাইয়া একটি পাত্রে করিয়া বাহিরে হাওয়ায় রাখিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে বহুদিন পরেও উহাতে মরিচার দাগ পড়িবে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তেলের পুরু স্তর বা আবরণ ভেদ করিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না—এবং লোহার পেরেকগুলিও বায়ুর অক্সিজেন ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসে না, সুতরাং উহাতে মরিচাও পড়ে না। এই কারণেই অনেক ক্ষেত্রে লোহার কল-কব্জা ও ছোট-খাট জিনিসগুলিতে **ভ্যাসিলিন** বা অন্যান্য তৈলাক্ত জিনিস (Grease) প্রভৃতি মাখাইয়া রাখিতে দেখা যায়।

গ্রামদেশে অনেকস্থলেই দেখা যায় গৃহস্থের বাড়ীর ছাদ ও দেওয়ালগুলি ঢেউখেলানো টিনের তৈয়ারী। এই টিনগুলিও যদি অনাবৃত ও কোনও রকম লেপহীন অবস্থায় হাওয়ায় কিছুদিন পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে উহাতেও মরিচা পড়িয়া যায়। এই কারণেই গৃহস্থেরা অনেক সময়ে আলকাতরা বা অন্যান্য তৈলাক্ত রং (Paints) ইত্যাদির দ্বারা টিনের উপর একটি লেপ দিয়া রাখেন। তোমরা প্রশ্ন করিতে পার টিনে মরিচা পড়িবে কেন? তোমরা হয়তো জানো না, একখানি লোহার পাতের উপর দস্তার লেপ লাগাইয়াই এই ঢেউখেলানো টিনগুলিই তৈয়ারী হয়। বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও আর্দ্রতার

সংস্পর্শে আসে বলিয়াই দস্তায় মরিচা পড়ে। অপরপক্ষে তুমি একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে—সোনা, রূপা ও দাগ পড়ে না এমন ইস্পাত (stainless steel) প্রভৃতি ধাতুগুলি হাওয়ার সংস্পর্শে আসিলেও উহাতে কখনও মরিচা পড়ে না। কাজেই দেখিতেছ, বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসিলেই কতকগুলি ধাতুতে মরিচা পড়ে এবং লোহা উহার মধ্যে একটি। তামা বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসায় 'কপার অক্সাইড'-এর (Copper oxide) সৃষ্টি হয় এবং পরে এই কপার অক্সাইড বায়ুস্থিত কার্বন ডায়োক্সাইড-এর সংস্পর্শে আসিয়া 'কপার কার্বনেট'-এ (Copper carbonate) রূপান্তরিত হয়। সুতরাং দেখিতেছ, কার্বন ডায়োক্সাইডই তামায় মরিচা পড়ার প্রধান কারণ।

জলের দাগ ঃ—লোহা প্রভৃতি ধাতুতে যেমন মরিচার দাগ পড়ে, তেমনই পিতল, কাঁসা ইত্যাদির পাত্রে যদি বহুদিন পর্যন্ত জল ইত্যাদি রাখিয়া দাও কিংবা ঐ পাত্রগুলি যদি জলের মধ্যে বসাইয়া রাখ, তাহা হইলেও দেখিবে ঐ পাত্র-গুলির চারিধারে চক্রাকারে নীল দাগ পড়িয়াছে। এই দাগগুলির কারণও অক্সিজেন বলিয়াই জানিবে। বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসাতেই ঐ ধাতুগুলিতে অনুরূপ দাগ পড়িয়াছে। তোমরা জান, জলের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন আছে। জল ও জলমধ্যস্থিত অক্সিজেন ইত্যাদির সংস্পর্শে আসাতে পিতল প্রভৃতি ধাতুগুলিতেও ঐরূপ দাগ পড়িতেছে।

মরিচা ও মরিচা-জাতীয় দাগগুলি কিভাবে ও কেন পড়ে দেখিলে। এখন দেখা যাক্, ঐ দাগগুলি দূর করিবার উপায় কি। সাধারণত এই দাগগুলি আমরা ছাই ইত্যাদি দ্বারা মাজিয়া ঘষিয়াই তুলিয়া ফেলি। কিন্তু যদি একটু তেঁতুল বা লেবু ইত্যাদির রস উহাতে মাখাইয়া রাখ, দেখিবে আপনা হইতেই ঐ দাগগুলি উঠিয়া আসিতেছে। পরে নরম মাটি বা কোনও মিহি ছাই বা অন্য কোনও চূর্ণ দিয়া আলগা হাতে ঘষিয়া দিলেই দেখিবে, উহাদের পূর্বেকার সেই উজ্জ্বল রং ফিরিয়া আসিয়াছে। যদি যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করিতে পার তাহা হইলে **নাইট্রিক অ্যাসিড** বা সালফিউরিক অ্যাসিডের হালকা দ্রাবক করিয়া উহার মধ্যে পাত্রগুলি ডুবাইয়া লইলেও নিমেষে ঐ দাগ মিলাইয়া যাইবে। তবে এই অ্যাসিডগুলি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারেই ব্যবহার করিবে, **যাহাতে ইহা তোমার গায়ে বা কাপড়ে পড়িয়া**

না যায়। অনেক সময় টেবিলের উপর ভিজা গেলাস ইত্যাদি রাখিবার দরুনও কাঠের উপর জলের দাগ পড়ে। সামান্য **স্পিরিট** অথবা **অ্যামোনিয়ার দ্রাবক** দ্বারা ঘষিয়া দিলেই ঐ দাগ মিলাইয়া যাইবে।

বস্ত্র-পরিষ্কারক বিভিন্ন দ্রব্যাদি

পরিধের বস্ত্রাদি মলিন হইলে উহা কিভাবে পরিষ্কার করিতে হয় তোমরা মোটামুটি পড়িয়াছ। কাপড় কাচার বিজ্ঞান জানিতে হইলে কাপড়ের বিভিন্ন জমিন ও উহাদের ধুইবার প্রণালী সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনই কাপড় পরিষ্কার করিবার পরিষ্কারক উপাদানগুলির বিষয়ও তোমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। কাপড় পরিষ্কার করিতে সাধারণত সাবান, সোডা, রিঠা, মসুরীর জল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাক্ এই উপাদানগুলির কোন্‌টির কি গুণ ও ইহা কেনই বা ব্যবহৃত হয়।

তোমরা জানো, বড় বড় শহরের ধোঁয়া ও ধূলা তৈলাক্ত। মানুষের শরীর হইতে অহরহ যে ক্লেদ ঘর্মের আকারে নিঃসারিত হইতেছে উহাও কতক পরিমাণে তৈলাক্ত। আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি এই দুই রকম তৈলাক্ত পদার্থের দ্বারাই প্রধানত মলিন হইয়া থাকে। তৈলাক্ত ময়লাগুলি কাপড়ের সূক্ষ্মতম তন্তুতে আটকাইয়া যায়। মলিন পরিচ্ছদ প্রভৃতি হইতে এই তৈলাক্ত ময়লা উঠাইবার জন্যই ক্ষার জলের প্রয়োজন—কারণ তোমরা পড়িয়াছ ক্ষার-জলে তৈল বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায় ও ভাসিয়া উঠে। পল্লীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সাজিমাটি, কলাবাসনার ছাই ইত্যাদি সোডা বা সাবানের পরিবর্তে ক্ষারদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সোডা ও সাবান—কাপড়কাচা সাবান ও সোডাও এক প্রকার ক্ষারদ্রব্য সাবান বা কাপড়কাচা সোডায় প্রধানত আছে সোডিয়াম কার্বনেট ও তাহার সঙ্গে মিশিয়া আছে জলের অংশ। কাপড়ে যদি ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগ অধিক হয়, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। এই কারণেই খারাপ সাবান, অর্থাৎ যে সকল সাবানে ক্ষারের অংশ বেশী সেই সকল সাবান

ব্যবহার করিতে নাই। খারাপ সাবান কাপড়ের তন্তুগুলিকে নানাভাবেই জখম করিতে পারে। অনেক সাবান-প্রস্তুতকারক সাবানের মধ্যে কস্টিক



কাপড় ছিঁড়িয়া যায়

পটাস ও রজন মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। এই দুইটি জিনিসই কাপড়ের ক্ষতি করে। রজন-মেশানো সাবান দেখিতে পিঙ্গল বর্ণের হয়। রজনের সাবানে সহজেই ফেনা হয় বটে, কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তন্তুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সাবানে ব্লিচিং পাউডার বা সোডা বেশী থাকিলে কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু কাপড় অল্প দিনেই ছিঁড়িয়া যায়।

সাবানে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হইয়াছে কিনা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাও, তাহা হইলে সাবান জলে গুলিয়া উহাতে লেবুর রস মিশাইবে। যদি দেখ অত্যধিক বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহাতে ক্ষারের মাত্রাধিক্য হইয়াছে। ভেজাল-মিশ্রিত সাবান জলে গুলিলে জলের তলায় বহু কঠিন পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। রঙিন কাপড়ে ক্ষার-বর্জিত সাবান ব্যবহার করাই বিধেয়, কারণ ক্ষারদ্রব্যের প্রয়োগে রং সহজেই চটিয়া যায়। এই কারণে রঙিন কাপড়ে সোডার ব্যবহারও নিষিদ্ধ। রেশম বা পশম-কাপড়েও অতিরিক্ত ক্ষার প্রয়োগ করিতে নাই। কারণ রেশম ও পশম উভয় প্রকার বস্তুরই প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম।

রিঠার জল—রিঠা একপ্রকার বন্য ফল। পল্লীগ্রামে রেশমী বা পশমী বস্ত্রাদি কাচিতে অনেকে সাবান, সোডা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষারদ্রব্যের ব্যবহার না করিয়া দেশীয় প্রথায় এই রিঠার জলেই কাপড় কাচিয়া থাকেন। রিঠার

জল সাধারণত গরম ও সিল্কের কাপড়েই ব্যবহৃত হয়। রেশমী বা পশমী কাপড়ের তন্তুগুলিই এমন যে উহাতে ময়লা গভীরভাবে বসিতে পারে না।



রিঠার জলে রেশম বা পশমের জমিন নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই

এই কারণে রেশম বা পশমবস্ত্র কাচিতে হইলে উহাতে ক্ষারদ্রব্য প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। রিঠার জলে রেশম বা পশম-কাপড়ের জমিন নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। রিঠার বীচিটি ফেলিয়া ফলের টুকরাগুলি ছোট ছোট করিয়া ভাঙিয়া জলের মধ্যে একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরের দিন ঐ জলে টুকরাগুলি চটকাইয়া লইলেই দেখিবে ফেনা হইতেছে। ঐ সফেন জলের মধ্যেই তোমার রেশম ও পশম-বস্ত্রগুলি দিয়া কাচিয়া লইবে। এই ভাবে কাচা কাপড় পরে আবার মসুরীর জলে ডুবাইয়া লইতে পার। মসুরীর জল কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা এখন বলা হইতেছে।

মসুরীর জল—পূর্বেই বলা হইয়াছে রঙিন কাপড় প্রভৃতিতে যদি অত্যধিক ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উহার রং চটিয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কা থাকায় এবং ক্ষার-বর্জিত উত্তম সাবানাদির অভাবেও পল্লীগ্রামে অনেকে রঙিন কাপড় ইত্যাদি ধুইতে মসুরীর ডালের জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মসুরীর জলের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা তত অধিক নয়, কিন্তু উহা কাপড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠিন্য আনিয়া দিতে পারে। এই জল ক্ষার-পদার্থ-বর্জিত, সুতরাং ইহার প্রয়োগে কাপড়ের রং উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

জলের পাঁচ ভাগের একভাগ মসুরীর ডাল লইয়া উহা একটি কাপড়ে বাঁধিয়া পরিমাণ অনুযায়ী জলের মধ্যে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে সিদ্ধ করিবার পর যে



মসুরী কাপড়ে বাঁধিয়া জলের মধ্যে সিদ্ধ করিবে

জলটি তৈয়ারী হইবে উহা সাধারণত কলপ রূপেই ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা যদি পরিষ্কারক দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করিতে চাও তাহা হইলে ঐ ডালটিই পুনরায় জল দিয়া ফুটাইয়া লও। ঐ জলটিই কাপড় ধুইবার পক্ষে উপযুক্ত হইবে।

কাপড়ে কাঠিন্য আনিয়া দিবার বিভিন্ন উপাদান

পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার পর উহা ভাল ভাঁজ, পাট বা পালিশ করিবার জন্য কলপের প্রয়োজন হয়। কলপ দেওয়া কাপড়ের আঁশের মধ্যে ময়লা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পরে উহা পরিষ্কার করা সহজসাধ্য হয়। ভাত, চিঁড়া বা খইএর মণ্ড, পাতলা লেই (ময়দা-সিদ্ধ) প্রভৃতি কলপ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধোপারা সাধারণত ভাতের মাড়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে বড় বড় দোকানে বা ধোপীখানায় এবং বিদেশে প্রায় সর্বত্রই এই উদ্দেশ্যে তৈয়ারী স্টার্চ-এর (starch) ব্যবহার দেখা যায়। **ফুটন্ত** বা **কাঁচা** উভয় প্রকার জলেই স্টার্চ ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফুটন্ত জলে স্টার্চের ব্যবহার :—কিছুটা স্টার্চের মধ্যে সামান্য ঠাণ্ডা জল দিয়া স্টার্চের দ্রাবক তৈয়ারী করিয়া লও। পরে জল ফুটিলে উহাতে সামান্য

বোরাক্স পাউডার মিশাইয়া ঐ ফুটন্ত জলটি আস্তে আস্তে ঐ দ্রাবকের মধ্যে ঢালিবে ও সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবে, নতুবা স্টার্চ ডেলা পাকাইয়া যাইতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই দেখিবে ঐ স্টার্চ-মিশ্রিত জলটি শটির ন্যায় ঈষৎ নীলচে



নীলচে ও আঠালো হইয়া উঠিতেছে

ও আঠালো হইয়া উঠিতেছে। এইভাবেই ফুটন্ত জলে স্টার্চ তৈয়ারী করিবার নিয়ম। স্টার্চের মধ্যে বোরাক্সের ব্যবহারে কাপড়ের মসৃণতা বাড়ায়। এইভাবে তৈয়ারী স্টার্চের মধ্যে পরিষ্কার-করা নীল-দেওয়া কাপড়খানি ডুবাইয়া পরিষ্কার শুকনো কাপড়ের কাঠিন্যের প্রয়োজন হইলে, এইভাবে তৈয়ারী স্টার্চের মধ্যে ডুবাইয়া লইতে পার। ব্যবহার করিবার সময় নীচের মাপ অনুযায়ী স্টার্চ ও অন্যান্য পদার্থগুলির পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে পার :—

১ আউন্স স্টার্চ—বড় চামচের দু'চামচ ঠাণ্ডা জলে মিশাইবে।

চায়ের চামচের ½ চামচ বোরাক্স ফুটন্ত জলে মিশাইবে।

আঠালো না হওয়া পর্যন্ত জলের পরিমাণ—½ পাইন্ট।

কাঁচা জলে স্টার্চের ব্যবহার—শার্টের কলার, কাফ, বেল্ট, নার্সের টুপি ইত্যাদি পোশাকের বিভিন্ন অংশ অনেক সময় অধিকতর কঠিন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে স্টার্চ ঠাণ্ডা জলেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁচা জলে স্টার্চ ইত্যাদির পরিমাণ :—

১ আউন্স স্টার্চ, ½ চামচ বোরাক্স (চায়ের চামচের),

৩ বা ৪ ফোঁটা তার্পিন, ½ পাইন্ট ঠাণ্ডা জল।

পূর্বোক্ত উপায়ে সামান্য জলে স্টার্চটি প্রথমে গুলিয়া লও ও উহার সহিত ৩।৪ ফোঁটা তাপিন মিশ্রিত কর। সামান্য ফুটন্ত জলে বোরাক্স পাউডারটি মিশাইয়া লও। পরে উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া ঐ বোরাক্স-মিশ্রিত জলটি স্টার্চের দ্রাবকের সহিত গুলিয়া লও। পরে এক টুকরা কাপড় দিয়া এইরূপে তৈয়ারী স্টার্চটি ছাঁকিয়া লইবে। কাঁচা জলে স্টার্চ তৈয়ারী করিবার ইহাই নিয়ম। তাপিন দিবার কারণ এই যে, উহা শ্বেতসারটিকে (starch) কাপড়ের তন্তুর মধ্যে চলিয়া যাইতে সাহায্য করে। এই উপায়ে স্টার্চ তৈয়ারী করিয়া কাপড়ে কাঠিন্য আনিতে হইলে মনে রাখিবে, কাপড় শুকাইবার পূর্বেই ইস্ত্রি করিতে হইবে এবং ইস্ত্রির গরমে স্টার্চ আঠালো হইয়া উঠিবে বলিয়া ইস্ত্রিকেও অধিকতর গরম করিতে হইবে।

মসুরী ডালের কলপ—মসুরী ডাল এক টুকরা কাপড়ে বাঁধিয়া প্রায় ৪৫ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর উহার ঐ আঠালো জলটি কিভাবে কলপের মতন ব্যবহৃত হইতে পারে উহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। এখন দেখা যাক্, গঁদের কলপ কিভাবে তৈয়ারী হয় ও উহার প্রয়োগই বা কিরূপ।

গঁদের কলপ—ভাল সিল্ক অথবা রেশম-বস্ত্র প্রভৃতিতে সাধারণত কলপের ব্যবহার হয় না। তবে অনেক সময়ে অত্যন্ত পাতলা ও নিকৃষ্ট ধরণের সিল্ক



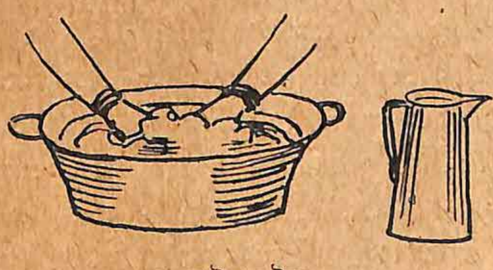
গঁদ-মিশ্রিত জলটি ছাঁকিয়া বোতলে রাখ

প্রভৃতিতে কলপের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই গঁদের কলপ অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ পাইণ্ট জলে ৪ আউন্স পরিমাণ গঁদ

ব্যবহার করিবে। গঁদের টুকরাগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখ। গঁদটি জলের সহিত মিশিয়া গেলে পরে ঐ গঁদ-মিশ্রিত জলটি ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখ। বোতলে রাখিবার সময় যদি উহার সহিত কয়েক ফোঁটা ফরম্যালিন বা ক্লোরোফরম মিশাইয়া দাও তাহা হইলে চিতি পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। কাপড়ে দিবার সময়, তোমার যে কাপড়ে যেরূপ কাঠিন্যের প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী এক বা ততোধিক চামচ এইরূপে তৈয়ারী গঁদের কলপ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। প্রতি পাইন্ট জলে যদি এক চামচ মিথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া দাও, তাহা হইলে কাপড়ের চাকচিক্য ও মসৃণতা আরও বাড়িবে।

পশমের কাপড় কাচা

পশমের কাপড়ের প্রতিরোধ-ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা কম। পশমী কাপড়ের তন্তুগুলি সহজেই কুঁচকাইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এই কারণেই পশমবস্ত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন লওয়া প্রয়োজন। অত্যধিক রগড়ানো, ক্ষারদ্রব্যের ব্যবহার, অত্যধিক গরম জল প্রভৃতি পশমবস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ। অত্যধিক গরম জলে, বা গরম জল ব্যবহার করিবার পর, হঠাৎ ঠাণ্ডা জলের প্রয়োগেও পশমের আঁশ সংকুচিত হয় ও কুঁচকাইয়া যায়। এই কারণে কোনও পশমবস্ত্র



কচলাইয়া লইবে

ধুইতে হইলে যতটুকু জল প্রয়োজন উহার সবটাই ঈষদুষ্ণ করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে পশমবস্ত্র রগড়াইতে নাই, উহা কচলাইয়া

থুপিয়া থুপিয়াই কাচিবার নিয়ম। একই কারণে পশমবস্ত্রে সাবানও ঘষিয়া দেওয়া উচিত নয়, কারণ উহাতেও তন্তুগুলি সরিয়া যাইতে পারে। সাবান ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া বা সাবানের গুঁড়া প্রথমে সামান্য গরম জলের



থুপিয়া থুপিয়া কাচিবে

সহিত মিশাইয়া সাবানের জেলি তৈয়ারী করিয়া লইবে। তোমার ঐ পশমবস্ত্রটি কাচিতে তোমার যতখানি সাবান-জল প্রয়োজন হইবে ততখানি ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পরে তুমি ঐ সাবানের জেলিটি ও ¼ বোরাক্স পাউডার মিশাইয়া লইবে। বোরাক্সের ব্যবহারে পশমে অ্যাসিডের দাগ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে তৈয়ারী সাবান-জলের সাহায্যে পশমের কাপড় পরিষ্কার করিবার পরেও উহা আরও কয়েকবার পরিষ্কার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিবে, যাহাতে কোথাও সাবান লাগিয়া থাকিতে না পারে। সাবান হইতে ক্ষারদ্রব্যটুকু টানিয়া লইবার ক্ষমতা পশমের অদ্ভুত, এই কারণেই সাবান-জলে ধুইবার পরেও উহা আরও কয়েকবার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন। জল হইতে পশমের কাপড় কখনও কোণায় ধরিয়া টানিয়া তুলিবে না বা মোচড় দিয়া নিংড়াইবার চেষ্টা

করিবে না। তলায় দুইখানি হাত দিয়া কাপড়খানি জল হইতে উঠাইবে ও একখানি টাওয়েলের মধ্যে পশম-বস্ত্রখানি দিয়া কোনও উপায়ে চাপিয়া সমস্ত জলটুকু বাহির করিয়া দিবে।

পশমের কোট, জ্যাকেট, জাম্পার প্রভৃতি বোনা জিনিসগুলি ধুইতে হইলে প্রথমে ব্রাশ করিয়া কলার, প্লিট ইত্যাদি যথাযথ ভাবে টাঁকিয়া লইবে, নতুবা জলে দিলে উহা ঝুলিয়া পড়িবে কিংবা কুঁচকাইয়া যাইবে। জলে ডুবাইবার পূর্বে জামাগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, হাতের মাপ ইত্যাদি লইয়া রাখিবে যাহাতে ইস্ত্রি



মাপ ইত্যাদি লইয়া রাখিবে

করিবার সময় সেই মাপ অনুযায়ী ইস্ত্রি করিতে পার। পশমের বোনা জামা-কাপড় কখনও ঝুলাইয়া শুকাইতে দিবে না, কারণ উহাতে ঐ জামা-কাপড় অশোভনরূপে লম্বা বা চওড়া হইয়া যাইতে পারে। পশমের বোনা জিনিসগুলি টেবিল বা চওড়া র‍্যাক প্রভৃতির উপর পাতিয়াই শুকাইতে দিবার নিয়ম।

পশমবস্ত্র ইস্ত্রি করিবার নিয়ম :—

পশমবস্ত্রের তন্তুগুলির প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম তোমরা পড়িয়াছ। উহা খারাপ তাপ-সঞ্চালকও (bad conductor of heat) বটে। অর্থাৎ সূতার কাপড়ের বেলায় যেমন সূতার কাপড়ের মধ্য দিয়া ইস্ত্রির তাপ পাতা-চাদর ইত্যাদির মধ্যে সঞ্চালিত হয়, পশমের বেলা তাহা হয় না। ইস্ত্রির সমস্ত তাপটুকু পশম নিজের দেহেই টানিয়া লয়, এই কারণেই পশমবস্ত্র ইস্ত্রি করিবার

সময় ইস্ত্রির তাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়া প্রয়োজন, নতুবা পশম সহজেই পুড়িয়া যাইতে পারে। পশমের কাপড়খানি যদি অত্যধিক শুকাইয়া থাকে, তাহা



ভিজা কাপড় উপরে পাতিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবে

হইলেও ইস্ত্রি করিবার সময় উহাতে জলের ছিটা দিবে না, বরঞ্চ একটি ভিজা কাপড় উহার উপর পাতিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবে। ইস্ত্রি করিবার পরেও পশম-বস্ত্রখানি কিছুক্ষণ হাওয়ায় ফেলিয়া রাখিবে, কারণ অনেক সময় পশমবস্ত্র ভিজা থাকিলেও উহা সহজে অনুভব করা যায় না।

রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উহার উপকারিতা

রন্ধন করাও একটি কলা-বিশেষ, এবং ভাল রন্ধন করিতে যথেষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রয়োজন ইহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। ভাজা করা, সিদ্ধ করা, আগুনে ঝলসানো ইত্যাদি রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে তোমরা জানো। এখন এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ভাজা করা (frying)—সামান্য তৈল বা ঘি ইত্যাদি গরম করিয়া উহার মধ্যে তরিতরকারি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি প্রয়োজনানুযায়ী মসলা

ইত্যাদি মাখিয়া ছাড়িয়া দাও। লুচি ইত্যাদি ভাজিতে হইলে যথেষ্ট ঘি বা তৈল ইত্যাদি দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে জিনিসটি উহার মধ্যে ডুবিয়া যায়। আবার, অপরপক্ষে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য তৈল-ঘিয়ের



সিদ্ধ করা



ভাপে সিদ্ধ করা



ভাজা করা



আগুনে ঝলসানো

মধ্যে জিনিসটি এপিঠ-ওপিঠ করিয়া দিয়া নামাইয়া লওয়া হয়। ভাজিবার এই দুইটি প্রক্রিয়ার সহিতই তোমরা প্রায় সকলেই পরিচিত আছ। রন্ধনের এই প্রথায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করা যায়। হয়ত এই প্রক্রিয়াটিই অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সময়-সংক্ষেপকারী প্রক্রিয়া। যদিও এই প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত রুচিকর ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যাদি তৈয়ারী করা যায়, কিন্তু ভাজিয়া লইবার দরুন উহা **অত্যন্ত দুষ্পাচ্য হয়** ও উহার সমস্ত **ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।** কিন্তু ফুটন্ত তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা তৈয়ারী হইয়া

যায় বলিয়া আর উহার সুগন্ধি বা নির্যাস ইত্যাদি নষ্ট হইবার সুযোগ পায় না।

সিদ্ধ করা (boiling) :—সিদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভাজা খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় সিদ্ধ করা খাদ্যদ্রব্য তত দুষ্পাচ্য নয়। কিন্তু সিদ্ধ-করা খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম হয়। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যাদি ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু তরিতরকারি ইত্যাদি সিদ্ধ করিবার পরে যদি জলটিকে ফেলিয়া দিতে হয় তাহা হইলে এই প্রক্রিয়ায় রন্ধন করিলে উহাতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইয়া থাকে। তোমরা জানো, অনেক জল দিয়া ভাত সিদ্ধ করিবার পরে যদি ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাতে আর পুষ্টি বিশেষ কিছুই থাকে না। ফেন না ফেলিয়া যে ভাত তৈয়ারী করা হয় উহাই অধিকতর পুষ্টিকর ও উহাতে চাউলের সুগন্ধিও থাকে।

দমে সিদ্ধ করা (stewing):—ইহা সিদ্ধ করার অনুরূপই একটি প্রক্রিয়া। মাংস ইত্যাদির কঠিন অংশগুলি যখন আঁচে একটি ঢাকাযুক্ত পাত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করা হয় তখনই বলা হয় দমে সিদ্ধ করা। এই প্রক্রিয়ায় মাংসের পুষ্টি বা সুগন্ধি নির্যাস ইত্যাদির কিছুই নষ্ট হয় না। তোমরা জানো, মাংসকোষ-মধ্যস্থিত যে সংযোজক তন্তুগুলি থাকে, রাঁধিবার সময় উহার **কোলোজেন** গলিয়া যায় এবং রাঁধা-মাংসে উহা হইতেই **জিলেটিন** উদ্ভূত হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ—কচি পাঠা ইত্যাদির মাংস অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সিদ্ধ হয়। যে সকল জন্তু যত বৃদ্ধ, উহাদের মাংস সিদ্ধ হইতে তত অধিক সময় লাগে। ইহার কারণ বৃদ্ধ জন্তুদের শরীরে সংযোজক তন্তু অনেক বেশী থাকে এবং এই কারণে উহাদের মাংসও শক্ত হয় এবং বেশীক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু মাছ-মাংস ইত্যাদি জান্তব প্রোটিন যদি অত্যধিক উত্তাপে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রোটিনাংশ জমিয়া কঠিন হইয়া যাইবে এবং উহা দুষ্পাচ্য হইয়া উঠিবে। মাংস সিদ্ধ করিবার নিয়মই স্বল্প আঁচে ধীরে ধীরে সিদ্ধ করা। কাজেই দেখিতেছ, এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হইতেছে :ইহাতে জ্বালানির প্রয়োজন স্বল্প এবং খাদ্যদ্রব্যও সহজপাচ্য হয় এবং খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির নির্যাস ইত্যাদি নষ্ট হইবারও কোনও আশঙ্কা

থাকে না, কারণ এই ক্ষেত্রে সিদ্ধ করা জল ফেলিয়া দিবারও কোনও প্রশ্ন উঠে না। তোমরা মাছ-মাংস, সবজি ইত্যাদির স্টু-এর (stew) সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত আছ। খাদ্যদ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত নির্যাসের দ্বারাই স্টু-এর ঝোলটি সুবাসিত হইয়া উঠে।

ভাপে সিদ্ধ করা (·steaming) :—ভাপে সিদ্ধ করার বেলাতেও স্বল্প আঁচেরই প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় রান্না-করার প্রধান সুবিধা এই যে ইহাতে জান্তব প্রোটিনের কঠিন হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। ভাপে রান্না করা খাদ্য-দ্রব্যাদি সহজেই হজম করা যায় এবং এই কারণে উহা বৃদ্ধদের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী বলিয়াই জানিবে। এই প্রক্রিয়ায় রান্না-করা সবজি প্রভৃতির খনিজ লবণাদি নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়ায় দুই উপায়ে রান্না করা যাইতে পারে—একটি, বাষ্পের সহিত খাদ্যদ্রব্যাদির **প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করাইয়া**; অপরটি, বাষ্প বা ভাপের সহিত খাদ্য-দ্রব্যাদির **অপ্রত্যক্ষ সংযোগের সাহায্য লইয়া**। কিন্তু যে ভাবেই রান্না কর না কেন, ভাপে সিদ্ধ করিবার পাত্রটির মুখ একটি আঁট-ঢাকনি-যুক্ত হওয়া আবশ্যক যাহাতে সমস্ত বাষ্প বা ভাপটুকুই কাজে লাগানো যাইতে পারে। তোমরা সকলেই 'ইকমিক কুকার' দেখিয়াছ। ইকমিক কুকারে বাষ্পের সহিত খাদ্যদ্রব্যাদির অপ্রত্যক্ষ সংযোগই হইতেছে। ইকমিক কুকারের বড় বাসনটি আঁট-ঢাকনি-যুক্ত হয় এবং উহার মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি পাত্র সমেত ঠিক টিফিন ক্যারিয়ারের মতন একটি বাসন বসানো থাকে। এই বাসনটি কুকারের তলদেশের ফুটন্ত জলটুকুর মধ্যে বসানো ছোট একটি বাটির উপরই দেওয়া হয়। কুকারের মুখ আঁট করিয়া দিবার দরুন সমস্ত ভাপটাই ভিতরের পাত্রটিতে লাগে ও ভিতরকার তরিতরকারি ইত্যাদি সমস্তই সিদ্ধ হইয়া যায়। পাত্রগুলির মুখে আঁট ঢাকনি থাকে বলিয়া, এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের বর্ণ বা গন্ধের বিশেষ পরিবর্তন হয় না এবং ভাইটামিনগুলিরও অপচয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

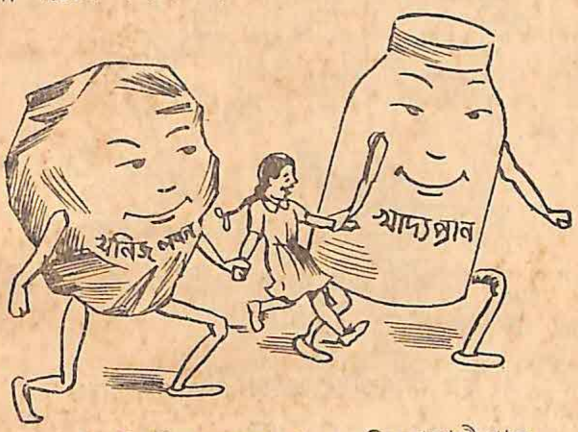
আগুনে ঝলসানো (roasting) :—তোমরা ভাপে বা বাষ্পে সিদ্ধ করার কথা পড়িলে। ভাপে সিদ্ধ করার অর্থই ভিজা তাপে সিদ্ধ করা। ঝলসানোর অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ঝলসানোর প্রক্রিয়াতে শুকনো তাপ ব্যবহৃত হয়। তোমরা জানো, বহু পূর্বে যখন রন্ধন-প্রথার উদ্ভব হয় নাই—মানুষ কাঁচা মাংস ইত্যাদি আগুনে ঝলসাইয়াই ভক্ষণ করিত। এখনও আমাদের কয়েকটি বিশেষ

খাদ্য এইভাবেই তৈয়ারী হয়। সিক-কাবাব প্রভৃতি মাংসের কয়েকটি বিশেষ খাদ্য, তোমরা হয়তো জানো, এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাংসের টুকরাগুলি ঘি ও অন্যান্য মসলা ইত্যাদি মাখাইয়া জলজলে আগুনের সামনে ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা ঐ আগুনের তাপে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে ক্রমাগত এপিঠ-ওপিঠ করিয়া উল্টাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে কোনদিকেই উহা কাঁচা না থাকে। কাজেই ঝলসানো আর কিছুই নহে, খোলা আগুনের উপর ধরিয়া সিদ্ধ করা বা **সেঁকিয়া লওয়া**। ওভেনের সাহায্যে এই প্রক্রিয়ায় রান্না করাকেই বলা হয় **বেকিং** (baking)। ওভেনের মধ্যে একটি ইস্পাতের তৈয়ারী বাক্সের মতন পাত্র থাকে। চারিদিকে তাপ দিয়া বাক্সটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং এই বাক্সটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং এই বাক্সের মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্যাদিও এই শুক্‌নো তাপে সহজেই সিদ্ধ হইয়া যায়। পাঁউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি এইভাবেই সাধারণত তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আগুনে ঝলসাইয়া খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে উহাতে খরচ কিছু বেশী পড়ে, কারণ জ্বালানীর প্রয়োজন হয় অধিক। অপরদিকে আবার আগুনে ঝলসাইয়া লইবার দরুন মাংসের সমস্ত জলীয় অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং মাংসখণ্ডটিও সংকুচিত হইয়া ছোট হইয়া যায়। সুতরাং এই প্রথায় রন্ধন করিতে হইলে মাংসের পরিমাণও অধিক প্রয়োজন হয়। কাজেই এই প্রথায় রন্ধন করা কিছুটা ব্যয়-সাপেক্ষ বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু এই প্রথায় রন্ধন করিলে খাদ্যদ্রব্যাদি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হয়।

ভাইটামিন ও খনিজ লবণ

ভাইটামিন ও খনিজ লবণ এই দুইটিই জীবনীশক্তি সংরক্ষক অথবা দেহ-নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ আমাদের দৈহিক গঠন ও জীবনী-



জীবনীশক্তি-সংরক্ষক বা দেহ-নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্য

শক্তি সংরক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে এই দুইটির উপরেই। এখন দেখা যাক্, এই দুইটি কি এবং উহারা কি ভাবে আমাদের জীবনীশক্তি সংরক্ষণে বা দেহনিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

ভাইটামিন :—

'ভাইটামিন' শব্দটি তোমরা প্রায় সকলেই আজকাল ব্যবহার করিয়া থাক। চিকিৎসকেরা প্রায়ই ভাইটামিন গ্রহণের নির্দেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই 'ভাইটামিন' বস্তুটি কি? আমাদের দেহের মধ্যে যেমন আমাদের প্রাণ রহিয়াছে অথচ উহাকে দেখা যায় না, কিন্তু চলাফেরা প্রভৃতি যাবতীয় কাজে আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব করি—ঠিক তেমনি খাদ্যের মধ্যেও অতি সামান্য পরিমাণে কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ রহিয়াছে। এই পদার্থগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু উহার কার্যকারিতা ও অপরিহার্যতা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলিই 'ভাইটামিন' বা **খাদ্যপ্রাণ** নামে পরিচিত। পরিমাণে এই পদার্থগুলি যদিও অত্যন্ত সামান্য ও অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু **দেহের উপর**

উহাদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উহারা দেহের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিপোষণ প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেহযন্ত্রটিকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখে। এই কারণেই 'ভাইটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ **জীবনীশক্তি-সংরক্ষক** অথবা **দেহনিয়ন্ত্রণকারী**



এই সূক্ষ্ম পদার্থগুলিই ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। তোমরা মোটর গাড়ি দেখিয়াছ। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও এক এক সময় সামান্য একটি স্ফুলিঙ্গের অভাবে গাড়ি অচল হইয়া পড়ে। ঠিক তেমনি ভাইটামিনের অভাবেও আমাদের দেহযন্ত্রটি বিকল হইয়া যায় ও আমরা বাঁচিতে পারি না।

অভাবজনিত রোগ :—

দেখা গিয়াছে, অনেকদিন ধরিয়া যদি কাহাকেও টাটকা ফলমূল ও তরিতরকারির পরিবর্তে কেবল কলে-ছাটা চাউল ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় তাহা হইলে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে; কিম্বা যদি কাহাকেও টাটকা তরিতরকারি, মাছ-মাংস ইত্যাদির পরিবর্তে কেবল টিনে প্যাক করা বাসী খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুদিন পরেই উহার চর্মরোগ দেখা দেয়। এই সমস্ত অসুস্থতাই **ভাইটামিনের অভাবজনিত।** এই জন্যই ইহাদের **অভাবজনিত রোগ** (Deficiency disease) বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের রক্তের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে—এই বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সমতা সাধনে ভাইটামিন বিশেষ সহায়ক। তোমরা দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় লবণগুলির কথা শুনিয়াছ। এই লবণগুলির

সহযোগিতায় খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিনগুলি পরিপাক-ক্রিয়ারও যথেষ্ট সহায়তা করে। এবং এই কারণেই কোনও একটি ভাইটামিনের অভাব হইলেই দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।

ভাইটামিনের উৎপত্তি :—

সাধারণত উদ্ভিদ হইতেই ভাইটামিনের উৎপত্তি। উদ্ভিদ হইতেই ভাইটামিন প্রাণিদেহে নীত হয়। মানুষের দেহাভ্যন্তরে কেবলমাত্র একরকম ভাইটামিনের সৃষ্টি হইতে পারে—কিন্তু উহাও সূর্যের রঙ্গোত্তর রশ্মির সংস্পর্শে না আসিলে হয় না। জীবদেহের যদিও ভাইটামিন উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু জীবদেহে ভাইটামিন সঞ্চিত থাকিতে পারে। যেমন—মাছের যকৃৎ প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন ভাইটামিন ও উহাদের প্রয়োজনীয়তা :—

'ভাইটামিন' শব্দটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে প্রথম ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে আজ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ভাইটামিনের উপস্থিতি সম্বন্ধে মানুষ অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছে। এই বিভিন্ন ভাইটামিনগুলির মধ্যে ভাইটামিন-'এ', 'বি', 'সি' ও ভাইটামিন-'ডি'ই প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

ভাইটামিন-'এ' :—

দেহের পুষ্টি, গঠন ও পরিপোষণে ভাইটামিন-'এ'র প্রয়োজন অত্যধিক। সুতরাং বর্ধিষ্ণু শিশুর পক্ষে 'এ'-ভাইটামিন অপরিহার্য। খাদ্যে 'এ'-ভাইটামিনের



'এ'-ভাইটামিন

অভাব হইলে, দেহাভ্যন্তরে দেহতন্তুগুলি জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া যায়, ও ঐ ফাটল দিয়া দূষিত জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। ইহার ফলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহই

সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয়। 'এ'-ভাইটামিনের অভাব হইতেই শ্বাসপীড়া, নালীঘা (sinus infection), কর্ণরোগ প্রভৃতি দেখা দেয়। দাঁতের গোড়ায় যে সূক্ষ্ম তন্তুগুলি থাকে উহার পুষ্টিও 'এ'-ভাইটামিনের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই 'এ'-ভাইটামিনের অভাবে দাঁতেও নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। এই সকল কারণেই 'এ'-ভাইটামিনকে অনেক সময় **সংক্রমণ-প্রতিষেধক** বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া 'এ'-ভাইটামিনের অত্যধিক অভাবে চোখের ঝিল্লী শুকাইয়া যায় এবং **রাত্র্যন্ধতা** প্রভৃতি **নানারকম চক্ষুরোগ দেখা দেয়।** দেহচর্মের উপরেও 'এ'-ভাইটামিনের প্রভাব যথেষ্ট। ইহার অভাবে চামড়া উহার স্বাভাবিক মসৃণতা হারাইয়া শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া উঠে এবং প্রতি লোমকূপে একরকম ফুস্কুড়ি দেখা দেয়।



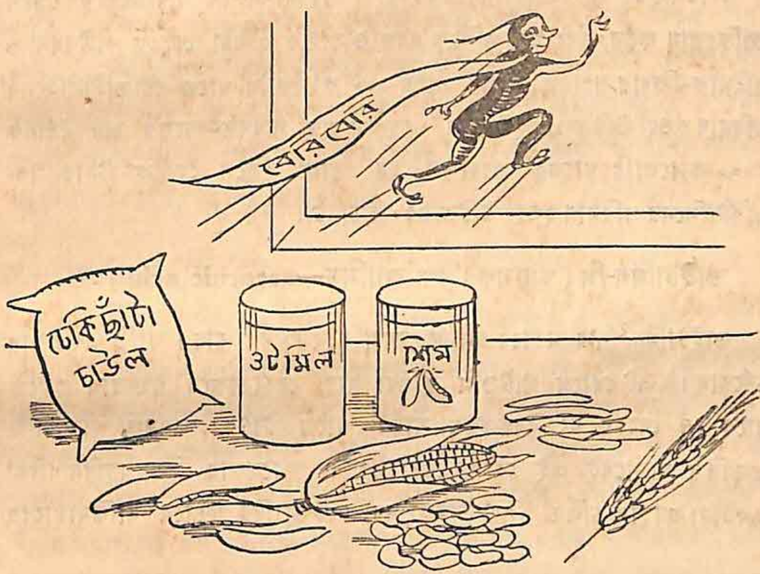
নানারকম চক্ষুরোগ দেখা দেয়

পূর্বে ধারণা ছিল যে 'এ'-ভাইটামিন কেবলমাত্র **মাখন, ডিমের কুসুম, কড-লিভার অয়েল** প্রভৃতিতেই পাওয়া যায়—কিন্তু এখন দেখা গিয়াছে **ফুলকপি, পালং, ল্যেটুস** প্রভৃতিতেও যথেষ্ট পরিমাণ 'এ'-ভাইটামিন রহিয়াছে। এই সমস্ত শাকসবজিগুলির পাতা যখন ধীরে ধীরে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে তখনই উহাতে 'এ'-ভাইটামিন জমিতে থাকে। আরও দেখা গিয়াছে, গাজর, ভুট্টা প্রভৃতি হলুদবর্ণ সবজিগুলির মধ্যে 'ক্যারোটিন' নামে এমন একটি উপাদান আছে যাহার গুণ ভাইটামিন-'এ'র ন্যায়। গাজরের হলুদ-বর্ণটিকে (carotine) পৃথক করিয়া দেখা গিয়াছে উহা ভাইটামিন-'এ'র অনুরূপ। আমরা যখন এই সমস্ত সবজিগুলির ক্যারোটিন (carotine) খাই, উহা ভাইটামিন-'এ'-তেই রূপান্তরিত হয় ও উহারই কাজ করে। একজন সুস্থ, কর্মঠ, মোটামুটিভাবে পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে দৈনিক ৫০০০ ই. উ. (ইণ্টারন্যাশনেল ইউনিট) 'এ'-ভাইটামিন প্রয়োজন। গাজর, টকবেগুন, পালংশাক, কমলালেবু, স্কোয়াস প্রভৃতিতে যথেষ্ট ক্যারোটিন আছে। সুতরাং এইগুলিও ভাইটামিন-'এ'র অভাব পূরণ করিতে পারে। এই সঙ্গে জানিয়া রাখিবে রান্না করিলেও

উদ্ভিদজাত 'এ'-ভাইটামিন নষ্ট হয় না। ভাইটামিন-'এ' দুধ, মাখন, চর্বি, ননী, ডিমের কুসুম, মেটুলি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যগুলিতে পাওয়া যায়।

ভাইটামিন-'বি' :—

ভাইটামিন 'বি'র অপর নাম 'থায়ামিন'। তোমরা বেরিবেরি রোগের নাম শুনিয়াছ। জাপান, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেই বেরিবেরি রোগের প্রকোপ বেশী।



ভাইটামিন 'বি' বেরিবেরি প্রতিরোধ করে

ইহার কারণ কি ? তোমরা জান ঐ সকল দেশের লোকেদের প্রধান খাদ্য ভাত। চাউলের বাহিরের খোসাটির মধ্যে বেরিবেরি-নিরোধক এক প্রকার পদার্থ আছে। কলে-ছাঁটা চাউলে ঐ অংশটি বাদ পড়িয়া যায়, কাজেই অন্য কোনও উপায়ে যদি এই ভাইটাইমিনটি পরিপূরণ করা না হয়, তাহা হইলে কলে-ছাঁটা চাউল যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহারা সহজেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে। ভাইটামিন-'বি'র মধ্যে এই বেরিবেরি-নিরোধক পদার্থ ছাড়া আরও অন্যান্য পদার্থ রহিয়াছে বলিয়া বেরিবেরি-নিরোধক পদার্থটিকে ভাইটামিন-'বি (১

অথবা অ্যান্থরিন (aneurin) বলা হয়। এই 'বি (১)' বা 'অ্যান্থরিন' স্নায়ু-দৌর্বল্য প্রভৃতি স্নায়ু-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে বিশেষ উপকারী।

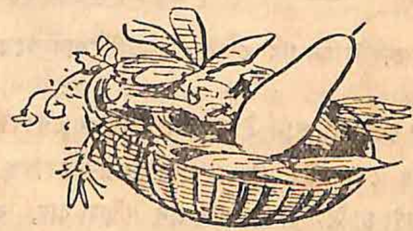
ভাইটামিন-'বি (১)' নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায়—

ঢেকিছাঁটা চাউল	সয়াবিন	বাদাম
মটরশুঁটি	শিম	মাংস
ওটমিল	ডাল	কিডনী, যকৃৎ

কাজেই দেখিলে ভাইটামিন-'বি (১)' ও ভাইটামিন-'বি' **বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করে,** এবং স্নায়ুগুলিকে সবল ও সতেজ করিয়া দেহের পুষ্টিবর্ধন ও পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। প্রতি ১০০ ক্যালোরি খাদ্যে এই ভাইটামিনের পরিমাণ হওয়া উচিত ১৫ ইউনিট। একজন সুস্থ পরিণত-বয়স্কের যদি দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দৈনিক উহার 'বি-ভাইটামিনের পরিমাণ হওয়া উচিত ৪৫০ ইউনিট।

ভাইটামিন-সি (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড—ascorbic acid) :—

ভাইটামিন-'সি'র অভাবে **স্কার্ভি রোগ** হইতে দেখা যায়। স্কার্ভি একপ্রকার চর্মরোগ। এই রোগে গাঁটগুলি ফুলিয়া যায়, দেহাভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইতে থাকে ও দেহের রং বিবর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যে টাটকা ফলমূল, শাকসবজি প্রভৃতির অভাবেই এই রোগ দেখা দেয়। আগেকার দিনে বহুদিন ধরিয়া একটানা জাহাজ চলিত বলিয়া টাটকা সবজি ইত্যাদির অভাবে মাঝিমাল্লাদের



টাটকা সবজিতে স্কার্ভি-নিরোধক পদার্থ আছে

মধ্যেই এই রোগ দেখা যাইত। টাটকা ফলমূল প্রভৃতিতে স্কার্ভি-নিরোধক একটি পদার্থ রহিয়াছে, উহাই ভাইটামিন-'সি'। ভাইটামিন-'সি' **দাঁতের স্বাস্থ্য**

সংরক্ষণেও সহায়তা করে। একজন সুস্থ পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৈনিক ৭৫ মিলিগ্রাম 'সি' ভাইটমিন থাকা প্রয়োজন। নীচের খাদ্যদ্রব্যগুলিতে 'সি'-ভাইটামিন পাওয়া যায় :—

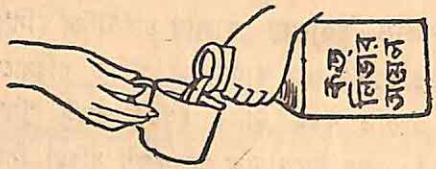
লেবু	কমলালেবু	বাতাবি লেবু	শালগম	আলু
বরবটি	টকবেগুন	পালংশাক	মনোক্কা	জাম

লেবু ও কমলালেবুর রস অপেক্ষাও **উহাদের** খোলায় ভাইটামিন 'সি'র পরিমাণ অধিক। অপক্ক মাংস প্রভৃতিতেও এই ভাইটামিন অধিক পরিমাণে থাকে। ফলমূল, তরিতরকারি প্রভৃতি যতই টাটকা হইবে ততই 'সি'-ভাইটামিনের পরিমাণ অধিক হইবে। স্বল্প আঁচে যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিতে থাক তাহা হইলে তরিতরকারি হইতে 'সি'-ভাইটামিনের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে, কারণ বায়ুস্থিত অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার 'সি'-ভাইটামিন নষ্ট করে।

ভাইটামিন-'ডি' :—

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শিশুদের **রিকেট** রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। রিকেটও একপ্রকার অভাবজনিত রোগ। এই রোগে হাড়গুলির যথাযথ পুষ্টি ও পরিপোষণ হয় না ও ইহার ফলে অনেক স্থলেই হাড়গুলি বাঁকিয়া যায় ও মানুষ বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়ে। চলাফেরা ইত্যাদিতে জড়তাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। **কড-লিভার অয়েল, মাখন** প্রভৃতিতে একপ্রকার রিকেট-নিবারক পদার্থ আছে, উহাই ভাইটামিন-'ডি' নামে পরিচিত। সূর্যের রঙ্গোত্তর রশ্মির সাহায্যেও রিকেট রোগ নিবারণ করা যায়—আবার অনেক স্থলে এই রশ্মির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যে রিকেট-নিরোধক পদার্থ সঞ্চিত হইতেও দেখা যায়। যেমন—দুগ্ধে সাধারণত 'ডি'-ভাইটামিন কমই থাকে কিন্তু যে সকল গরু মাঠে চরিয়া বেড়ায়, দেখা গিয়াছে, সেই সকল গরুর দুগ্ধে এই ভাইটামিন অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায়, প্রচুর পরিমাণে সূর্যকিরণ পাইলে রিকেট রোগীর রোগ সারিয়াও যাইতে পারে। ভাইটামিন-'ডি' একজন শিশুর পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন একজন প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে। সাধারণত আমরা ধরিয়া লই মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় ভাইটামিন 'ডি' সূর্যকিরণ হইতেই গ্রহণ করিবে। যদি কোনও ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা

যায়, অর্থাৎ যদি কোনও লোক ভাইটামিন-'ডি'র অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে শিশুদের দৈনিক যে পরিমাণ এই ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়,





রিকেট রোগ

উহাকেও সেই পরিমাণ সেবন করানো বিধেয়। একটি শিশুর খাদ্যে দৈনিক 'ডি'-ভাইটামিনের পরিমাণ ৪০০ হইতে ৮০০ ই. উ. (International units) হওয়া প্রয়োজন।

কড-লিভার, হ্যালিবাট-লিভার অয়েল প্রভৃতিতে 'ডি'-ভাইটামিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। হ্যালিবাট-লিভার অয়েলে আবার 'ডি'-ভাইটামিনের পরিমাণ কড-লিভার অয়েল অপেক্ষা ২০ গুণ বেশী। হেরিং প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছেও অনেক সময় 'ডি'-ভাইটামিন পাওয়া যায়।

প্রধান ভাইটামিনগুলির কথা মোটামুটি বর্ণিত হইল। ভাইটামিনের অভাব হেতু যে বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি অভাবজনিত রোগগুলি দেখা দেয় উহার বিষয়ও বলা হইয়াছে। ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনও-না-কোনও ভাইটামিনের অভাব। সুতরাং খাদ্য নির্বাচনের ভার যদি গ্রহণ কর, প্রথমেই লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব না হয় ও সমস্ত খাদ্য-উপাদানগুলি সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলে।

নীচে ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে একখানি চার্ট বা তালিকা দেওয়া গেল :—

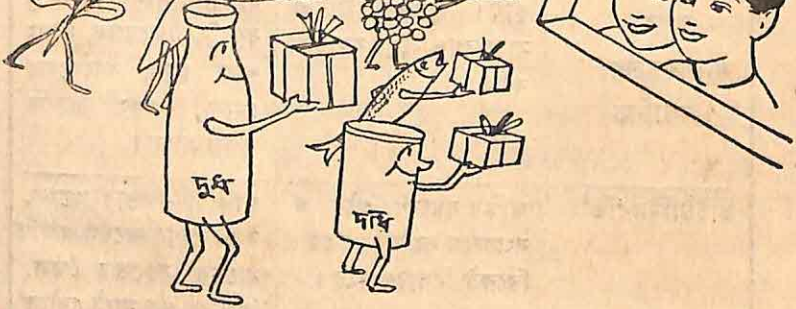
ভাইটামিন	কাজ	কোন্ কোন্ দ্রব্যে পাওয়া যায়
ভাইটামিন-'এ' ও ক্যারোটিন	শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহকে সুস্থ রাখে, ঝেরোপথেলমিয়া ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি রোগ দূর করে।	ভাইটামিন-'এ' :— কড-লিভার অয়েল, হ্যালিবাট-লিভার অয়েল, দুধ, মালাই, মাখন, পনীর ইত্যাদি। ক্যারোটিন :— কমলালেবু প্রভৃতি হলুদবর্ণ ফলমূল, সবজি প্রভৃতিতে
ভাইটামিন-'বি (১)' অথবা অ্যানুরিন	স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ রাখে। দেহের পুষ্টি, বর্ধন ও পরিপাক-ক্রিয়ার প্রধান সহায়ক, বেরিবেরি রোগ-নিবারক।	ঢেঁকি-ছাটা চাউল, ময়দা, লাল রুটি, ওটমিল, মাছ, মাংস, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, বাদাম, মটরশুঁটি, শিম, পালং, ডালের খোসা, গমের চোকল, চাউলের কুড়ো ইত্যাদি।
ভাইটামিন-'সি' অথবা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড	স্কার্ভি নিবারণে অপরিহার্য। দাঁতের গঠন ও সংরক্ষণেও যথেষ্ট সহায়তা করে।	লেবু, কমলালেবু, বাতাবি, শালগম, আলু, বরবটি, টকবেগুন, পালং শাক, জাম, আপেলের খোসা, যকৃৎ প্রভৃতি অপক্ব মাংস।
ভাইটামিন-'ডি'	অস্থির যথাযথ গঠন ও সংরক্ষণে সহায়তা করে। রিকেট নিবারণ করে।	হ্যালিবাট-লিভার অয়েল, কড-লিভার অয়েল প্রভৃতি মাছের যকৃতের তৈল, ডিম, যে গরু মাঠে রৌদ্রে চরিয়া বেড়ায় তাহার দুধ, মাখন ইত্যাদি।

খনিজ লবণ :—

খনিজ লবণও ভাইটামিনের ন্যায় জীবনীশক্তি-সংরক্ষক অথবা দেহ-নিয়ন্ত্রণকারী খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। দৈহিক গঠন ও জীবনীশক্তি সংরক্ষণে এই লবণগুলি অপরিহার্য। মলমূত্র ও ঘামের সহিত আমাদের দেহ হইতে প্রায় ২।৩ আউন্স লবণ বাহির হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিদিনই বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ঐ ক্ষয়ের পরিপূরণ করা আবশ্যক। লবণের অভাবে শরীরের যথাযথ পরিপোষণ হয় না, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে—পরিপাক প্রভৃতি শক্তিও কমিয়া আসে। আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকার লবণের প্রয়োজন হয়। উহার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি কতকগুলি লবণের বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্যালসিয়াম :—

ক্যালসিয়াম হাড়ের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও গঠনে সহায়তা করে। দাঁতের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যও ক্যালসিয়ামের উপরেই নির্ভর করে। অন্যান্য লবণের সহায়তায় হৃৎপিণ্ডের কাজও এই লবণ কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। ক্ষয়-রোগীর পক্ষে ক্যালসিয়াম লবণের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। একটি শিশুর খাদ্যে দৈনিক ১ হইতে ১$\frac{১}{২}$ ড্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন। পরিণত-বয়স্কদের



দাঁতের স্বাস্থ্য ক্যালসিয়ামের উপর নির্ভর করে

ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম—কারণ উহাদের দেহের সহিত

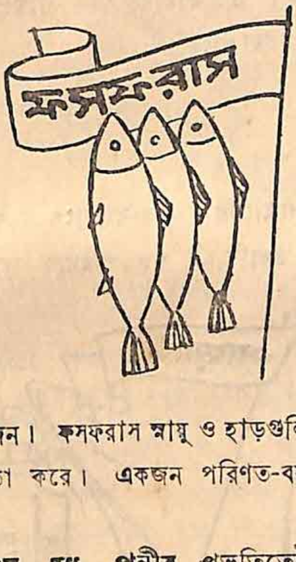
সামঞ্জস্য রাখিয়া হাড়গুলির গঠন ও পুষ্টি মোটামুটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহাদের খাদ্যে ½ হইতে ১ ড্রাম ক্যালসিয়ামই যথেষ্ট।

নীচের খাদ্যদ্রব্যগুলিতে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় :—

দুধ	ডুমুর	ছোট মাছ	দই	গাজর
মাংসের হাড়	ছানা	বাঁধাকপি	ডিমের কুসুম	পনীর

ফসফরাস :—

ফসফরাস লবণ রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখে। ফসফরাসের প্রধান কাজ দেহ-কোষগুলির যথাযথ গঠন ও পুষ্টি সাধন করা। প্রতি শিশুর খাদ্যেই যথেষ্ট



ফসফরাস থাকা প্রয়োজন। ফসফরাস স্নায়ু ও হাড়গুলিকে সুস্থ, সবল ও সতেজ রাখিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। একজন পরিণত-বয়স্কের দৈনিক ২৩ গ্রেন ফসফরাস প্রয়োজন।

ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, পনীর প্রভৃতিতেই ফসফরাসের পরিমাণ অধিক।

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম :—

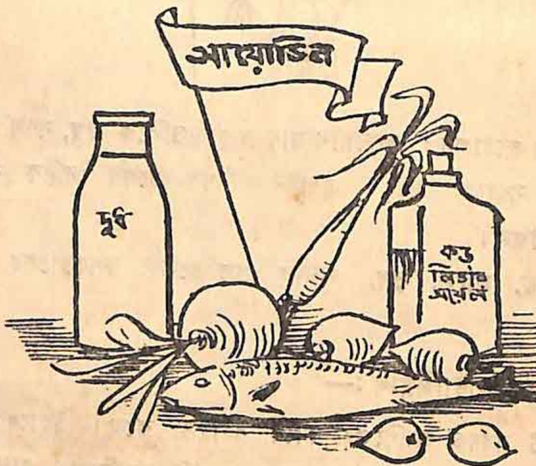
এই দুইটি লবণও হৃৎপিণ্ডের কার্যে সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে স্নায়ুমণ্ডলী ও পেশীসমূহ দুর্বল হইয়া পড়ে ও পরিপাক-ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে ৩০ হইতে ৪০ গ্রেন পটাসিয়াম ও ৬০ হইতে ৯০ গ্রেন সোডিয়াম থাকা প্রয়োজন। **সমস্ত তরিতরকারি ও শাকসবজিতেই** প্রায়

পটাসিয়াম পাওয়া যায়। **আলু, বাদাম, ডাল** ইত্যাদিতেও পটাসিয়াম যথেষ্ট থাকে।

সোডিয়াম বলিতে সাধারণ লবণকেই বুঝাইয়া থাকে। উদ্ভিদ-জাত খাদ্যদ্রব্যে সোডিয়ামের পরিমাণ স্বল্প। দেহের প্রয়োজনানুযায়ী বেশীর ভাগ সোডিয়াম মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রাণী-জাত খাদ্যদ্রব্য হইতেই পাওয়া যায়। কাজেই যাঁহারা কেবলমাত্র উদ্ভিদজাত খাদ্য খাইয়াই বাঁচিতে চাহেন, তাঁহাদের খাদ্যে বিশুদ্ধ সোডিয়াম লবণের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের দেহনিঃসৃত ঘামের সহিত সোডিয়াম লবণ বাহির হইয়া যায়, কাজেই যাঁহারা অত্যধিক ঘর্মপ্রবণ তাঁহাদের খাদ্যেও অপেক্ষাকৃত অধিক সোডিয়াম থাকা প্রয়োজন। এই কারণেই হয়ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে খাদ্যে লবণের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে।

আয়োডিন :—

যদিও এক মিলিগ্রামের এক-সহস্রাংশ আয়োডিন আমাদের প্রত্যহ প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি ঐ স্বল্প পরিমাণ আয়োডিনের অভাবেই

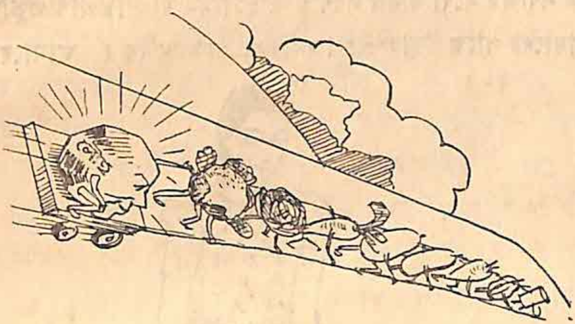


আমাদের শরীর ও মনের সজীবতা ও কর্মশক্তি নষ্ট হইয়া যায় ও আমাদের দেহে ও মনে জড়তা দেখা দেয়। আমাদের শ্বাসনালীর দুই পার্শ্বে দুইটি

গ্রন্থি আছে, তোমরা জান। আয়োডিনের অভাবে এই গ্রন্থি দুইটি বড় হইয়া যায় এবং পরে উহা হইতেই গলগণ্ড দেখা দেয়। **রশুন, বীট, শালগম, বেগুন, ফুলকপি, কড-লিভার অয়েল, দুধ, সমুদ্রের মাছ** প্রভৃতিতে আয়োডিন পাওয়া যায়।

লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজ :—

এই লবণগুলির দৈনিক প্রয়োজন সামান্যই। লৌহ লাল রক্ত-কণিকাগুলির একটি বিশেষ উপাদান। লৌহের অভাব হইলে



লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়

রক্তস্বল্পতা বা **রক্তশূন্যতা** রোগ দেখা দেয়। এবং ইহার দরুন দেহ-মধ্যে প্রতিনিয়তই যে ভাঙাগড়ার কাজ চলিতেছে উহাও ব্যাহত হয়। দেহ-কোষগুলির গঠনে ও কাজেও লৌহ বিশেষ সহায়তা করে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যে দৈনিক মোটামুটি ৮ মিলিগ্রাম লৌহ থাকা প্রয়োজন। যখন কোনও দূষিত পদার্থ দেহে প্রবেশ করে ও আমরা রোগাক্রান্ত হই, দেখিতে দেখিতে আমাদের রক্তে লৌহের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেহও ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির ন্যায় লৌহের কোনও উদ্বৃত্ত অংশ জমা করিয়া রাখিতে পারে না। এই কারণেই খাদ্যে লৌহের উপস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। **কোকো, পিচফল, ডুমুর, ওটমিল, চকোলেট** প্রভৃতিতে লৌহ পাওয়া যায়। কোকোর মধ্যে শতকরা প্রায় ৩·৭৭ মিলিগ্রাম লৌহ রহিয়াছে।

প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, সুতরাং খাদ্যে কখনও এই লবণের অভাব হয় না। ম্যাঙ্গানিজের অভাবে অনেক সময় মানসিক বৃত্তিগুলির বিকার দেখা যায় ও অনেক সময় দৈহিক পরিণতিতেও বিলম্ব ঘটে।

খাদ্যে ফল ও সবজি

ফল ও সবজি শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে।

ফল ও সবজির মধ্যে খনিজ লবণ ও ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি আছে বলিয়া আমাদের খাদ্যে উহার প্রয়োজনীয়তা অতি অধিক। আমাদের খাদ্যের



খাদ্যে ফল ও সবজির প্রয়োজনীয়তা এত অধিক

নিতান্ত কম করিয়া, শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ অন্তত ফল ও সবজি ইত্যাদির দ্বারা পূরণ করা আবশ্যক। অর্থাভাব না থাকিলে ও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য না হইলে ইহার পরিমাণ আরও বাড়ান যাইতে পারে। ফল ও সবজির লবণগুলি আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করে।

উহার মধ্যে যে শ্বেতসার আছে উহাও দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ ফল ও সবজিতেই ভাইটামিন-'এ', 'বি' ও 'সি' মাত্রাভেদে বর্তমান থাকে এবং এই সকল ভাইটামিনের দ্বারাই স্কার্ভি রোগ প্রতিহত হয়। শাকসবজিগুলি যতদূর সম্ভব কাঁচা খাওয়াই বিধেয়, কারণ উহাতে ভাইটামিনগুলি নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। শাকসবজিতে সেলুলোজের মাত্রা অধিক থাকে বলিয়া কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। সাধারণত সবজি বলিতে আমরা তরিতরকারি ইত্যাদি যাহা মাটির উপরে জন্মায় ঐগুলিকেই বুঝাইয়া থাকি ; যেমন—ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি। কচু, আলু, মূলা, গাজর প্রভৃতি তরিতরকারি হিসাবে গণ্য হইলেও উহারা কন্দ ও **মূল-জাতীয়** খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। এই সবগুলিই মাটির তলায় হয় তোমরা জানো।

ফলের মধ্যে শ্বেতসার আছে পূর্বে বলিয়াছি। এই শ্বেতসার 'ফল-শর্করা' নামে অভিহিত হয়। কলা, খেজুর, আঙুর, আম প্রভৃতিতে শর্করার মাত্রা প্রচুর, সেই কারণে পুষ্টিবর্ধক হিসাবেও ইহাদের মূল্য অধিক। লেবু, কমলালেবু, আপেল, টমেটো প্রভৃতিতে 'সি'-ভাইটামিন অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিশমিশ বলিয়া অন্য কোনও ফল নাই, শুকনো আঙুরই কিশমিশ নামে অভিহিত হয়। উহাতে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বলিয়া উহা আঙুরের মতন তত সহজপাচ্য নয়। ফল অপেক্ষাও অনেক ফলেরই খোসায় ভাইটামিন থাকে অনেক বেশী পরিমাণে। নীচে কয়েকটি ফলের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণ শতকরা হিসাবে দেওয়া হইল :—

	প্রোটিন	স্নেহ-পদার্থ	শ্বেতসার
কমলালেবু	০·৮২	১·৬	১১·৬৬
আঙুর	১·০	১·২	১৪·৪
বেদানা	০·৯৮	—	৬·৮
আপেল	·৩	০·৩	১০·৮

কঠিন ফল—আখরোট, বাদাম, পেস্তা, নারিকেল প্রভৃতি ফলগুলি **কঠিন ফল** নামে অভিহিত হয়। বাদাম অত্যধিক পুষ্টিকর যদিও এবং উহাতে প্রোটিন ও স্নেহাংশের পরিমাণ যদিও অধিক, কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না। ইহার

কারণ বাদামে স্নেলুলোজের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। উপরের কঠিন ফলগুলির উপাদান নীচে শতকরা হিসাবে দেওয়া গেল :—

	প্রোটিন	স্নেহ-পদার্থ	শ্বেতসার
আখরোট	১৬·৬	৬৫·৬	১৩·০
পেস্তা	২২·৭	৫১·১	২·৫
চীনাবাদাম	২৪·৫	৫০·০	১৫·০
নারিকেল	৩·৮৭	৫৬·২৮	২০·২৮

খাদ্যে সবজি ও ফলের প্রয়োজনীয়তা কতখানি দেখিলে। সুতরাং প্রতিদিন প্রত্যেকের আহার্যে যাহাতে কিছু ফল ও কিছু কাঁচা সবজি থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে। আলুর মূল্য অধিক নয়—অথচ আলু যথেষ্ট তাপ সঞ্চার করে ও কর্মশক্তির ইন্ধন যোগায়। কাজেই সবজি ইত্যাদির মধ্যে আলুর স্থান প্রধান জানিবে। বেশীর ভাগ সবজিরই খোসার নীচটাতেই মূল্যবান লবণগুলি থাকে। সুতরাং যতদূর সম্ভব **সবজির খোসাগুলি ফেলিয়া দিবে না** এবং সিদ্ধ করিবার সময়েও উহাতে যত কম জল দিয়া পার তাহার চেষ্টা করিবে।

সুষম খাদ্য

তোমরা জানো, খাদ্যই আমাদের দেহের পুষ্টিবিধান করে। সুন্দর-দেহ, সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, রুচিকর, সুসম্পূর্ণ ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। দিনের পর দিন তোমরা যদি একই রকম খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, দেখিতে দেখিতে তোমাদের অরুচি দেখা দিবে—খাদ্য বিস্বাদ মনে হইবে এবং উহাতে স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি হইবে না। সুতরাং খাদ্যের মধ্যে **বৈচিত্র্য** থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উহার **সুসম্পূর্ণ** ও **সুষম** হওয়া। সুষম খাদ্য কাহাকে বলে উহা জানা প্রয়োজন। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, প্রতি খাদ্যদ্রব্যেই কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং ঐ বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতি খাদ্যদ্রব্যই যদি প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা **সুসম্পূর্ণ** বা **সুষম খাদ্য** হইল জানিবে। তোমরা যদি ক্রমাগত অত্যধিক পরিমাণে কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করিতে থাক, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই দেখিবে দেহে জড়তা দেখা দিতেছে—ক্রমেই আলস্য

আসিতেছে এবং তোমাদের কর্মক্ষমতাও কমিয়া যাইতেছে। আবার যদি প্রোটিন-খাদ্য গ্রহণ কর, দেখিবে আলস্য দূর হইয়াছে, দেহ সতেজ ও কর্মঠ হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে আবার প্রোটিনের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইলে ও জান্তব প্রোটিন-খাদ্যকে সহজে হজম করাইতে হইলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যেরও প্রয়োজন। সুষম খাদ্য বলিতে সেই খাদ্যকেই বুঝাইবে যে খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ ও শ্বেতসার প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদার্থের পরিমাণ একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য সহকারেই ও প্রয়োজন অনুযায়ীই নির্ধারিত হইয়াছে। কোনও একটি খাদ্য-পদার্থের যদি আধিক্য হয় তাহা হইলে উহাকে আর সুষম খাদ্য বলা যায় না।

পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা

খাদ্য পরিকল্পনা করিতে গেলেই আদর্শ খাদ্য কি ও কাহাকে বলে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তোমরা জান খাদ্য দেহে তাপ সঞ্চার করে, এবং বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও ধর্ম অনুযায়ী এই তাপ-সঞ্চার করিবার ক্ষমতারও তারতম্য হয়। তাপ সঞ্চার করিবার এই ক্ষমতাকেই বলা হয় **খাদ্যের তাপ-মূল্য** বা **ক্যালোরি-ভেল্যু** (calorie-value)। এই তাপশক্তি মাপিবার জন্য তাপাঙ্ক-মাপক যন্ত্র (calorie meter) আছে। কোন্ কোন্ খাদ্য দগ্ধ হইয়া কি পরিমাণ উত্তাপ দিতে পারে তাহা এই তাপাঙ্ক-মাপক যন্ত্রের দ্বারাই নির্ণীত হয়। বিভিন্ন বয়স, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শ্রম ও স্বাস্থ্যের তারতম্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান ও উহার তাপশক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। একজন পরিণত-বয়স্ক, সুস্থ ও শ্রমশীল ব্যক্তির দৈনিক খাদ্যের উপাদান ও তাপশক্তি নীচের নিয়মেই হওয়া উচিত—

(১) খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য…২৫০০—৩০০০

(২) খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ…৭৫—১০০ গ্রাম প্রোটিন (শতকরা ৪০ ভাগ জান্তব ও শতকরা ৬০ ভাগ উদ্ভিজ্জ)

(৩) স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ…৫০—১০০ গ্রাম (শতকরা ৪০ ভাগ জান্তব)

(৪) শ্বেতসারের পরিমাণ …২৫০—৫০০ গ্রাম (ইহার মধ্যে প্রচুর সেলুলোজও থাকা আবশ্যক)

(৫) সকল রকম ভাইটামিন
(৬) ক্যালসিয়াম লবণ ·· ১৬—২০ গ্রেন
(৭) পটাসিয়াম ··· ৩০—৪০ „
(৮) সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ···৬০—৯০ গ্রেন
(৯) ফসফরাস লবণ—২০ গ্রেন। উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, আয়োডিন প্রভৃতিও থাকা প্রয়োজন।
(১০) প্রচুর পরিমাণ জল।

মোটামুটি উপরের নিয়মে রচনা করিয়াই নীচে একটি সুস্থ, কর্মক্ষম ও পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক আহার্যের তালিকা দেওয়া গেল :—

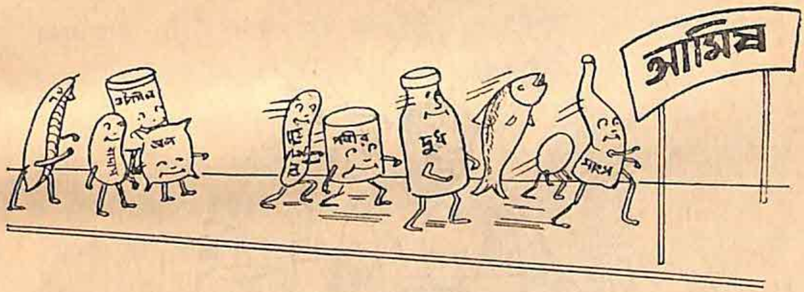
খাদ্য-উপাদান	খাদ্যদ্রব্য	দৈনিক পরিমাণ	ক্যালোরি-মূল্য
শ্বেতসার	চাউল ...	৮ আউন্স	৭৮৩
	আটা ...	৬ আউন্স	৫৯৪
প্রোটিন উৎকৃষ্ট	মাছ ...	৪ আউন্স	১০০
	দুধ ...	১২ আউন্স	২১০
উৎকৃষ্ট নয়	ডাল ...	৪ আউন্স	৪০০
স্নেহ পদার্থ	তেল, ঘি ইত্যাদি ...	৩ আউন্স	৭৮৩
ভাইটামিন ও খনিজ লবণ	ফল ও শাকসবজি	৬ আউন্স	১৬৯
			৩০৩৯
জল		৩ পাইন্ট	

এইভাবে পরিকল্পিত খাদ্যদ্রব্যের সহিত একজন শ্রমশীল সুস্থ ব্যক্তিকে সপ্তাহে একবার কি দুইবার আট আউন্স মাংসও দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ঐ দুইদিন খাদ্যের তাপশক্তি বাড়িয়া যাইবে। এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাংস বাদ দিয়াও চাউল, ডাল, আটা, মাছ, দুধ, তরিতরকারি, ফল, ঘি ইত্যাদি দিয়া এই দেশের উপযুক্ত করিয়াই একটি **সুষম** ও **আদর্শ খাদ্য** রচনা করা যাইতে পারে। ঐ কারণেই উপরের খাদ্য-তালিকা হইতে মাংস বাদ দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া, এ দেশে, বিশেষতঃ গরমকালে, মাংস কম খাওয়াই যুক্তিযুক্ত, কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস হজম করা কঠিন—বিশেষ করিয়া যখন উহা চর্বিযুক্ত থাকে। খাদ্য পরিকল্পনা করিবার সময় **বিভিন্ন বয়স,**

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া, ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য ও দৈনিক প্রয়োজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিতে হয়। দিনের পর দিন যাহাতে একই প্রকার আহার্য প্রস্তুত না হয় উহার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। খাদ্য-উপাদানগুলির দৈনিক পরিমাণ মোটামুটি ঠিক রাখিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলিকে এমনভাবে নির্বাচন বা প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে উহা পুরাতন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া না যায়।

ছোট ছেলেমেয়েদের খাদ্য-ব্যবস্থা—

পূর্বেই পড়িয়াছ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন। বয়স অনুযায়ী খাদ্য-উপাদান ও খাদ্যের প্রকারের তারতম্য হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ সবে গঠিত হইতেছে, উহাদের বয়স বর্ধিষ্ণু। বর্ধিষ্ণু বয়সে দেহ-গঠনকারী খাদ্যের প্রয়োজন অধিক। ঐ বয়সের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও লবণ থাকা আবশ্যক, বিশেষ করিয়া **লৌহ, ক্যালসিয়াম**



বর্ধিষ্ণু বালক-বালিকার দেহ-গঠনকারী খাদ্যের প্রয়োজন

ও **আয়োডিন**। বর্ধিষ্ণু বালক-বালিকার দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, মাখন বা বাদাম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য-গুলিই প্রোটিন-প্রধান খাদ্য এবং ইহাদের দেহ-পরিপোষণ-ক্ষমতা অদ্ভুত। বর্ধিষ্ণু বয়সে দেহ গঠনকারী ও দেহ-পরিপোষক খাদ্যের পরিমাণ ঠিকমত না হইলে দেখিতে দেখিতে দেহ দুর্বল হইয়া পড়ে ও উহার রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন এই তিন পর্যায়েই শিশু বাড়ে। শৈশব হইতেই যদি প্রতিদিন ১ সের খাঁটি দুধ, দই, ছানা ও মাখন প্রভৃতি সময় বিশেষে শিশুর প্রতিদিনের খাদ্যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুর শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ হইয়া

উঠিয়াছে। নীচের দুইখানি চার্টে বিভিন্ন বয়সে ছেলে ও মেয়েদের কি পরিমাণ প্রোটিন ও কত ক্যালোরি প্রয়োজন হয় তাহা দেওয়া গেল ঃ—

ক্যালোরির পরিমাণ	বিভিন্ন বয়সের শিশু		বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা		
	৪—৫	৬—৭	৮—৯	১০—১১	১২—১৩
	১০০০	১৩০০	১,৮০০	১,৮০০	২,১০০

প্রোটিনের পরিমাণ (গ্রাম)	২—৬ বৎসর বয়স্ক শিশু	৬—৯ বৎসর বয়স্ক শিশু	১০—১৭ বৎসর বয়স্ক ছেলে	মেয়ে
	৪০—৫০	৬০	৮০	৭৫

শিশুর কর্মচাঞ্চল্য এত অধিক ও উহারা এত দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে যে, কোন্ বয়সে উহাদের কত তাপশক্তির খাদ্যের প্রয়োজন উহা সঠিক



উহাদের খাদ্যে ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন

নির্ধারিত করা কঠিন। তবে উহাদের খাদ্যে যদি প্রত্যহ একটি করিয়া **ডিম**, ৪ **গেলাস দুধ**, কিছু **মাছ**, কিছু **টাটকা ফল**, কিছু **সবজি**, ভাতের সঙ্গে **ভাল ঘি** বা মাখন, **ডাল** ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে—উহাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি অনুযায়ী খাদ্য রচনা করা হইয়াছে।

সুষম ও আদর্শ খাদ্য কাহাকে বলে, খাদ্য ও দেহের পুষ্টি, শিশুর খাদ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ই পড়িলে। গৃহ কাহাকে বলে, গৃহ রচনা ও পরিচালনার উদ্দেশ্য কি ও গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন কাজগুলি সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়াছে। তোমরা কৈশোর অতিক্রম করিয়াছ, বাস্তবের সহিত তোমরা প্রতিনিয়তই নূতন করিয়া পরিচিত হইতেছ। তোমাদের সামনে এখন বাস্তব জীবনের আসল সংসার—আমাদের নূতন সমাজ। শিশুর খেলাঘর তোমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছ। এই সংসারকে আসল রূপ দিবার দায়িত্ব প্রধানত তোমাদের। এই নূতন সমাজকে গড়িয়া তোলার ভার লইবে তোমরাই। এই কারণেই গৃহ-শিল্প ও গৃহ-বিজ্ঞানের মূলকথাগুলি তোমাদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। গৃহ-বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাকে গৃহ-পরিচালনার প্রতি কাজে প্রয়োগ কর। একমাত্র শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই গৃহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। গৃহ বলিতে কেবলমাত্র একটি আশ্রয়স্থান বুঝায় না। গৃহের অর্থই একটি **শিক্ষার কেন্দ্র**, একটি **সৌন্দর্যের আকর** ও একটি **শান্তির উৎস**। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির নিলয় এইরূপ এক একখানি গৃহ সমাজের সম্পদ জানিবে। এই গৃহই গড়িয়া তুলিবে সমাজের ভবিষ্যৎ মানুষ। এই গৃহই ফুটাইবে ভাবী মানুষের বুদ্ধির দীপ্তি, আনিবে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। গৃহের উপরেই নির্ভর করিবে উহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। গৃহই সমাজের একমাত্র ভিত্তি ও ভরসা জানিবে। এবং এই গৃহ রচনা করিবার গুরু দায়িত্ব তোমাদের। অর্থাৎ সমাজের ভাবী মানুষের জীবনকে যথাযথ রূপ দিবার কঠিন কাজটি অর্পিত হইয়াছে **তোমাদের উপর**। এবং এই কাজে সাফল্য অর্জন করা সহজ হইবে না—যদি না তোমরা গৃহের পরিচ্ছন্নতা, প্রসাধন, গৃহের পরিচালনা, খাদ্যব্যবস্থা প্রভৃতি গৃহ-রচনার প্রতিকাজে গৃহ-বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলি প্রয়োগ করিতে পার। সুতরাং তোমরা **গৃহ-বিজ্ঞানকে গ্রহণ কর**—জীবনের সঙ্গে জড়িত কর। বিজ্ঞানের প্রয়োগে উন্নততর গৃহ-রচনায় ও জীবনযাত্রায় অগ্রণী হও। বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের জীবনকে সুন্দর করিয়া তোলে। বাংলাদেশের ঘর ও জীবন আজ শ্রীহীন হইতে চলিয়াছে—এই দুই-এর সমন্বয়ে তোমরা সেই **লুপ্ত শ্রীকে ফিরাইয়া আন**, জাতির জীবনকে **মনোরম ও লোভনীয়** করিয়া তোল।

শ্রেণীর কাজ

(পূর্বেকার শ্রেণীর কাজগুলিও চলিতে থাকিবে)

১। একটি আদর্শ গৃহের পরিকল্পনা কর।

২। তোমাদের স্কুল-বাড়ীর হলঘরের কোণগুলি আলপনা আঁকিয়া সজ্জিত কর। আলপনার একটি নক্শা অঙ্কিত কর।

৩। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সাধারণত আলপনা কিরূপ হয়, একটি নক্শা অঙ্কিত করিয়া দেখাও।

৪। তোমাদের বিভিন্ন আসবাবপত্রাদি পরিষ্কার করিয়া পালিশ লাগাও।

৫। ফুল ও সবজির বাগান করিয়া উহাতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও সবজি উৎপন্ন কর।

৬। তোমাদের পশমের কাপড়-চোপড়গুলি যথাযথভাবে পরিষ্কার করিয়া সুবিন্যস্ত কর।

৭। মাছ ও মাংসের তরকারি বানাও। ডিমের অমলেট প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যগুলি প্রস্তুত কর।

৮। 'সবজির স্যুপ' ও চপাটি তৈয়ার কর।

অনুশীলনী

গৃহ

১। গৃহ-নির্মাণের বিভিন্ন উপাদানগুলির নাম কর। গৃহ-নির্মাণের নক্শার প্রয়োজনীয়তা কি?

২। বায়ুর বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। জনপিছু কতটা বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন?

৩। জল দূষিত হইবার কারণ কি? জল বিশোধিত করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। গৃহে বিশুদ্ধভাবে জল সংরক্ষণ করিতে হইলে তুমি কি কি উপায় অবলম্বন করিবে?

গৃহসজ্জা

১। কি কি উপায়ে দেওয়ালের সজ্জা রচনা করা যাইতে পারে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। দেওয়াল-সজ্জায় চিত্র-সন্নিবেশের স্থান নির্ণয় কর। কোনও কক্ষের দেওয়ালে চিত্র-সন্নিবেশ করিতে হইলে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ?

৩। পাশিয়ান কার্পেটের বৈশিষ্ট্য কি ? উহার রং ও নক্শা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। কোনও কক্ষে পর্দা সংযোজনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ? ঘরের আবহাওয়ার উপর পর্দার রং কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৫। আসবাবপত্র নির্বাচন করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ? আসবাবপত্র সন্নিবেশ করিতে প্রধানত কোন্ কোন্ নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে, সংক্ষেপে লিখ।

৬। পুষ্পবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি কি, সংক্ষেপে লিখ। তোমার জন্মদিন উপলক্ষে তুমি কোন্ কোন্ পুষ্প কিরূপ আধারে কি ভাবে বিন্যস্ত করিতে চাও, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। 'আলপনা একটি মণ্ডনশিল্প'—এই উক্তিটির তাৎপর্য কি,বুঝাইয়া দাও।

গৃহ-পরিচালনা

১। গৃহ-পরিচালনায় শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা কি ও উহা কিভাবে করিবে, সংক্ষেপে লিখ।

২। 'গৃহের সুশৃঙ্খল পরিচালনা সময়-তালিকার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।'—এই উক্তির সত্যতা যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত কর।

৩। গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এইরূপ কতকগুলি কীট-পতঙ্গের নাম কর। এই সকল কীট-পতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিবে লিখ।

৪। তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন পরিষ্কার করিবার বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা কর।

৫। লোহায় মরিচা পড়িবার কারণ কি ? মরিচার দাগ উঠাইতে হইলে তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে ?

৬। জলের মধ্যে কিছুদিন কোনও ধাতুনির্মিত বাসন বসাইয়া রাখিলে, দেখিয়াছ নিশ্চয়ই, উহার চারিধারে একটি নীল দাগ পড়ে। এই নীল দাগ পড়িবার কারণ কি ও উহা উঠাইবে কি প্রকারে, সংক্ষেপে বল।

৭। কাপড়ে অত্যধিক ক্ষারদ্রব্য প্রয়োগের অপকারিতা কি? গঁদের কলপ তৈয়ারী করিবার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৮। পশমের বোনা একটি জাম্পার পরিষ্কার করিতে হইলে তুমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিবে, বিশদভাবে বর্ণনা কর। পশমের কাপড় ইস্ত্রি করিতে হইলে তুমি কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে?

৯। রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। সিদ্ধ করা, ভাজা ও দমে সিদ্ধ করা (stewing)—এই তিনটি প্রক্রিয়ার গুণাগুণ দেখাইয়া একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও।

১০। আগুনে ঝলসানো ও ভাপে সিদ্ধ করা কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

খাদ্য

১। 'ভাইটামিন' বা 'খাদ্যপ্রাণ' কাহাকে বলে? কত রকম 'ভাইটামিন' আছে নাম কর ও আমাদের দেহে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। 'অভাবজনিত রোগ' কাহাকে বলে? কয়েকটি অভাবজনিত রোগের নাম কর ও উহাদের প্রতিরোধ করিবার উপায় কি লিখ।

৩। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় 'এ' ও 'সি'-ভাইটামিনের স্থান নির্ণয় কর। 'এ' ও 'সি'-ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে এরূপ কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম কর।

৪। খনিজ লবণ খাদ্যবিভাগের কোন্ পর্যায়ে পড়ে? কয়েকটি প্রধান খনিজ লবণের নাম কর ও আমাদের দেহে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। 'সুষম খাদ্য' কাহাকে বলে? খাদ্যের তাপমূল্য বলিতে কি বুঝায়, বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

৬। একজন সুস্থ, পরিণত-বয়স্ক, শ্রমশীল ব্যক্তির জন্য একটি সুষম খাদ্য-তালিকা প্রণয়ন কর।